থমাস হারবার্ট লুইন

থাংলিয়ানা

পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ব্রিটিশ কর্মকর্তার রোমাঞ্চকর অভিযান
১৮৬৫-১৮৭২

অনুবাদ ও ভূমিকা
হারুন রশীদ

A FLY ON THE WHEEL

By Lt. Col. T. H. Lewin

উৎসর্গ

গুল-এ-আফরোজ (খুকী)
প্রিয় বন্ধু, সহমর্মী, সহযাত্রী
আমার সকল কাজে যার প্রবল উৎসাহ

T.H. Lewin

Ensign Thomas Herbert Lewin, aged 18. 1859.

I contrasted their ignorant happiness with our own laboured learning, and their simplicity with the vices which are to be found in even the most polished Eurpoean society.

-T.H. Lewin (A fly on the wheel)

সূচি

পরিচয়পর্ব

প্রথম নোঙর (১৮৬৫) ১৭
১. কর্ণফুলীর শহর চট্টগ্রাম ১৭
২. নতুন কর্মক্ষেত্রের শুরুতে ১৯
৩. সীতাকুণ্ড পাহাড়ের আগ্নেয় জ্বালামুখ ২০
৪. কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি ২২
৫. দূর মফস্বল পরিদর্শনে
৬. বন্যহাতির মুখোমুখি
৭. কক্সবাজারে হাওয়া বদল
৮. নতুন অভিযানের স্বপ্ন ২৪ ২৬

নীল পাহাড়ের অভিযান ৩৪
৯. দক্ষিণ চট্টগ্রামের পার্বত্য পথে
১০. মুরংদের গ্রামে
১১. গভীর পার্বত্য জঙ্গল পেরিয়ে সাঙ্গু নদীর তীরে ৩৯
১২. সীমান্তের খরস্রোতা নদীতে
১৩. সাঙ্গু থেকে কালাদান নদীর পথে
১৪. সেন্দু জাতির খোঁজে
১৫. কিয়োদের গ্রামে 80 ৪৬ 85 08
১৬. অতর্কিত আক্রমণের মুখে

পথভ্রষ্ট স্বপ্ন
১৭. আকিয়াৰ থেকে দ্বিতীয় সেন্দু অভিযান
১৮. অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বিপন্ন প্রাণ
১৯. দুর্গম অজানা পর্বতে পথ হারানো

পাহাড়ে বদলি (১৮৬৬)
২০. ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসা
২১. চন্দ্রঘোনায় নতুন দায়িত্ব
২২. লুসাই গ্রামে অনিশ্চিত যাত্রা
২৩. লুসাই সর্দার রতন পুইয়ার মুখোমুখি
২৪. আবারো চাটগাঁ শহরে

পার্বত্য জীবনের মুগ্ধতা বনাম তিক্ততা

২৫. প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে ফেলা
২৬. সরল পার্বত্যবাসীর মধ্যে গরল
২৭. বোমাং রাজার জন্য ফাঁদ
২৮. কালিন্দী রানির সাথে দ্বন্দ্ব
২৯. মধ্যরাতের আততায়ী
৩০. আনন্দ উচ্ছ্বাসের মহামুনি মেলা
৩১. বাঙালি মোক্তারের অপকীর্তি
৩২. খিয়ং-থা বনাম তাউং-থা
৩৩. পাহাড়ের বিয়ে, সম্পর্ক
৩৪. জুম চাষের অভিজ্ঞতা
৩৫. আরাকানি জাদুকর
৩৬. মং রাজার আতিথ্যে

লুসাই জাতির সন্ধানে

৩৭. স্বাধীনচেতা লুসাই জাতি
৩৮. রাতের আক্রমণের ফাঁদে
৩৯. ইংরেজ লুসাই সর্দার
৪০. সাইলু চিফ সাভুঙ্গা
৪১. ছুটির ঘণ্টা বাজলো

লুসাই যুদ্ধ এবং জোলুটি উদ্ধার (১৮৭২)

৪২. বিলেতে ছুটি কাটিয়ে বাংলায় ফেরা
৪৩. লুসাই অভিযানের প্রস্তুতি
৪৪. সাইলু চিফ ভেনলুলার গ্রামে
৪৫. তাওরাং লাং পাহাড়ে
৪৬. মেরি উইনচেস্টার উদ্ধার এবং সন্ধি চুক্তি
৪৭. রতন পুইয়ার সফল দূতিয়ালি
৪৮. হাওলং অভিযান
৪৯. লুসাই যুদ্ধের বিজয়লগ্নে
৫০. লুসাই জাতির অনন্য চরিত্র উন্মোচন
৫১. পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে সরকারি পরিকল্পনা
৫২. পার্বত্য অঞ্চল জরিপ অভিজ্ঞতা
৫৩. আমার ডেমাগিরি জীবন
৫৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে গুর্খা অভিবাসন

৫৫. সারথে লাং পাহাড়ের ওপর আমার নতুন বাড়ি
৫৬. লুসাইদের প্রথম কলকাতা দর্শন
৫৭. শেষবেলার এক টুকরো দীর্ঘশ্বাস

পরিচয়পর্ব

“থাংলিয়ানা! থাংলিয়ানা।”

“গহিন পার্বত্য এলাকায় লুসাইদের গ্রামে ঢুকতে না ঢুকতে সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই শত্রুপক্ষের কাছ থেকে এমন অভিবাদন মোটেও আশা করিনি। মাত্র দুদিন আগেও এরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করছিল। নিজেদের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আর এখন ওরা আমার ইংলিশ নামটাকে নিজেদের ভাষায় রূপান্তর করে নিয়ে স্লোগানে পরিণত করেছে অনন্য এক ভালোবাসা আর বিশ্বাসে।”

[ক্যাপ্টেন থমাস হারবার্ট লুইন, লুসাই পাহাড় অভিযান শেষে মিজোরামের এক গ্রামে। সময়কাল ফেব্রুয়ারি ১৮৭২]

১.

আরো ৬ বছর আগের কথা। ১৮৬৫ সালে চট্টগ্রাম শহরে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন থমাস হারবার্ট লুইন নামের এক তরুণ ব্রিটিশ অফিসার। চট্টগ্রাম শহরে কাজ শুরু করলেও কিছুদিন পর শহরের পূর্বদিকে নীলাভ ধূসর দিগন্ত রেখায় ভেসে থাকা পার্বত্য অঞ্চলগুলো তাঁকে হাতছানি দিতে শুরু করেছিল। তিনি বাঙালি সহকর্মীদের কাছ থেকে সে অঞ্চল সম্পর্কে খোঁজ নিতে শুরু করেন। কিন্তু অধিকাংশ তথ্যই নিরুৎসাহিত হওয়ার মতো। বিচিত্র অবিশ্বাস্য অতিলৌকিক গুজবে ভরপুর। ওই পার্বত্যভূমিতে যারা বাস করে তারা হিংস্র, বর্বর, অসভ্য। মনুষ্য জাতির কলঙ্ক। সাপ-ব্যাঙ-কীটপতঙ্গ থেকে শেয়াল-কুকুর-হাতি-অজগর হেন কিছু নাই ওরা খায় না। কোনো কোনো জাতি জ্যান্ত মানুষও কাঁচা খেয়ে ফেলে। মোদ্দা কথা পূর্বদিকের ওই দুর্গম পার্বত্য এলাকা হলো সমতলের মানুষদের জন্য নিষিদ্ধ অঞ্চল। ওই অঞ্চলে প্রবেশ করলে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা কঠিন কাজ।

তখনো সরকারিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা নির্ধারণ হয়নি। চাকমা, মারমা, মুরং, খুমিসহ আরো বেশকিছু পার্বত্য জাতিগোষ্ঠী ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকায় বসবাস করত। এর বাইরে আরো পূর্ব দিকে দুর্গম এলাকায় কিছু জাতি ছিল যারা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেন্দু, সাইলু, হাওলং নামের উদ্ধত এবং স্বাধীনচেতা ওই গোত্রগুলো প্রায়ই হামলা চালাতো ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে। বেপরোয়া সেই পার্বত্য জাতিগুলোকে বাঙালিরা সাধারণভাবে কুকি নামে ডাকত। দুর্ধর্ষ কুকিরা সমভূমির বাসিন্দাদের কাছে সাক্ষাৎ যম। তাদের হামলা থেকে পাহাড়ি বাঙালি শ্বেতাঙ্গ কেউ বাদ যায় না। ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকায় বসবাসকারী পার্বত্য জাতিগোষ্ঠীগুলোও তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না।

হারবার্ট লুইন ১৮ বছর বয়সে জীবিকার তাগিদে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময়। সামরিক বাহিনীর একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে উত্তর ভারতের কর্মস্থলে কাজ শুরু করেন। তারপর নানান ঘাটে বদলি হতে হতে ১৮৬৫ সালে নোঙর করেছিলেন চট্টগ্রাম শহরে। চট্টগ্রামে এসেই তিনি এখানকার সবুজ সজীব অরণ্য আর পাহাড়ের প্রেমে পড়ে যান।

অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় লুইন পার্বত্য অঞ্চলের বৈরী পরিস্থিতির কথা শুনে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে পড়লেন। চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রে সুদৃশ্য টিলার ওপর তৈরি বাড়ির জানালা দিয়ে তাঁর দৃষ্টি প্রায়ই চলে যেত পূর্ব দিগন্তে ভেসে থাকা অজানা-অচেনা রহস্যময় পাহাড়ের নীলাভ রেখার দিকে। তাঁর বুকে নতুন একটা অঞ্চল আবিষ্কারের নেশা জাগতে শুরু করে।

২.

১৭৬১ সাল থেকে চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসন জারির পর সরকারিভাবে যে অঞ্চলটা শাসনযোগ্য ছিল, তার বাইরে বিরাট একটা এলাকা ছিল ব্রিটিশদের আওতার বাইরে। চট্টগ্রামের পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন পার্বত্য জাতির স্বাধীন বসবাস ছিল। মোগল আমলে সীমিত নিয়ন্ত্রণ ছিল ওদিকের কিছু এলাকায়। কিন্তু অধিকাংশ এলাকা ছিল নিজস্ব গোত্রশাসিত। পার্বত্য এলাকায় চাষাবাদের জমি ছিল খুব কম। আবাদি জমির পরিমাণ কম থাকায় খাজনার অংকটা তেমন লোভনীয় ছিল না। তাছাড়া দুর্গম অঞ্চল বিবেচনায় ওই অঞ্চল নিয়ে শাসকপক্ষের আগ্রহ ছিল কম।

ফ্রান্সিস বুখাননের কথা বাদ দিলে চট্টগ্রামে শাসন শুরু হওয়ার প্রথম একশ বছর ওই অঞ্চলে তেমন কোনো ইউরোপিয়ানের পা পড়েনি। ফ্রান্সিস বুখানন ১৭৯৮ সালে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে টেকনাফ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তারপর কর্ণফুলী নদী ধরে পূর্বদিকে বরকল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। বুখানন ইস্ট ইন্ডিয়া পার্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন কোম্পানির নির্দেশে কফি কিংবা মশলা চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক।

কিন্তু ক্যাপ্টেন লুইনের পার্বত্য অভিযান ছিল স্বতঃপ্রণোদিত। তিনি দুরন্ত ছেলেদের মতো ঘর ছেড়ে পালানোর মতলব করেছিলেন। যে পথে আগে কোনো ইউরোপিয়ানের পা পড়েনি, সেই পথ আবিষ্কারের এক অদম্য নেশায় তিনি চট্টগ্রামের তাঁর নিজের শাসনাধীন সীমানা ছাড়িয়ে অজানা পথে চলতে শুরু করেন। মাত্র দুজন দেশি কর্মচারী সাথে নিয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ সেই অভিযাত্রার প্রাথমিক ফলাফল ছিল তাঁর জন্য প্রাণঘাতী। যদিও চূড়ান্ত ফলাফলে ব্রিটিশ শাসনের সীমানা সম্প্রসারণ হয়েছিল বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলজুড়ে।

তিনি দক্ষিণে বান্দরবানের পাহাড় জঙ্গলাকীর্ণ পথ কেটে, পায়ে হেঁটে, নৌকায় চড়ে কালাদান নদীর তীরে এক নিষিদ্ধ অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে যান। সেখানে বাস করত দুর্ধর্ষ সেন্দু জাতি। যাদের ভয়ে চট্টগ্রামের অন্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলো তটস্থ থাকে। সেন্দু এলাকায় প্রবেশ করতে গিয়ে তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে বসেছিলেন। বিচিত্র ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে বহুকষ্টে তিনি প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন চট্টগ্রামে।

চট্টগ্রামে ফিরে সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবারো পাহাড়ের ডাক শুনতে পেলেন। এবার তাঁকে সরকারিভাবে পার্বত্য অঞ্চলের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয় ১৮৬৬ সালে। তিনি চন্দ্রঘোনায় নিজের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন। কিন্তু শাসন করতে গিয়ে তিনি টের পেলেন, কাজটা যতটা আনন্দের ভেবেছিলেন মোটেও সেরকম নয়। ওখানে লুকিয়ে আছে নানান ভয়ানক বিপদ। লুসাই পাহাড়ের হিংস্র পার্বত্য উপজাতিদের আক্রমণ থেকে চট্টগ্রামের সাধারণ পার্বত্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। লুসাইদের ঝটিকা আক্রমণ ঠেকানোর শক্তি ছিল না কারো। দুর্গম বনাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ফাঁড়িতে বসবাস করা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও ছিল অসহায়। খুন জখম আর অপহরণ ছিল নিত্য ঘটনা। আসামের কাছাড় থেকে দক্ষিণের আরাকান পর্যন্ত কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা ছিল প্রায় অরক্ষিত।

১৮৭২ সালে তাঁকে যুক্ত হতে হলো দুর্ধর্ষ লুসাইদের বিরুদ্ধে সরকার ঘোষিত একটা যুদ্ধে। যে যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, লুসাইদের হাতে অপহৃত মেরি উইনচেস্টার নামক ছয় বছর বয়সি এক ইংরেজ শিশু এবং ব্রিটিশ প্রজাদের উদ্ধার করা। অভিযানে লুইনকে নিযুক্ত করা হয় পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে। জিম্মিদের উদ্ধার এবং যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পেছনে ক্যাপ্টেন লুইনের কৌশলী অসামরিক কায়দাগুলো ছিল বেশ চমকপ্রদ।

মজার ব্যাপার হলো, ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের একজন হিসেবে কাজ করলেও পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন লুইন পার্বত্যবাসীদের কাছে খুব জনপ্রিয় একজন ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। দুর্ধর্ষ লুসাই সর্দার রতন পুইয়াকে তিনি জয় করেছিলেন কূটনৈতিক বুদ্ধি খাটিয়ে। তার সাথে বন্ধুতা তৈরি করে এবং যুদ্ধের সময় তাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করে প্রাণক্ষয়ের সংখ্যা কমিয়েছিলেন অনেকাংশে। এসব নানাবিধ কারণে মিজোরামের লুসাইরা তাকে ভালোবেসে থাংলিয়ানা নামে ডাকতে শুরু করে।

তবে থাংলিয়ানা নামের প্রাথমিক উৎসটি বেশ মজাদার। প্রথমবার চট্টগ্রামের পাহাড়ে গেলে বান্দরবান এলাকার মুরং সম্প্রদায়ের এক মোড়লের সাথে পরিচয় হয়। মোড়লের নাম ছিল ‘তোয়েকাম তংলুইন’। মোড়লের নাম শুনে তিনি নিজের নামটা বিকৃত করে পাহাড়িদের মতো উচ্চারণ করে বলেছিলেন— ‘আপনি তো আমার পূর্বপুরুষের দিককার আত্মীয় হন। আমার নামও আরবাট তংলুইন’।

এটা ছিল লুইনের কৌশল। তিনি যাত্রাপথে ওই মোড়লের সাহায্য নেওয়ার জন্য তাঁর সাথে বানোয়াট একটা সম্পর্ক তৈরির জন্য তাঁর 'হারবার্ট লুইন' নামটা খানিক বদলে দিয়েছিলেন। অতঃপর তংলুইন নামটা তংলুইন্যা হয়ে থাংলিয়ানায় রূপান্তর হয়েছিল।

লুসাই যুদ্ধের পর থাংলিয়ানার নামে স্থাপন করা প্রস্তর ফলকটি এখনো ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সেই গ্রামে দাঁড়িয়ে আছে।

৩

এই গ্রন্থের সাথে প্রাসঙ্গিক না হলেও পর্বত অভিযানসংক্রান্ত ব্যাপার বলে ক্যাপ্টেন লুইনের পরবর্তী জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে কয়েক বছর পর তিনি যখন দার্জিলিংয়ের কমিশনার, তখন সেখানে চট্টগ্রামের এক বাঙালির সাথে পরিচয় ঘটে তার। স্থানীয় ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের হেড মাস্টার তিনি 1 তাঁর কাছে টম লুইন তিব্বতি ভাষা শিখতেন।

একদিন কথায় কথায় হেড মাস্টার মশাই জানালেন—তিনি হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিব্বত অভিযানে যেতে ইচ্ছুক। ঊর্ধ্বতন কর্তা হিসেবে ক্যাপ্টেন লুইনের কাছে অনুমতি চেয়ে একটা আবেদনও করেন।

ক্যাপ্টেন লুইন এমনিতেই বাঙালিদের সুনজরে দেখতেন না। তাছাড়া অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছেন বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারেও অযোগ্য। তাদের সঙ্গী করে তিনি বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন বান্দরবানে। সেরকম এক বাঙালির কাছ থেকে অতি দুর্গম হিমালয় পর্বত পেরিয়ে তিব্বতে যাওয়ার খায়েশ হয়েছে দেখে তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তুচ্ছতার সাথে ছুড়ে ফেলেছিলেন তাঁর আবেদনপত্র।

তিনি ওখানে একটু ভুল করেছিলেন। দার্জিলিংয়ের সেই হেড মাস্টার ছিলেন তাঁর দেখা অন্যসব বাঙালির চেয়ে আলাদা। মাস্টারমশাই সেই উপেক্ষা আর পরিহাসের ধার না ধেরে প্রবল জেদে আরো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করে তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন এবং সবাইকে তাক লাগিয়ে ফিরে এসেছিলেন এক বিরল সফলতার জয়মাল্য গলায় পরে। সেই হেডমাস্টারের নাম শরৎচন্দ্র দাশ। যিনি পরবর্তীকালে তিব্বত বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশ্বখ্যাত হয়ে ওঠেন। ততদিনে অবশ্য ক্যাপ্টেন লুইন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

৪

থমাস হারবার্ট লুইন পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগোষ্ঠীসমূহের ইতিহাস রচনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। চাকমা রানি কালিন্দীর সাথে তাঁর বৈরী সম্পর্ক

থাকলেও চাকমা জাতির ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে চাকমাদের ইতিহাস রচনার কাজে সেই গ্রন্থের অনেক তথ্য কাজে লাগিয়েছিলেন ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন লেখক-গবেষক।

বলে রাখা ভালো, ১৯৯২ সালে প্রকাশিত জন হোয়াইটহুডের লেখা থমাস লুইনের একটি জীবনীগ্রন্থ আছে Thanglіena : A Life of T. H. Lewin নামে। সেই গ্রন্থের সাথে এই 'থাংলিয়ানা'র অনুবাদঘটিত কোনো সম্পর্ক নেই।

এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে স্বয়ং লুইনের লেখা এবং ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত A Fly on the Wheel; Or, How I Helped to Govern India গ্রন্থ অবলম্বনে। এখানে সেই গ্রন্থের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাচিত অংশগুলো বাংলাভাষী পাঠকের জন্য অনূদিত এবং সম্পাদিত হয়েছে।

এই গ্রন্থকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে তাতে কিছু উপ-শিরোনাম যোগ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে এগুলো না থাকলেও পাঠকের সুবিধার্থে সম্পাদনাপর্বে যোগ করা হয়েছে। সেই সাথে অপ্রয়োজনীয় কিংবা বাহুল্য বিবেচিত হওয়ায় কিছু বিবরণ কাটছাঁটও করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে সংযোজিত ছবিগুলোর মধ্যে কয়েকটি নেওয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন লুইনের 'অ্যা ফ্লাই অন দ্য হুইল' থেকে। কিছু ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে লুসাই যুদ্ধসংক্রান্ত আর্কাইভ, gettyimages, shutterstock ইত্যাদি সাইটের ফ্রি রিসোর্স থেকে। মেরি উইনচেস্টারের ছবি দুটি নেওয়া হয়েছে The Illustrated London News পত্রিকার ১৮৭২ সালের ২৫ মে সংখ্যা থেকে।

যে যুগে চট্টগ্রামের স্থানীয় লোকেরাই পূর্বদিকের ওই পার্বত্য অঞ্চলে যাওয়ার সাহস পেত না, সে যুগে একজন ভিনদেশি প্রায় একাকী ভ্রমণ করে এমন কিছু দুর্লভ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যা এই যুগেও সমান আকর্ষণীয়। উনিশ শতকে ওই অঞ্চলে দাপটের সঙ্গে ব্রিটিশদের মোকাবেলা করা কুকি বা লুসাই বলে কথিত সেন্দু, সাইলু, হাওলং জাতিগোষ্ঠীর পরবর্তী পরিণতি কী হয়েছিল সেসব নিয়ে তেমন কাজ হয়নি এদেশে। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত বলা যায় উনিশ শতকেই তাদের সকল দাপটের অবসান ঘটেছিল। ক্যাপ্টেন লুইন যেসব অঞ্চলে বিচরণ করেছিলেন সেই এলাকা বর্তমান
কয়েকজন লুসাই নেতার সাথে থাংলিয়ানা ওরফে থমাস হারবার্ট লুইন, ১৮৭২। উৎস : A Fly On The Wheel

মানচিত্রে ভারত, বাংলাদেশ ও বার্মা তিন দেশের মধ্যে বিভক্ত। ত্রিদেশীয় সেই সীমান্ত অঞ্চল এখনো দুর্গম বিবেচিত। সমগ্র উপমহাদেশের অন্যতম অস্থিতিশীল এবং রহস্যময় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়।

সেই দুর্গম রহস্যময় অঞ্চল নিয়ে আধুনিক পাঠকের চোখে বিস্ময় জাগানোর মতো অনেক বিচিত্র ঘটনাসম্ভার নিয়ে রচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের

প্রাচীনতম এবং রোমাঞ্চকর ভ্রমণ বিবরণী ‘থাংলিয়ানা’।

প্রথম নোঙর (১৮৬৫)

১. কর্ণফুলীর শহর চট্টগ্রাম

উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ছাড়াই মেঘনা মোহনা দিয়ে নৌপথে চট্টগ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। দিনটা ছিল ১৫ অক্টোবর ১৮৬৪। মেঘনা নদী থেকে সমুদ্রের দিকে যাওয়ার আগে আমরা বামনী নামক স্থানে অপেক্ষা করছিলাম অনুকূল স্রোতের জন্য। অনুকূল স্রোত আসার পর সমুদ্রের পূর্ব উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে একটানা নৌকা বেয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় পৌঁছে গেলাম। এই নদীর উজানে স্বল্প দূরত্বে চট্টগ্রাম বন্দর।

কর্ণফুলী মানে কানের ফুল বা কানের দুল। প্রচলিত মিথ হলো, একবার স্থানীয় এক রাজকন্যার কানের দুল নদীতে পড়ে গিয়েছিল। সেই কানফুল উদ্ধার করতে গিয়ে মেয়েটা মারা যাওয়ার পর নদীর নাম কর্ণফুলী রাখা হয়। এটা অবশ্য অনেক আগের কথা। ইংরেজ আমলের আগে মোগল রাজত্বের সময়কার ঘটনা। তখন এটার আদি নাম ছিল কিনসা-খিয়ং।

আমরা ক্রমবর্ধমান জোয়ারের সাথে চট্টগ্রাম শহরের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাদের সামনে ঝকঝকে ভোরের আলোয় দেখা গেল অসংখ্য জঙ্গলাকীর্ণ ছোট ছোট পাহাড় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যাদের পেছনে দূরে আরো উদ্ধত বড় বড় পাহাড়ের বৃক্ষশোভিত সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম বিশালাকৃতির ইউরোপিয়ান জাহাজের দীর্ঘাকায় মাস্তুলে ছেয়ে আছে দিগন্তরেখা। ওখানে কয়েকটা চাল বোঝাই ইংলিশ আর আমেরিকান জাহাজও দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু জাহাজ দেখতে ইউরোপিয়ান মনে হয় কিন্তু ওগুলোর মালিক হলো দেশীয় লোকজন।

চট্টগ্রামের বাসিন্দারা বহুকাল থেকেই জাহাজের মালিক এবং নির্মাতা। বঙ্গোপসাগরের জলদস্যুরা (পর্তুগিজ) যখন প্রথম এখানে কলোনি করেছিল তার আগ থেকেই পথে যেতে যেতে নদীর তীরে অনেক জাহাজ নির্মাণের কারখানা দেখলাম। এতে বোঝা যায় এখানকার জাহাজ নির্মাণের প্রাচীন ঐতিহ্য এখনো বিদ্যমান।

শহরটা গড়ে উঠেছে মূলত কর্ণফুলী নদীর উত্তর তীর ঘেঁষে। দেশি লোকদের ঘরবাড়িগুলো সব একই রকম। কাঠের খুঁটি আর বাঁশের বেড়ার সমন্বয়ে তৈরি। প্রতিটা বাড়ির চারপাশে ফলমূলের ছোট বাগান দিয়ে ঘেরা, যার মধ্যে নারকেল সুপারিগাছের প্রাধান্য দেখা যায় বেশি।

দেশীয় ঘরবাড়িগুলোর পেছনে অসংখ্য ছোট ছোট ঘাসে ঢাকা পাহাড়, সেই পাহাড়ের চূড়ায় সাদা বাংলো দেখা যায়। ইউরোপিয়ান লোকেরা বিশেষত সরকারি কর্মকর্তা, প্ল্যান্টার, চাল ব্যবসায়ী সবাই ওইসব পাহাড়ে বাস করে।

নিচু ভূমিতে বন্যার আশঙ্কা থাকে, তাছাড়া কিছুটা অস্বাস্থ্যকরও বটে। চট্টগ্রাম জেলার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং তুলনামূলকভাবে চমৎকার ঠান্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও ইউরোপিয়ানদের কাছে খুব জনপ্রিয় স্টেশন হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হলো ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব।

ব্রিটিশদের আগমনের আগে চট্টগ্রাম ছিল নানান শক্তির যুদ্ধক্ষেত্র। পাহাড়ি আদিবাসী, বার্মিজ, পর্তুগিজ, মুসলমান সবাই এই জেলাকে দখল করার জন্য নিরন্তর যুদ্ধ-বিবাদে লিপ্ত ছিল। তার কিছু অতীত চিহ্ন এখনো বিদ্যমান।

২. নতুন কর্মক্ষেত্রের শুরুতে

শুরু থেকেই আমি আমার নতুন কর্মস্থলকে পছন্দ করে ফেললাম। বছরের শেষ নাগাদ আমার পুলিশি কাজের লাগাম শক্ত হাতে ধরে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসলাম। সামাজিকভাবে কিংবা সরকারিভাবে নোয়াখালী থেকে চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসাটা খুব আনন্দদায়ক ব্যাপার ছিল। শুধু নোয়াখালীর ম্যাজিস্ট্রেটের খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়ে আমার বুক থেকে কয়েক টন ওজনের পাথর যেন নেমে গেল। ওই লোকটা শুরু থেকে আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে রাখার সকল ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। অথচ চট্টগ্রামের কমিশনার এবং ম্যাজিস্ট্রেট দুজনই আমাকে খুব আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন। নিজের পছন্দমতো থাকার জায়গা পাওয়ার আগে থাকার একটা ব্যবস্থাও হয়ে গেল এক ইউরোপিয়ানের বাড়িতে।

সেই বাড়িও অন্য ইউরোপিয়ানদের মতো পাহাড়ের ওপর অবস্থিত যেখান থেকে নদী এবং গ্রামের মনোরম দৃশ্যাবলি চোখে পড়ে। দক্ষিণে আরো দূরে দীর্ঘ বিস্তৃত সবুজ সমভূমি। নানান ফলজ বৃক্ষশোভিত বন-বনানী, মাঝখানে রূপোলী ফিতার মতো কর্ণফুলী বয়ে গেছে। পূর্বদিকে নীল পর্বতমালার সারি, যেখানে বন্য, হিংস্র প্রজাতির মানুষেরা বাস করে, যাদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে বিস্তর তথ্যতালাশ আমি পেয়েছিলাম। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বিপুলায়তনের ভারত মহাসাগর, প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় যেখান থেকে স্নিগ্ধ বাতাস এসে প্রাণ ভরিয়ে দেয়। সেখানে সাদা পালতোলা ইংলিশ জাহাজগুলো দেখে মনে পড়ে যায় অনেক দূরের এক প্রাচীন রাজ্যের কথা।

অল্প কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে ভয়ানক একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল। বিশাল জলোচ্ছ্বাসের ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছিল উপকূল, ধ্বংস হয়েছিল জমির ফসল। লবণাক্ত জলে প্লাবিত হয়ে চাষাবাদের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল ফসলের খেতগুলো। ঘূর্ণিঝড়টি এত শক্তিশালী ছিল যে এটার আঘাত সুদূর কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ঝড়ের দাপটে বাড়িঘরের চাল উড়ে গিয়েছিল, হাজার টনের বিশাল জাহাজগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে ধানখেতে আছড়ে ফেলেছিল। কয়েকটিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল নদীতে নোঙর

করা অবস্থাতেই। এখন অবশ্য ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন নিয়েও পরিস্থিতি শান্ত স্থির। কে বলবে এই শান্ত প্রকৃতি একেক সময় কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে!

শীতের আগমনধ্বনি পাওয়া যাচ্ছিল বাতাসের মৃদুমন্দ ঘ্রাণে। সময় হয়েছে বেরিয়ে পড়ার। সমস্ত জেলাটা ঘুরে ঘুরে দেখব, কোথায় কী আছে, কার কোথায় সমস্যা সেসব বিষয়ে খোঁজ নিতে বেরুতে হবে। এটা আমার বাৎসরিক ভ্রমণপর্বের অংশ।

কমিশনার আমাকে প্রথম যে কাজটি দিয়েছিলেন তা হলো চট্টগ্রামের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। আমি অনেক ভেবেচিন্তে কাজটা করেছিলাম। খুব যত্ন করে বিস্তারিতভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধাপগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন যেন ওই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন হয়নি। দশ বছর পরও চট্টগ্রাম অরক্ষিত থেকে গেছে।

আমার পদোন্নতির দরখাস্তটা কোনো রহস্যময় কারণে আটকে ছিল। ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হওয়ার তালিকার প্রথমদিকে আমার নাম থাকলেও কলকাতা থেকে আমাকে জানানো হয় যে যতদিন পর্যন্ত আমি ড্রিল এবং অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত আমার পদোন্নতি হবে না। বরং আমার জুনিয়র কেউ পদোন্নতি লাভ করে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ব্যাপারটা আমার ক্যারিয়ারের জন্য একটা হুমকিস্বরূপ। কিন্তু আমি কখনোই ওসব পরীক্ষার ব্যাপারে ভীত ছিলাম না। তাই আমি দেরি না করে ফোর্ট উইলিয়ামে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। দরখাস্তের জবাব আসার অবকাশে জেলার উত্তরদিকে ঘুরতে বের হলাম। আমার এক সহকর্মীর একটা বিয়ের দাওয়াত ছিল নোয়াখালীর পাশের জেলা কুমিল্লায়। সে আমার সঙ্গ পছন্দ করে, তাই তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য ফেনী নদী পর্যন্ত তার সাথে গেলাম। তারপর তাকে বিদায় জানালাম।

৩. সীতাকুণ্ডের আগ্নেয় জ্বালামুখ

ফেরার পথে আমি সীতাকুণ্ডে থামলাম। হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান দেখার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে উঠলাম। এই মন্দিরটি নিজামপুর পাহাড় শ্রেণির মাঝখানে একটি শৃঙ্গের ওপর অবস্থিত। পাহাড়ে ওঠার জন্য খাঁজ কেটে পথ করা হয়েছে। আমার দুই দেশীয় ভৃত্য সঙ্গে ছিল। একজন আমার বন্দুকটা কাঁধে নিয়েছে, অন্যজন আমার ছবি আঁকার খাতা বহন করছিল।

পায়ে হেঁটে ওঠার পথে একটা পবিত্র পাথর অতিক্রম করলাম যেটিকে হিন্দু সম্প্রদায় পূজা করে। কিছুদূর যাওয়ার পর মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের আবাসস্থল। যিনি এই মন্দিরের সর্বেসর্বা, পূজারিদের কাছ থেকে তাঁর বেশ ভালো অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা আছে। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে

যেগুলো জঙ্গলে ঢেকে গেছে। এই মন্দিরে কিছু পাথরের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, যার ওপর নানান জাতের পুষ্পার্ঘ্য ছড়ানো। এগুলো শিবলিঙ্গ হিসেবে পরিচিত।

মন্দিরের পুরোহিতের সাথে দেখা করা গেল না। তাঁর সেবককে দেখে খুব ব্যস্ত মনে হলো। সে পুরোহিতের গত রাতের খাবারের থালা-বাসন পরিষ্কার করছিল। সে জানালো, তিনি এখন পূজায় ব্যস্ত আছেন, কারো সাথে দেখা করা বারণ আছে এ সময়ে। ঘরের সামনে পাহাড় থেকে নেমে আসা শীতল ঝরনার ধারা নিয়ে আসা হয়েছে কৌশলে। একটা সুপারিগাছকে দুই ভাগে বিভক্ত করে একটা লাইন তৈরি করা হয়েছে। সেই লাইন ধরে জল চলে আসে এখানে। পাহাড়ি ঝরনা নিজস্ব পথ ছেড়ে এই মন্দির প্রাঙ্গণে সেবা দিচ্ছে।

এখান থেকে চন্দ্রনাথ মন্দিরে ওঠার বাকি পথটা পায়ে হেঁটে যেতে হবে। আমি ঘোড়া থেকে নেমে ইটের তৈরি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম। প্রায় এক হাজার ধাপের এই সিঁড়িপথের মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা আছে। এখান থেকে নিচে এবং চারদিকে তাকালে মনোরম এক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মন ভরে যায়।

দূর সমুদ্রে সকালের রোদ প্রতিফলিত হয়ে চিক চিক করছে। শান্ত সমুদ্রের ওপর অলস ভঙ্গিতে ভেসে আছে কিছু মাছ ধরা নৌকা। তীরবর্তী অঞ্চলে ঘনসবুজ বন-বনানী। মাঝে মাঝে কিছু জায়গায় জঙ্গল কেটে শস্য খেত তৈরি করা হয়েছে। সেইসব খেতের মধ্যে যেসব কালো কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে ওগুলো মানুষ এবং গবাদিপশু। কোথাও কোথাও কচি সবুজ ধানখেত ছড়ানো আছে মাঠজুড়ে। নিচের গভীর জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে কাঠুরিয়ার কাঠ কাটার শব্দ। মাঝে মাঝে দুয়েকটা বনমোরগও ডেকে উঠছে থেমে থেমে। একবার হরিণের ডাকও শোনা গেল। ডানদিকের উপত্যকা পেরিয়ে পর্বতের সারি। যার আগাগোড়া ঘন জঙ্গলে আবৃত। সেই জঙ্গলের মাঝে একটা পথ উঠে গেছে পাহাড়ের গাঁ বেয়ে। যখন আমি সেদিকে তাকিয়েছিলাম ঠিক তখনই একটা ডোরাকাটা হায়েনা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর ধীর পদক্ষেপে সামনের পথটা পার হয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

আমরা ধাপে ধাপে উপরে উঠছিলাম সুশৃঙ্খলভাবে নির্মিত সিঁড়ির ধাপ বেয়ে। ধাপগুলো পিচ্ছিল হয়ে আছে পাহাড় নিসৃত ক্ষীণ জলধারায় সিক্ত হয়ে থাকার কারণে। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা ধূসর পাথরের নিচ দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে। সেই পাথরের গোড়া ঘাস আর ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদে ঢাকা। ইটের তৈরি সিঁড়িটা হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল একটা সমতল পথের কাছে এসে। দশ ফুট দীর্ঘ ঘাসজঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথটা চলে গেছে মাথার ওপর একটা খিলানের মতো ছাদ তৈরি করে।

যেতে যেতে পথের শেষে যেখানে আমরা থামলাম সেখানে নিচু ছাদের একটা ছোট দালান, মলিন ঘুপচি অন্ধকার বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামনে কোত্থেকে যেন মৃদু

গর্জন এবং হিসহিসানির শব্দ ভেসে আসছিল। হঠাৎ আমাদের মুখে উষ্ণ জলের ছিটে পড়ল একটা প্রস্রবণ থেকে। ওটাই হলো সীতার কুণ্ড।

আমার লোকেরা ভয় পেয়ে গেল এই ঘটনায়। তারা আমাকে অগ্রসর হতে বারণ করল। আমরা পুরোহিতকে সাথে নিয়ে আসিনি এই পবিত্র স্থানে। এর ফলাফল ভালো হবে না বলে ওদের বিশ্বাস।

আমি তাদের বললাম, এত খাটনি করে এখানে উঠেছি ফিরে যাওয়ার জন্য না, ব্যাপারটা পুরো না জেনে আমি ফিরছি না। কথা না বাড়িয়ে আমি এগিয়ে গেলাম এবং নিচু খিলান অতিক্রম করে মন্দিরের ভেতরের অংশে ঢুকে পড়লাম। ঘরের ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার। মাঝখানে আগুনের লাল আভা জ্বলছে আর নিভছে। জায়গাটা নিঃসন্দেহে ভূতুড়ে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের জন্য আতঙ্কজনক।

আমরা ভেতরের একটা কুঠুরিতে ঢুকলাম। সেখানে বিশ বর্গ ফুটের মতো একটা জায়গাজুড়ে জলের চৌবাচ্চা, সেখান থেকে অগ্নিশিখা নেচে নেচে বেরিয়ে এসে ভূতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি করছে। সেই হলুদ আগুনের শিখার পাশাপাশি জলের ভেতর এক রকমের ভুড়ভুড়ি, চাপা গর্জন ও হিসহিসানি। কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গীদের অস্থির করে তুলেছিল এই রহস্যময় আগুন ও শব্দ।

আমরা যখন এই ভূতুড়ে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তখনই আমাদের চোখের সামনেই হিসহিসানির শব্দটা আগ্নেয়গিরির শক্তি নিয়ে বিপুল এক গর্জনে পরিণত হলো। এবং একই সময়ে দালানের অন্যপ্রান্তও বিকট শব্দে কাঁপতে শুরু করল যেন অসংখ্য দৈত্য তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেছে। এসব দেখে আমার সঙ্গীরা সব প্রাণের ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমার কাছে ব্যাপারটা রহস্যময় লাগল। খোঁজ নেওয়ার জন্য পাশের ঘরটিতে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম এক ধর্মগুরু বিপুল আয়তনের একটা কাঁসার ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে জানালেন এটা দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে পবিত্র জায়গা, দেবতার আবির্ভাব এখানে খুব বিরল একটা ঘটনা, তিনি কাউকে দেখা দেন না। শুধু বিশেষ প্রিয় মোহান্তের সম্মুখেই তাঁর আবির্ভাব ঘটে।

আমি চৌবাচ্চার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে আবার তাকালাম, ওই শিখা আমাকে মনে করিয়ে দিল পেন্টিকোস্টের অগ্নিশিখার কথা যেখান থেকে যিশুখ্রিস্টের বাণী অবতীর্ণ হতো।

আমি নিশ্চিত যে এই অগ্নিশিখাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে জলের মধ্য দিয়ে নির্গত দাহ্য গ্যাসীয় পদার্থের কারসাজিতে, কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম না যে আগুনটা নিজে নিজে জ্বলে উঠছে কীভাবে। অগ্নিশিখাটা কিছুক্ষণ জ্বলে আবার নিভে যাচ্ছে, আবার জ্বলে উঠছে এবং সেখানে কোনো বাষ্পীয় নির্গমন দেখা যাচ্ছে না।

আমার লোকজনের এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তারা যত দ্রুত এই পাহাড় থেকে নিচে নেমে যেতে পারে ততই রক্ষা। নিরুপায় হয়ে রহস্য উন্মোচন বাদ দিয়ে আমাকে তাদের সঙ্গী হতে হলো।

৪. কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি

যাত্রাপথে বিভিন্ন পুলিশ স্টেশন পরিদর্শন শেষে আমি চট্টগ্রামে নিজের আবাসস্থলে পৌছালাম। এক সপ্তাহের অধিক সময় ঘরটি তালাবদ্ধ থাকার সুযোগে ঘরটির দখল নিয়েছে বিশাল মক্ষিকা বাহিনী। আমি চুপচাপ ডাইনিংরুমে ঢোকার খানিক পর দেখলাম আমার সাদা ট্রাউজারের নিচের অংশটা অসংখ্য মাছিতে কালো হয়ে গেছে। অনেক ঝাড়পোছ করে এবং তামাক চুবানো পানি ছিটিয়ে নিজের ঘরকে পুনর্দখল করতে হলো।

প্রবাদ আছে—মানুষ চেনা যায় তার বইপত্রের রুচি দিয়ে। আমার মনে হয় একজন ভারতীয় অফিসারকে চেনা যায় তার কাছে আসা দৈনিক চিঠিপত্র দিয়ে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমি ফিরে আসার পর যেসব চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা হলো-

১. কলকাতায় আমার এক পার্টনারের কাছ থেকে আসা আমন্ত্রণপত্র -- যেখানে আতিথেয়তার পাশাপাশি নানান বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান ও প্রাসাদসমূহ ঘুরে দেখানোর প্রস্তাব।

২. কলকাতার এক দৈনিকের সাব-এডিটরের কাছ থেকে আসা সম্মানী।

৩. পুলিশের আইজির প্রাইভেট সেক্রেটারির চিঠি। তাতে জানতে চাওয়া হলো আমার নতুন শহর কেমন লাগছে?

৪. পুলিশ ইন্সপেক্টর রোজারিওর চিঠিতে জানানো হলো ফেনী নদীর তীরে বিশাল অবৈধ লবণ কারখানা গড়ে উঠেছে।

৫. একটি বেনামী পত্র—যাতে আমার এক অফিসারের ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে।

৬. কোনো এক প্ল্যান্টারের বাংলোর অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত পুলিশ রিপোর্ট।

৭. পুলিশ প্রধানের পত্র—যেখানে পুলিশ বাহিনীর বুটসহ বিভিন্ন উপকরণের বিষয়ে লেখা হয়েছে।

৮. পুলিশ সদর দপ্তরের আরেকটি পত্র- যেখানে পুলিশের জন্য একটি নৌযান কেনার কথা আছে।

৯. কলকাতার এক সংগীত বিপণি থেকে কিছু বাদ্যযন্ত্র পাঠানো হচ্ছে।

১০. আইজি অফিসের এক বাবু ‘কনস্টেবল ম্যানুয়াল’ নামক পুস্তক বিক্রি বাবদ একশো রুপি পাঠিয়েছে।

১১. কলকাতা নিবাসী এক জার্মান ব্যবসায়ী চট্টগ্রাম জেলায় চায়ের ব্যবসার সম্ভাবনা নিয়ে জানতে চেয়েছে।

এগুলো ছাড়াও আরো খান তিরিশেক পুলিশি বিষয়ের চিঠিপত্র এবং ইংরেজদের পাঠানো সৌজন্য পত্রাবলি।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার একজন ভালো বেহালাবাদক এবং তাঁর সাথে আরো দুজন বাজিয়ে ছিলেন। একজন হলেন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, অন্যজন কমিশনারের সহকারী। শেষের জন আধা সাহেব - পর্তুগিজ জলদস্যুদের বংশধর, যার কুচকুচে কালো চেহারার দুপাশে সাদা জুলফি নেমে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। একটা বেহালা বাদকের দল তৈরির জন্য এই কয়েকজনই যথেষ্ট।

আমার অফিসিয়াল বস আমাকে বলেছিল (বলা ভালো আদেশ করেছিল) এসব বাদ্যযন্ত্র জোগাড় করার জন্য। কলকাতা থেকে এসব জিনিসপত্র জোগাড় করতে আমাকে যে কী পরিমাণ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তা বলা বাতুলতা মাত্র, শেষমেশ বেহালা বাদক দলের কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ব্যাপারটার অবসান ঘটেছিল। কমিশনার আমাকে সবসময় একটা উপদেশ দিতেন, ‘শোনো লুইন, যদি তুমি কোন অংশ বাজাতে গিয়ে আটকে যাও, তাতে হাল ছেড়ে দিও না। তুমি জি স্কেল ধরে এলোমেলো ঘষতে ঘষতে বাজাতে থাকবে, দেখবে কোন সমস্যা হবে না।’

আমি আমার সহকর্মীর এই মহৎ উপদেশ জীবনেও কখনো ভুলিনি। বাকি জীবনে যখনই কোথাও কোনো সমস্যায় পড়েছি, এই জি স্কেলের ওপর ঘষাঘষি করে পার করে দিয়েছি।

ডিসেম্বরে এক মাসের ছুটিতে কলকাতা গেলাম ক্যাপ্টেন্সির পরীক্ষা দিতে। যাওয়ার পথে দ্রুত কলকাতা পৌঁছানো নিয়ে একটু উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমার এক বন্ধু লন্ডন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। আমার কাছাকাছি সময়ে পৌঁছানোর কথা তার। মজার ব্যাপার হলো আমি যখন ছোট একটা স্টিমারে করে হুগলি নদীতে প্রবেশ করছিলাম, তখন সেখানে জোয়ারের অপেক্ষায় দাঁড়ানো ছিল পি এন্ড ও কোম্পানির বিশাল জাহাজটি, যেটাতে করে আমার বন্ধুর আসার কথা। দেখা গেল সে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুজন দুজনকে হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালাম। কলকাতায় আমরা দুজনে একই ঘরে ছিলাম। কলকাতায় দুসপ্তাহ ধরে কঠোর মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে গেলাম। সব যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্রুততম সময়ে চট্টগ্রামের কর্মস্থলে ফিরে এলাম। আমার বন্ধুটিও উত্তীর্ণ হয়ে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলো।

৫. দূর মফস্বল পরিদর্শনে

১৮৬৫ সালের বসন্তে আমি দ্বিতীয়বারের মতো চট্টগ্রাম জেলা পরিদর্শনে বের হলাম। ইচ্ছে আছে যতটা দূরে যাওয়া যায়, নিজের চোখে সব দেখার ইচ্ছে, দেশি অফিসারদের নোংরা চশমায় না, যারা ভারতবর্ষজুড়ে ইংরেজ অফিসারের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ায়। তাই স্থানীয় কেরানিদের বাদ দিয়ে একটা ধূসর ফ্লানেলের কোট এবং হলুদ বুটজোড়া পরে, কাঁধে আমার রাইফেলটা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সাথে ছিল মগ দোভাষী সাধু এবং তার ছেলে অপু। ছেলেটার কাছে আমার রিভলবার আর শিকারের ছুরিটা দিলাম। দোভাষী না নিয়ে উপায় নেই। আমি বাংলা বা হিন্দুস্থানি কোনো ভাষাই পারি না। চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে আরো দক্ষিণে গেলে বার্মিজ ভাষার লোকের দেখা মেলে। আর সভ্যতার সীমানা পেরিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের ভাষা তো একদমই অচেনা।

আমার মালপত্রের বহর যতটা সম্ভব সংকুচিত করেছি। হাতের ব্যাগটা যতটা ছোট রাখা যায় ততটাই রেখেছি। এটা ছাড়া আরেকটি সাদা শার্ট, লাল ওয়েস্ট কোট, একটা দাঁতের ব্রাশ, একটা তোয়ালে, একটা সাবান, একটা চিরুনি ইত্যাদি নিয়ে ছোট একটা পুঁটলি হয়েছে যা আমার সঙ্গী সহজেই বহন করতে পারে।

বোঝা হালকা হওয়াতে জঙ্গলের মধ্যে আমার যাত্রাটা আনন্দময় হলো। জীবন কিংবা ভ্রমণে সুখী হওয়ার গোপন রহস্য হলো কোনোটাতেই অনর্থক বোঝা না বাড়ানো। যেতে যেতে ভাবছিলাম এখন যদি কোনো একটা থানার কাছে হুট করে গিয়ে পৌঁছাই, সেখানে কীরকম ত্রাস এবং হুড়াহুড়ি পড়ে যাবে। একে তো নতুন সাহেব, তার ওপর সাহেবের ভাবসাব কেমন তা জানে না তারা। এই অতর্কিত পরিদর্শন স্থানীয় পুলিশ কনস্টেবলদের নিস্তরঙ্গ জীবনের ওপর আসমানি গজব হিসেবে নেমে আসতে পারে। ভাবলাম, তাদের ঝামেলায় ফেলার চেয়ে বরং নদীর ধারে কোনো মগ অধ্যুষিত গ্রামে রাত কাটানো শ্রেয় হবে।

সেই ভাবনা মোতাবেক স্থানীয় একটা মগ গ্রামে গিয়ে একটা বাড়িতে উঠলাম। সেখানে জামাকাপড় বদলে নিয়ে কালো রঙের কাঠের মেঝেতে বসে পড়লাম। তারপর গৃহস্থের সাথে সৌজন্য বিনিময় ইত্যাদি সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

তারপর আমি ছোট্ট গোলাকার ঝুড়ির মতো একটি নৌকা নিয়ে ঘুরতে বের হলাম, নৌকাটা দেখতে আমার ব্রিটিশ পূর্বপুরুষদের তৈরি কোরাকলের মতো। ঘুরতে ঘুরতে আমি এখানকার আদিম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অর্কিড শোভিত ধূসর ঘন শৈবালে আচ্ছাদিত বিশাল আকারের বৃক্ষ, তার সাথে ঝুলছে সর্পিল আকৃতির বুনো লতা। এই অঞ্চলের সমস্তটা জুড়ে রয়েছে বিশাল অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গল এবং সংলগ্ন জলাভূমি, যার নিকটেই বন্যহাতির আবাসস্থল রয়েছে। সেই হাতির পাল মাঝে মাঝে কর্দমাক্ত

পথে স্নান করার জন্য দল বেঁধে নেমে আসে। এটা এমন অদ্ভুত রহস্যময় ঘন জঙ্গল যে মনে হয় এখানে বিপুল আকৃতির ডায়নোসরও অনায়াসে বাস করতে পারে।

আরেকদিনের কথা আমার মনে পড়ে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। মাথার ওপরে সূর্যকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে দানবীয় সব বৃক্ষের ডালপালার আচ্ছাদন। ভূমিতে দুর্লভ জাতের অর্কিড এবং বুনো বিচিত্র সব উদ্ভিদের সমাহার। কোথাও কোনো শব্দ নেই, না পাখি, না পশু, কারো কোনো শব্দ নেই, শুনশান নীরব নিস্তব্ধ চারপাশ। অনড় স্থির হয়ে আছে সমস্ত প্রকৃতি। আমাদের পায়ের নিচে মচমচ করে ভেঙে পড়া শুকনো ডালপালার শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা সাধারণত দিনে বিশ মাইলের মতো হাঁটতাম। আমার বন্দুকটা থাকত সাধুর কাছে এবং অপুর হাতে বোঁচকাটা। এই জেলায় শিকার করার সুযোগ কম। উপকূলের দিকের নিচু জঙ্গলে মথুরা নামের এক জাতের সারস পাখি শিকার করেছিলাম একবার। একটা পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছাল আমাদের আন্তরিক আতিথেয়তার সাথে গ্রহণ করল সবাই। এরা হলো খুমি উপজাতি। দেখতে একটু কদাকার এবং অপরিচ্ছন্ন। তাদের পাড়ায় আমি থাকতে চাইলাম না যখন দেখলাম একটা অর্ধেক চামড়া ছিলানো একটা কুকুরকে ঝুলিয়ে রেখে রান্নার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষত সাধু যখন আমাকে জানালো যে ওই কুকুরটাকে আমার নৈশভোজের জন্য হত্যা করা হয়েছে। অতএব আমরা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলের পথে বের হয়ে গেলাম আবারো।

খুমিরা প্রায় নগ্ন থাকে, কোমরের কাছে এক চিলতে কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই শরীরে। কানে বড় বড় পেতলের চাকতি ঝোলানো, যার ভারে কানের লতি বড় বড় ছিদ্র সহকারে নিচের দিকে ঝুলে গেছে।

আরেকটা চমৎকার উপজাতি হলো চাক বা চাকমা। তাদের গ্রামে আমি দুদিনের জন্য থেমেছিলাম। আমাকে রাখা হয়েছিল একটা অতিথিশালায় যেটা সম্ভবত গ্রামের পুরুষদের ক্লাব জাতীয় কিছু। সেখানে গ্রামের পুরুষরা দিনের কাজকর্ম সেরে আসার পর জড়ো হয়। সবাই মিলে বসে বসে ধূমপান করে আর আড্ডা দেয়। দেখে বোঝা যায় ওরা খুব আমুদে লোক। সারাক্ষণ হাসি মশকরা আনন্দে মেতে আছে। তাদের চোখে আমার গুলিভরা বন্দুকটা খুব আকর্ষণীয়। আমি যখন সেখান থেকে পরপর ছয়টা গুলি ছুড়লাম তখন তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কোনো সীমা ছিল না।

তবে সেই সাথে আমাকে প্রস্তাব করা হলো ওই বন্দুক দিয়ে একটা বন্যহাতি শিকার করার জন্য। একটা হাতির মাংস দিয়ে পুরো গ্রামের সারা মাসের খোরাক হয়ে যাবে। আমি কখনো বন্যহাতি দেখিনি। সেটা শিকার করতে গিয়ে কী বিপদ হতে পারে সেটা না জেনেই তাদের প্রস্তাবে দ্রুত রাজি হয়ে গেলাম।

৬. বন্যহাতির মুখোমুখি

অতঃপর সেই সন্ধ্যায় আমি নতুন অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যে পাল তুললাম। আমার সাথে আছে অপু এবং হা-পোয়া-থু নামের এক ধূর্ত চাকমা শিকারি। সেনাকি এত দুঃসাহসী যে ভয় কাকে বলে জানে না। হাতির পালের অবস্থান জানার জন্য একটা স্কাউট দলকে আগাম পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যারা একদিন আগে ওখানে গিয়ে হাতির পালের অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিয়ে আমাদের খবর দেবে যাতে শিকারের প্রস্তুতি নেওয়া যায়। বারো ফুট উঁচু একটা ছোট বাঁশের মাচা তৈরি করা হলো একটা ডোবার কাছে। ওখানে হাতির পাল স্নান করতে আসে রাতের বেলা।

আমি এই অভিযানের ফলাফল বিষয়ে একটু সন্দিহান। কারণ এ ধরনের অভিযান এটাই আমার প্রথম এবং আমি যে নড়বড়ে মাচায় অ্যামবুশ করতে বসেছি সেটাও যথেষ্ট নিরাপদ বলা যায় না। তখন রাত দশটা বাজে এবং ভীষণ ঠান্ডা পড়ছিল। লোকালয় বা সভ্যতা থেকে বহু দূরের এই অজানা জঙ্গলে বারো ফুট উঁচু একটা ছোট্ট মাচার উপরে আমরা তিনজন একে একে উঠে বসার পর মাচাটা ক্যাচক্যাচ করে উঠে দুলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর দুলতে দুলতে স্থির হলো। আমরা অপেক্ষা করছি কখন সেই বিপুলা হস্তির দল স্নান করতে আসবে।

কয়েক ঘণ্টা ধরে বসে আছি এবং সেটা খুব অস্বস্তিকর একটা সময়। অপু তখনই ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং আমারও ইচ্ছে ছিল তার মতো ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু আমার পেটের খাবারগুলো তখন এমন মোচড় দিচ্ছিল যে সেটা সম্ভব হলো না। হঠাৎ করে আমার পাশে বসা চাকমা শিকারি খুব সতর্কভাবে তার হাত আমার বাহুতে স্পর্শ করল এবং ইঙ্গিতে সামনের অন্ধকারের দিকে কিছু একটা দেখাতে চাইল।

ওই তো! ওরা ওখানে। আমার প্রথম বন্যহাতি দর্শন। নক্ষত্রের ধূসর অস্পষ্ট মিশমিশে আলো-আঁধারিতে আমি দেখতে পেলাম পাঁচটির মতো হাতি এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। আবারো ভালো করে দেখলাম, সংখ্যায় পাঁচটাই আছে। দেখে সন্তুষ্ট হলাম যে সংখ্যায় আরো বেশি নয় ওরা।

প্রথমে দেখা গেল বিশাল আকৃতির পুরুষ হাতিটাকে, তারপর ছোট দুটো আকারের হাতি। সবার শেষে মাদী হাতি এলো আরেকটা বাচ্চা হাতিকে নিয়ে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছি।

আমি ধীরে ধীরে মনস্থির করে বড় হাতিটার কান বরাবর বন্দুকের নলটা তাক করলাম। তারপর আস্তে করে ট্রিগারে চাপ দিলাম। গুড়ুম! সমগ্র বনভূমি কেঁপে উঠল যেন। গুলি খেয়ে বড় হাতিটা যখন স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল তখন বাকি চারটা হাতি বনের মধ্যে টর্নেডো সৃষ্টি করে ছুট লাগাল।

সেই মুহূর্তে সদ্য নিদ্রামুক্ত পাজী অপু আমার পাশ থেকে চিৎকার করে উঠল, 'গুলি খেয়েছে! গুলি খেয়েছে!"

এই সেরেছে! ছেলেটার অতর্কিত চিৎকারে বড় হাতিটার মনোযোগ আমাদের দিকে চলে এলো। এবার বিপুল শরীর নিয়ে হাতিটা সোজা আমাদের নড়বড়ে মাচায় ধাক্কা দিল। আমি শুধু এক পলকের জন্য হাতির শরীরটা দেখতে পেলাম।

এরপর সব গোলমাল হয়ে গেল। বিশাল দেহ নিয়ে হাতিটা প্রচণ্ড এক ধাক্কায় মাচাটা দুমড়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা যাবতীয় মালামালসহ ছিটকে পড়লাম নিচে। ভাগ্য ভালো নিচে পুরু লম্বা ঘাসের জঙ্গল ছিল, আমরা ওখানে পড়ে দম আটকে মটকা মেরে থাকলাম। এমনকি চোখের পাতা ফেলতেও সাহস করলাম না। আরো ভাগ্য ভালো যে জন্তুটা আমাদের খুঁজে বের না করে শুধু মাচার ওপরই রাগটা ঝেড়ে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল।

আমার শরীরের নানা জায়গা ছড়ে গিয়েছে, অপুর মাথায় আঘাত লেগেছে, বন্দুকটা ভেঙে গেছে। আমাদের সঙ্গী চাকমা শিকারি স্বীকার করল জীবনে এই প্রথম তার কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছিল। অতএব আমাদের শিকার অভিযানের খায়েশ ওখানেই মিটে গেল। আমি চট্টগ্রামে ফিরে এলাম অনতিবিলম্বে।

এই সময়টাতে চট্টগ্রাম জেলায় চা-বাগানের ব্যবসায় ইংরেজদের বিনিয়োগ বাড়ছিল ক্রমাগত। সরকার সহজ শর্তে বড় বড় জংলাভূমি চা-বাগানের জন্য বিক্রি করছিল।

ইংরেজদের এই হঠাৎ বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারটা স্থানীয়দের সাথে সংঘাতের সৃষ্টি করল নানাভাবে। নানান জন নানান দাবি নিয়ে হাজির হতে লাগল। কেউ গাছ কাটার ক্ষতিপূরণ চায়, কেউ কৃষি জমির ঘাসের ওপর দাবি করে, কেউবা জমিজমার ক্ষতিপূরণ বিষয়ে। এসব নিয়ে প্ল্যান্টার ও জনসাধারণের মধ্যে একটা বিবাদের আশঙ্কা দেখা দিল। কিছু কিছু ঘটনার পরিণামে রক্তারক্তি এবং মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়াল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি এরকম জটিল পুলিশি তদন্ত কাজ খুব কমই করেছি।

সেই সময়ে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আমি আরো ভালো কোনো জেলায় বদলি হতে চাই কি না। তখন চট্টগ্রাম জেলার দুর্নাম ছিল জ্বরজারির ব্যাপারে। আমি বদলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। কারণ আমি এখানে ভালোই ছিলাম, স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা আমার ছিল না। তাছাড়া এটাও ভেবেছি যে চট্টগ্রামের মতো খোলামোলা পরিবেশ আর কোথাও পাব না। এখান থেকে দূরে যে নীল পাহাড়ের ছায়া দেখা যায় দক্ষিণ দিকে, সেটা আমাকে হাতছানি দেয় সর্বক্ষণ। অরণ্যের প্রতি আমার ভীষণ আকর্ষণ কাজ করে সবসময়। গতবার দক্ষিণের অরণ্যে ঘুরতে গিয়ে আদিম অরণ্যের বুনো জীবনের প্রতি জেগে ওঠা সেই তৃষ্ণা যেন আরো বেড়ে গেছে। আমি দেখেছি আমার জেলার অন্তত অর্ধেক মানুষ আমার মন-মানসিকতার; বিশেষ করে যারা বার্মা থেকে এসে

পাহাড়ে বসত করেছে সেই উপজাতি মানুষেরা। আমি তাদের বুঝি, তাদের সাথে মন খুলে মিশতে পারি। যেটা সমতলের বাঙালিদের সাথে পারি না, তারা নিম্নবঙ্গের অন্য জেলার বাঙালিদের মতোই ধূর্ত, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী ধরনের মানুষ।

মগ জাতির লোকেরা দেখতে গোবেচারা টাইপ, নির্বিবাদী ধার্মিক, কোনো রকম বর্ণবিভেদ নেই তাদের। আমি তাদের সাথে খেয়ে দেয়ে আনন্দ করতে পারি, বন্ধুত্ব পাতাতে পারি। কিন্তু চট্টগ্রামের বাঙালিরা হলো বেড়ালের চামড়া পরা ধূর্ত শেয়ালের মতো। তারা কখনো আমার ভাই বন্ধুর সমতুল্য হতে পারে না। আমি যদিও চট্টগ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজি ছিলাম না, কিন্তু এখানে পুলিশি কাজের বাইরে অন্য কিছু করার সুযোগ খুঁজছিলাম। একবার যে পুলিশে ঢোকে, সারাজীবন সে পুলিশ হয়ে থাকবে আমি এটাতে বিশ্বাসী নই। আমি ব্রিটিশ বার্মার চিফ কমিশনার কর্নেল ফেইরের কাছে বার্মিজ এলাকায় চাকরির আবেদন করলাম। কিন্তু এটা নিশ্চিত জানতাম যে এখানে জোরদার লবিং কিংবা স্বজনপ্রীতি ছাড়া এসব কাজ সফল হয় না।

৭. কক্সবাজারে হাওয়া বদল

জুন মাসে আমি প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামের স্থানীয় জ্বরে আক্রান্ত হলাম। দুদিনের মধ্যেই এই দুষ্ট জ্বরে এমন ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে আমাকে ডাক্তার বলল হাওয়া বদল করতে। আমি একশ মাইল দক্ষিণের সাব-ডিভিশন কক্সবাজারের দিকে যাওয়ার মনস্থ করলাম। আমি কৌতূহলী ছিলাম মি. কক্স, যার নামে ওই শহর, তার বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান করতে। কিন্তু আমার মাথাটা কুইনাইনের ডোজে এমন টলোমলো হয়ে গিয়েছিল যে সেই কাজটা ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখলাম। আমার জন্য বরাদ্দ ছোট পুলিশ ইয়টে উঠে প্রশান্তি লাভ করলাম। দুটো বড় বড় আরামদায়ক কেবিন, নদীতে বেয়ে যাওয়ার জন্য দুপাশে ছয়টি করে দাঁড় সংযুক্ত আছে। ফোম নামের এই নৌযানে করে আমি রওনা দিলাম ১১ জুন। অনেক আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে এবং দ্বীপসমূহকে পেছনে ফেলে ১৭ জুন আমরা কক্সবাজার পৌঁছে গেলাম।

বহুবছর আগে মি. কক্স এখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনি এখানে বসতি গড়ে তুলেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে। এটা অনেকটা কাঠের তৈরি শহর বলা চলে। বাংলার অন্য সব জায়গা থেকে ভিন্ন চেহারার। এখানকার বাড়িগুলো মজবুত কাঠের তৈরি। বাড়ির মেঝে তক্তা দিয়ে বানানো, বাড়ির ছাদ শক্ত কাঠের কারুকাজ এবং তালপাতার সমন্বয়ে তৈরি।

পোশাক, চালচলন ধর্ম সবকিছুতে এখানকার বাসিন্দারা বাঙালিদের চেয়ে আলাদা। কক্সবাজারের সরল মনের এই রাখাইন মগেরা সদাহাস্যপ্রিয় এক

জাতি। তারা কঠিন কাজ বা পরিশ্রম কী জানে না। কেউ কেউ জাহাজে মাছের ব্যবসা করে, অলস সময়ে সুন্দর রঙচঙে জামা পরে ঘুরে বেড়ায়, ছোট ছোট তামাকের রোল দিয়ে ধূমপান করে, কানে ফুল গোঁজা থাকে, ঠোঁটে স্মিত হাসি। অগুণতি ভোজন উৎসব চলমান থাকে সারা বছর, নানান জাতের মাছ, সাথে বৈচিত্র্যময় সবজির সমাহার এবং কালো জাতের চাল। এই সমস্ত কিছু নিয়ে আনন্দ উল্লাসে, প্রার্থনায়, নাটকীয় কর্মকাণ্ডে তাদের দৈনিক জীবন কেটে যায়।

পুরুষরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে খুব পরিশ্রম করে। কিন্তু যখন তীরে থাকে—তারা কিছুই করে না। আমি যা বলেছি তার বাইরে কিছু করতে দেখা যায় না। তাদের নারীরা নিজ নিজ কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। তারা কোনোরকম আড়াল ছাড়াই ঘরে বাইরে সর্বত্র যাতায়াত করে, বন্ধু বা পরিচিতজনদের সাথে নির্দ্বিধায় মেশে, দোকানে বেচা-কেনা করে, সংসারের নানা বিষয়ে খবরদারি করে। বয়স্কদের ওরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তরুণীরা ঝলমলে রঙিন সিল্কের জামা পরে, হাতে ছোট্ট ছাতা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা তাদের চকচকে কালো চুল ফিতা দিয়ে মাথার পেছনে যত্ন করে খোঁপা করে, সেই খোপায় অর্কিড ও নানান রকমের ফুল সাজানো থাকে।

রাখাইনদের সময়ের হিসাবটা অনেক প্রাচীন এবং একটু অদ্ভূত। তাদের রাতের সময়টা কয়েক ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, বাচ্চাদের ঘুমের সময় হলো আটটা থেকে দশটা। তারপর বয়স্কদের ঘুমের সময় দশটা থেকে এগারোটা। সবশেষে তরুণদের ঘুমের সময় এগারোটা থেকে বারোটা। এই শেষ সময়টা তরুণ-তরুণীদের মেলামেশার জন্য যুক্ত এবং এই সময়ে তাদের হৃদয়ের লেনদেন ঘটে।

আমার কক্সবাজার আগমনের পরের রাতে আমাকে ‘পই’ নামে পরিচিত বার্মিজ নাটক দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করা হলো। আমি যখন নদীতে নোঙর করা আমার নৌযান ‘ফোম’ ত্যাগ করে থিয়েটার দেখতে যাই, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। থিয়েটারটি আসলে বড়সড় একটা তাঁবু যা শহরের বাইরের দিকের একটা ময়দানে স্থাপন করা হয়েছে।

নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে আমার জন্য বিশেষ সম্মানজনকভাবে রাখা ‘সাহেব’ চেয়ারে গিয়ে বসলাম এবং চারপাশে তাকালাম। দারুণ বৈচিত্র্যময় একটা দৃশ্য। সমস্ত জায়গাটা দর্শকে ঠাসাঠাসি, নারী পুরুষ শিশু সবাই মাটিতে বসে আছে। সবাই তামাকের রোল দিয়ে ধূমপান করছে। সবার গভীর মনোযোগ মঞ্চের দিকে, আমার আগমনের সাথে সাথে নাটকও শুরু হলো।

প্যান্ডেলের মাঝে মূল খুঁটিটা নানারকম ফুল পাতার মালায় আচ্ছাদিত। প্যান্ডেলের একপাশজুড়ে মঞ্চ নির্মিত, তবে তা ঘাসের ওপর, দর্শক সমান্তরালে স্থাপিত। মঞ্চকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য কিছু বাঁশের তৈরি অদ্ভুতদর্শন মুখোশকে সারিবদ্ধভাবে সুতোয় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু মুখোশে মানুষের চেহারার নানা অঙ্গভঙ্গির ছবি, কিছু মুখোশে দৈত্যদানোর

ভয়াল চিত্র, কিছু জায়গায় ঘোড়া, ভালুকসহ নানান প্রাণীর ছবি। সেই মুখোশচিত্রের সারিটা যে দড়িতে ঝোলানো সেটা একটা ঢেউ খেলানো ভঙ্গিতে নাচছিল। ঝোলানো মুখোশের দড়ির একটা প্রান্ত কোনায় বসা একজনের পায়ের বুড়ো আঙুলের সাথে বাঁধা আছে, তার পায়ের মৃদু নড়াচড়ার সাথে মুখোশগুলো বিচিত্র ভঙ্গিতে নেচে নেচে উঠে দর্শক মনোরঞ্জন করছে।

মঞ্চের বামদিকে বসেছে বাদকদল যাদের মধ্যে ড্রামই হলো প্রধান বাদ্যযন্ত্র। তাদের যে নেতা সে এমনভাবে বাজাচ্ছে মনে হচ্ছে সে একাই একশ। আমি আসন গ্রহণ করার পর দেখা গেল এক চায়নিজ মোড়ল টাইপ লোক জনাছয়েক সহচর নিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে মঞ্চে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর শুরু হলো ট্র্যাজিক এক নাটক। যদিও তাদের ভাষাটাষা বোঝার সাধ্য ছিল না কিন্তু ঘটনা অনুমান করে নেওয়া কষ্টকর নয়। একের পর এক নাটকীয়তার মাধ্যমে অভিনয় দর্শক হাততালি কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল।

নাটকের অবসান ঘটতে ঘটতে ভোর হয়ে আসছিল। আমি ইতোমধ্যে দুই ঘণ্টা উপভোগ করে ফেলেছি। এবার বুড়ো লোকদের ঘুমানোর সময় হয়ে এলো। আমি আমার 'ফোম' জাহাজের মশারির নিচে ঘুমোবার জন্য উঠলাম।

কক্সবাজার অবস্থানকালে আমার সাথে এক চিন-হ্লা-ফ নামের এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর পরিচয় ঘটেছিল যিনি কলকাতা ও বার্মার সাথে ব্যবসা করেন। আমি তাঁর কাছ থেকে বার্মা ও বার্মা হতে এখানে বসতি গড়া লোকদের ধর্ম সংস্কৃতি আচার আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইতাম। ভদ্রলোক একটু দার্শনিক ধরনের ভাবধারা রাখেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধকের মতো উত্তর দিতেন। বার্মা থেকে যেসব লোক ব্রিটিশ এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে তারা মগ হিসেবে স্থানীয়ভাবে পরিচিত। এরা সব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আমার কাছে মনে হয় প্রাচ্যের সকল ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধরাই সবচেয়ে আন্তরিক এবং মানবিক।

আমি পরদিন সন্ধ্যায় ফোম জাহাজ নিয়ে সমুদ্রপথে রওনা দিলাম। চারপাশ অন্ধকার কিন্তু বেশ চমৎকার হাওয়া বইছিল। সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন স্থানে ঢেউয়ের মধ্যে সামুদ্রিক জৈব রসায়নের প্রভাবে ফসফরাসের উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন একরাশ জ্যোৎস্না সমুদ্র থেকে উঠে আসছে ঢেউয়ের হাত ধরে। অনুকূল বাতাসে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছিল। এই কদিনে আমি আমার অফিসিয়াল পরিদর্শনের দায়িত্ব শেষ করলাম কক্সবাজারে। সমুদ্র স্নান করলাম, এখানকার বিখ্যাত সমুদ্রের ঝিনুক খেলাম। সব সেরে আবদুল মাঝিকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে বললাম।

৮. নতুন অভিযানের স্বপ্ন

আমি চট্টগ্রাম পৌঁছে গেলাম ২৭ জুন। আমরা যখন নদীতে প্রবেশ করলাম, তখন চারদিকে বন্যার জল থই থই করছে। আমার জাহাজ জেটির কাছাকাছি

পৌঁছানোর পর নোঙর ফেলার ঝনঝন শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই কালো কাঠের জেটির ছায়ার মধ্য থেকে আমার নৌকাটা সাঁই করে বের হয়ে জাহাজের গায়ে এসে লাগল। নীল শার্ট পরা চার পুলিশ সেই নৌকায়।

তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তেল চকচকে পেটমোটা এক ইন্সপেক্টর। তার হাতে একতাড়া চিঠিপত্র কাগজের বান্ডিল। সরকারি চাকুরের কাজ বিরামহীন। শহরে ঢুকতে না ঢুকতেই কাজের ফিরিস্তি এসে হাজির। আমি জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নেমে সিঁড়ির পাশে অপেক্ষমাণ আমার ধূসর ঘোড়ায় উঠে বসলাম। ঘোড়ায় করে টিলার ওপর হালকা সবুজ রং করা আমার ছোট্ট বাংলোটিতে প্রবেশ করলাম। এটাকেই আমি এখন বাড়ি বলি।

চট্টগ্রামে থাকার সময় আমাকে রোজ ভোরে জেগে উঠতে হতো প্যারেডের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। কেন জানি না সেই স্কুলজীবন থেকে ভোরে জেগে ওঠার কাজটা আমার কাছে শাস্তির মতো লাগে। এখানে আমাকে নির্দেশ দেওয়ার মতো কোনো কমান্ডিং অফিসার নেই, তবু আমি নিজ দায়িত্বেই ভোরে উঠে যাই। মাঝে মাঝে মনে হয় ভোরে জেগে ওঠার মধ্যে যে একটা আত্মগৌরব আছে আমি সেটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করছি কি না। কিন্তু যার ঘুম সহজ নয়, ঘুমোনোর জন্য অনেক কসরত করতে হয় তার জন্য এই ব্যাপারটা সত্যি একটা অত্যাচার। অনেকে আছে চট করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আমি সহজে ঘুমোতে পারি না। আমার মিলিটারি জীবন ছেড়ে আসার পেছনেও এটা অন্যতম কারণ ছিল। সময় নিয়ে অত কড়াকড়ি নিয়ম আমার পোষায়নি।

সেরকম এক ভোরে অনিচ্ছুক জেগে উঠে আমি বিমোহিত হয়ে গেলাম দূরের নীল পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। চূড়োর আশপাশে এখানে সেখানে পেঁজা তুলোর মতো টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে আছে সারিবদ্ধভাবে।

তারা যেন আমার ওপর জাদু করেছে এবং দূর থেকে ইশারায় নিমন্ত্রণ পাঠাচ্ছে। এসো, আমাদের কাছে চলে এসো।

ওই পাহাড়গুলোর অধিকাংশই চট্টগ্রাম জেলার সীমানার বাইরে। ফলে আমার আইনগত সীমানারও বাইরে অবস্থিত। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে কী না করা যায়। ওদিকের অনির্ধারিত সীমান্ত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ইংরেজ অফিসার ছিলেন যার কুঠি ছিল চন্দ্রঘোনায়। জায়গাটা কর্ণফুলী নদী দিয়ে এক দিনের পথ। চন্দ্রঘোনা থেকেই পার্বত্য অঞ্চলের শুরু বলা যায়। কিন্তু সেই দুর্ভাগা অফিসার পাহাড়ের সেই সৌন্দর্য অবগাহনে অক্ষম। তিনি সবসময় পার্বত্যবাসীদের নিন্দায় মুখর থাকেন। তাদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। কোনো আগ্রহও নাই সেই বিষয়ে।

বস্তুতপক্ষে কর্ণফুলীর দক্ষিণ দিকের সেইসব পার্বত্য এলাকা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা নেই কারো। অধিকাংশ এলাকাতেই কোনো ইউরোপিয়ানের পা পড়েনি। আমি যতটা সম্ভব সেইসব পার্বত্য এলাকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করি। বিশেষ করে কুকি, সেন্দু, ইত্যাদি উপজাতি যারা

সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে এবং ব্যবসাবাণিজ্য করে। এরা মাঝে মাঝে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ করে কারো মাথা কেটে নিয়ে যায় কিংবা কাউকে দাস হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। তবে বেশিরভাগই শোনা কথা। এদের সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ওইসব অঞ্চলে একমাত্র কাঠুরিয়া ছাড়া আর কেউ যায় না। বাঙালি কাঠুরিয়ারা দল বেঁধে শীতকালে ভেতরে প্রবেশ করে মূল্যবান কাঠ কেটে নিয়ে আসে। তাদের মুখে শোনা যায় কথিত বর্বর জাতির রহস্যময় গালগল্প। সেইসব জাতি-লোকদের লেজ আছে, তারা গাছের মধ্যে ঘর বেঁধে বসবাস করে ইত্যাদি অবিশ্বাস্য কাহিনি সব। তবে এসব কাহিনি শুনে আমি খুব আগ্রহী হয়ে পড়লাম তাদের সম্পর্কে আরো জানার জন্য। আমি নিজে গিয়ে সেই এলাকা ঘুরে দেখে আসতে চাই।

বিষয়টা নিয়ে আমি কমিশনারের সাথেও আলাপ করলাম। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে আগ্রহী। সুতরাং আমি পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালানোর জন্য আমার ঊর্ধ্বতন কর্তার কাছে লিখিত আবেদন করি। যেন আগামী শীতেই আমি যাত্রা করতে পারি। অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যান্য বিষয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠাই। এখানকার কমিশনার খুব ভালোমানুষ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধুর মতো। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ আছে, তিনি আমাকে অনেক ব্যাপারে সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তিনি রাজনৈতিকভাবেও উদারপন্থি মানুষ।

আরো একটি ব্যাপারে আমার অফিসের কাছে আমি কৃতজ্ঞবোধ করি। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ব্যক্তিগতভাবে আমাকে একটা বড় অংকের টাকা বরাদ্দ করলেন খরচপাতি করার জন্য। এরকম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো, আমি মোটামুটি দশ দিনের মধ্যে রওনা হতে পারি। তবে এই অভিযানের জন্য অফিসিয়াল কোনো বরাদ্দ দেওয়া যাবে না। অন্য কথায় বলতে গেলে এটা পুরোপুরি আমার নিজ দায়িত্বে করতে হবে।

তবু আমি আনন্দিত বহুল কাঙ্ক্ষিত এই ভ্রমণের অনুমতি পাওয়ার জন্য। আমি যাত্রার জন্য জিনিসপাতি জোগাড় করতে শুরু করলাম। বেশকিছু বস্ত্রসামগ্রী, নানান রঙের পুতির মালা, পিতলের আংটি, জরি লাগানো দৃষ্টিনন্দন ব্রেসলেট ইত্যাদি। বেশ কয়েক বাক্স পানীয়ের বোতল নিতেও ভুললাম না। আমাকে বাঙালি কাঠুরিয়ারা বলেছিল যে পাহাড়িরা খুব কড়া মদ খায়, তাদের মাথা খুব শক্ত, সহজে মাতাল করা যায় না। তাই আমি কিছু কড়া স্পিরিটের বোতলও নিলাম, এগুলো খেলে সবচেয়ে শক্ত মাথার লোকটাও মেঝেতে লুটিয়ে পড়বে। আমি দুটো হাতি ধার নিলাম আমার জিনিসপত্র বহন করার জন্য। আমার জন্য মশারি সমৃদ্ধ ক্যানভাসের ফোল্ডিং বিছানা নেওয়ার নির্দেশ দিলাম। এছাড়া ক্যানভাসের তৈরি লোহার ক্যাম্পচেয়ার, ছোট একটা ফোল্ডিং টেবিল আর প্রয়োজনীয় ডেকচি পাতিল নিতে বললাম। এগুলোই

আমার জন্য যথেষ্ট। এই সব জিনিস আবার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে তোলা হলো যাতে পরে কুলিরা এগুলো বহন করতে পারে। আমাকে বলা হয়েছিল সমভূমি পার হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করার পর আমাকে হাতি বাদ দিয়ে এগোতে হবে।

যাত্রার আগের রাতে আমার সম্মানে একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি হলো কমিশনারের বাড়িতে। সেখানে বেশকিছু চমৎকার গান বাজনার আয়োজন করা হয়েছিল। পরদিন সকালে আমি পার্বত্য অঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করলাম।

নীল পাহাড়ে অভিযান

৯. দক্ষিণ চট্টগ্রামের পার্বত্য পথে

আমি দীর্ঘ সময় ধরে গভীরভাবে আমার পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছিলাম এবং মনে মনে পণ করেছিলাম যে দক্ষিণ-পূর্বদিকেই চলে যাব। চট্টগ্রামের উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তেমন আকর্ষণীয় কোনো জায়গা নেই। এর অধিকাংশই ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলার রেগুলেশন ডিস্ট্রিক্ট। বাকি কিছু অংশ শাসন করে ত্রিপুরার রাজা। ওই এলাকার বেশিরভাগ এলাকাই জলা জংলায় ভর্তি, জনবসতি তেমন নেই, লম্বা লম্বা ঘাসে ভরপুর বিস্তীর্ণ সমভূমি। পূর্বদিকে আমি যদি কর্ণফুলী নদী ধরে এগিয়ে যাই। ওটার উৎস সুদূর লুসাই পাহাড় পর্যন্ত যেতে পারব। তবে সে পথে গেলে একটা সমস্যা হলো, সেখানে এক ইংরেজ অফিসার আছেন যিনি পার্বত্য এলাকার সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি হয়তো জানতে চাইবেন তার এলাকায় আমার কাজ কী?

অতএব, আমার কাছে থাকা মানচিত্রটা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করার পর সিদ্ধান্ত নিলাম যে এখান থেকে কিছুটা দক্ষিণ দিকে গিয়ে তারপর সোজা পূর্বদিকে গেলে আমি বার্মা অঞ্চলে পৌঁছাতে পারব। আরো পুবদিকে গেলে হয়তো চীন পর্যন্ত যাওয়া যাবে। ওদিকটা একেবারেই অজানা অঞ্চল যেখানে এ যাবত কোনো ইউরোপিয়ানের পা পড়েনি।

এই পরিকল্পনা আমি নিজের মধ্যেই পাথরচাপা দিয়ে রাখলাম। এখানে কাউকে বলা যাবে না। কারণ আমি ভালো করেই জানি এরকম অভিযান বা নতুন এলাকা আবিষ্কার কোনো পুলিশের কাজের আওতায় পড়ে না। আমি যেটা করতে চাই সেটা হলো একটা অজানা পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া, তারপর যা হওয়ার হবে।

১৪ নভেম্বর ১৮৬৫ আমি অভিযানে রওনা দিলাম। আমার সাথে সার্জেন্ট ফজুল্লা খানের অধীনে ছয় পুলিশ সদস্য ছাড়াও স্থানীয় দুই ভৃত্য ছিল। ফজুল্লা খান সেই হাজারীবাগ থেকে আমার সঙ্গে আছে। সে আমার সঙ্গ ছাড়া কোথাও যেতে রাজি নয়। আমার ভাগ্যের সাথে সে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে।

আমাদের মালামাল বহনের জন্য দুটো হাতি ছিল। তবে সেখানে আমাদের নিজেদের জিনিস বেশি ছিল না। আমি বেশি খাবারদাবার নেইনি। আমার বিশ্বাস ছিল চলতি পথে গ্রাম থেকে খাবার সংগ্রহ করা যাবে। অধিকাংশ মালামাল হলো পার্বত্যবাসীদের জন্য নেওয়া উপহারসামগ্রী। এসব জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে এগুলোকে পেছনের বড় হাতির পিঠে খুব ভালো করে বেঁধে নেওয়া হয়েছে।

আমি সরাসরি দক্ষিণ দিকে রওনা দিলাম। প্রথমে আমাদের থানাগুলো যে পথে আছে সে পথ ধরে এগোতে লাগলাম। জঙ্গলে ঢোকার আগে যতটা সম্ভব ভালো রাস্তা ধরে এগোতে চাই।

২০ নভেম্বর আমি মানিকপুর নামের একটা জায়গায় পৌছালাম যেটা সমভূমির শেষ গ্রাম। এই ছয় দিন আমরা ধীর পদক্ষেপে এগিয়েছি এবং পুরো দলটিই বেশ সাবলীলভাবে হেঁটেছে। এখানে এসে আমি খেয়াল করলাম যে আমার সঙ্গীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সাথে নিয়ে এসেছে। আমি কিছু কিছু জিনিস বাতিল করতে শুরু করলাম যাতে বোঝা হালকা হয়।

এই মানিকপুরেই আমাদের হাতিগুলো ছেড়ে দিতে হবে। এরপর আমাদের মালামাল কুলিদের পিঠে নিতে হবে অথবা নৌকায় করে নিতে হবে, যেটা সুবিধা হয়। বোঝা মনে হওয়ায় আমি আমার তাঁবুটাও ফেলে দিলাম দ্বিতীয় দিন। এখন আমি আমার জামাকাপড়ও বাদ দিচ্ছি। আমার নিজের খাবার ব্যবস্থার জন্য রাখলাম একটা লোহার পাত্র, একটা ফ্রাইং প্যান, দুটো টিনের থালা। আর আছে একটা ছুরি আর কাঁটা।

১০. মুরংদের গ্রামে

মানিকপুর ছেড়ে পাহাড়ি অঞ্চলে ঢুকতেই দৃশ্যপট বদলে যেতে থাকে। আশপাশের দৃশ্যাবলির মধ্যে যে বুনো সৌন্দর্য সেটা দেখে আনন্দে মন ভরে যায়। সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা রোমাঞ্চ জাগতে শুরু করল বুকের ভেতর। কয়েকদিনের এই ভ্রমণটাকে যদি এমন দূরত্বে নেওয়া যায় যেখানে আমার নাগাল পাবে না কেউ, আমাকে ফেরার জন্য ডাকতে পারবে না কেউ, তা হলে কী দারুণ ব্যাপারই না হবে।

আমাদের যাত্রাপথ চলে গেছে সরু একটা পার্বত্য নদীর ধারা বেয়ে। আমরা ছোট ক্যানু ধরনের নৌকায় করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কয়েকদিন পর ২৯ নভেম্বর আমরা মুরংদের একটা গ্রামে পৌছালাম। এখানে থেমে আমরা সামনের পথঘাটের ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। এখন আমাদের যাত্রার বাহনে পরিবর্তন আনতে হবে। নৌপথে আর সামনে যাওয়া যাবে না।

এই গ্রামের রোয়াজা বা মোড়ল আমাকে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু আমি নদীর তীরে ক্যাম্প করে স্বাধীনভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। আবহাওয়া বেশ চমৎকার এবং মেঘমুক্ত, ফলে আমাদের কোনো আশ্রয়ের প্রয়োজন হচ্ছে না। আমার গাইড গোঁড়া হিন্দু। সে মুরংদের গ্রামে থাকাটা পছন্দ করে না। তার মতে এদের আতিথ্য গ্রহণ করলে তার ধর্মনাশ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আমরা যে নদী ধরে এসেছি সে নদীর তীরে একটা বালিয়াড়ির ওপর ক্যাম্প করলাম। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনাগুলো কলকল শব্দে ছুটে

যাচ্ছিল ফেনা ছড়িয়ে। নদীর তীরের সবুজ গুল্মগুলো রঙিন পাথরের মতো ঝিকঝিক করছিল। নদীর স্বচ্ছ তলদেশের পাথর থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে বেগুনি আর সোনালি রঙের আলোকছটা নেচে বেড়াচ্ছিল। আরো একটু ভাটির দিকে ধূসর বিশাল সব পাথর দেখা গেল। যেগুলো কোনো এক সময় পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল প্রবল জলস্রোতে। এখানেই আমি আমার মাদুরটা বিছিয়ে বিছানা পাতলাম। আমার সার্বক্ষণিক বিশ্বস্ত সঙ্গী, মগ রাঁধুনী টোবি। সে আমার তাঁবুর পাশেই রান্নার আয়োজন করতে বসল।

বেচারা টোবি! গত কয়েকদিন ধরে তার অনুভূতি প্রবলভাবে আহত হচ্ছিল এই বর্বর অঞ্চলে এসে। কারণ সে যদি এখন কলকাতা থাকত, কোনো সরকারি বাড়িতে রান্নাঘরের তুচ্ছ কাজও পেত, তবু সে নিজেকে নিয়ে গর্ব করতে পারত, কারণ সে সিভিলিয়ানদের রান্নাবান্নায় অভ্যস্ত। সে খুব ভালো করে জানে কোন রান্না কীভাবে করলে আধুনিক এবং ভদ্রজনোচিত হয়। এখন যেই বর্বর এলাকায় ভ্রমণ করতে হচ্ছে এবং যে ধরনের রান্নাবান্না করতে হচ্ছে এগুলো তার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে। প্রথমত, তাকে কাজ করতে হচ্ছে মাত্র দুটো পাত্র নিয়ে। এটা তার জন্য দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে সে মাত্র দুই পাত্র দিয়ে যে চমৎকার রান্না করছে সেটা এক ডজন বাবুর্চিও পারত না এবং এটাই তার সাথে অন্যদের পার্থক্য।

এই প্রশংসা তাকে সাময়িকভাবে স্বস্তি দিল ঠিকই, কিন্তু খানিক পরেই চেহারার মধ্যে চরম অসন্তুষ্টির ছাপ নিয়ে ফিরে এলো। তার হাতে একটা মোটাতাজা সুন্দর ব্যাঙ, সাথে কিছু চাল আর শাকসবজি।

'কী সর্বনেশে কথা সাহেব, আমি নাকি আপনার জন্য এটাই রান্না করব আজ!'

খাবারগুলো আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন এখানকার রোয়াজা। আমি টোৰিকে এই বলে বশ মানালাম যে ব্যাঙটা আমার জন্য রান্না করা যায় বটে, তবে কোনো একজন পাহাড়িকে দিয়ে বিশুদ্ধভাবে রান্না করাতে হবে।

ব্যাঙটা কচি সবুজ ফার্ন আর 'বগলি' নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত কলাগাছের কাণ্ডের সবজি দিয়ে রান্না করা হলো। খেতে গিয়ে আমার কাছে খুব খারাপ লাগল না।

কিন্তু রোয়াজা যখন পরদিন আমাকে আরো সুস্বাদু বলে বিবেচিত 'গিরিগিটি ভাজা খাওয়াবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেই ব্যাপারটা আমি টোবিকে জানাতে ভরসা পেলাম না।

আমার বাবুর্চির আসল নাম 'তোবে- ধুন', কিন্তু আমি ওটাকে সংক্ষেপ করে ইংরেজি কেতায় টোবি নামে ডাকি। যেমন আমার সার্জেন্টের নাম ফয়েজউল্লাহ খান, ওটাকে প্রথমে সংক্ষেপ করে ফয়জুল্লা করেছি, তারপর ক্রমশ ফজুল্লা হয়ে গেছে সেটা।

বিকেলের দিকে সহৃদয় রোয়াজা গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক লোক সাথে নিয়ে আমার সঙ্গে সাড়ম্বরে দেখা করতে এলেন। তাদের দেখে আমি স্পিরিটের বোতলগুলো বের করলাম। বাঁশের চোঙার তৈরি স্থানীয় কায়দার কাপে করে মদ বিতরণ করা হলো। পেটে যাওয়ার পর সবাই একবাক্য স্বীকার করল সত্যিকারের শক্তিশালী মদ বটে।

স্পিরিটের তৈরি মদের একটা সুবিধা হলো ওটার কোনো রং নেই, পানির মতো। আমি কৌশলে আমার কালো বোতলে রাখা পানিতে চুমুক দিতে লাগলাম অতিথিদের মদের সাথে তাল মিলিয়ে। এটা আমাকে মাতাল হওয়া থেকে রক্ষা করল, সেইসাথে মাথাটাও পরিষ্কার রাখল।

মাথা পরিষ্কার রাখার দরকার হলো কায়দামাফিক গল্প জমানোর জন্য। গালগল্পের আসর জমিয়ে এই মুরং রোয়াজাকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ এখান থেকে আমাদের যাত্রা করতে হবে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। নৌপথে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। আমার অন্তত আট দশজন কুলি লাগবে মালপত্রগুলো বহন করার জন্য। এই ব্যাপারে রোয়াজার আন্তরিক সাহায্যের জন্য তাকে আমার কাছে টানতে হবে যে কোনো উপায়ে। আড্ডা আলাপে কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পর্কটা একটু উষ্ণ হয়ে উঠল। আমি সেটাকে আরো ঘনিষ্ঠ করার পরিকল্পনা করলাম। একটু কায়দা করে জানতে চাইলাম-

‘সম্মানিত রোয়াজা, আপনার নামটা কী জানতে পারি?”

‘আপনার যাত্রার শুভকামনা করে বলছি, আমার পুরো নাম হলো তোয়েকাম তংলুইন’।

‘অ্যা? বলেন কি! ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো! আচ্ছা বলুন তো আপনার গোত্রের কেউ কখনো কালাপানি পাড়ি দিয়েছিল?’

‘কক্ষনোই না। কিন্তু এই প্রশ্ন কেন সাহেব?’

‘কারণ আমার নামের সাথে আপনার নামের এত মিল! আমরা দুজনই নিশ্চয়ই একই বংশ থেকে জন্ম নিয়েছি।’

আমার কথা শুনে রোয়াজা রীতিমতো হতভম্ব। উপস্থিত অন্যা বুড়োদের চোখে ধাঁধা আর বিভ্রান্তির ছাপ।

‘আপনার পুরো নাম কী সাহেব?’

ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আমার আসল নামটাকে খানিক বিকৃত করে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম—’আমার নাম আরবাট তোংলুইন (আসলে হারবার্ট টম লুইন)

আমার নামের সাথে নিজের নামের মিল দেখতে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন রোয়াজা। তোয়েকাম তংলুইন এবং আরবার্ট তংলুইনের এই নতুন বন্ধন আবিষ্কারের সম্মানে তিনি আমার সাথে তামাকের পাইপ বদলাবদলি করলেন। আরো এক দফা স্পিরিটের মদ গেলা হলো।

এই অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনায় রোয়াজার সাথে জাতিগোত্র বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হলো আমার। বিশ্বসৃষ্টির গোড়া থেকে মানবজাতির

আগমন পর্যন্ত মুরংদের বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো। কীভাবে ঈশ্বর প্রথমে বৃক্ষ এবং জল সৃষ্টি করল, কীভাবে সৃষ্টির ভুলে কুমিরের জন্ম হলো, কীভাবে তারা মানুষের অনিষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত হলো সেই বিষয়ে রোয়াজার মুখে বিচিত্র সব গল্প শুনলাম। মুরংদের বিশ্বাস ঈশ্বর যখন মাঝে মাঝে ঘুমায় তখন মানুষ মরে যায়। ঈশ্বর যদি একটু কম ঘুমাত তা হলে তারা আরো বেশিদিন বাঁচত। এসব বায়বীয় বিষয় আলোচনার মাধ্যমে রোয়াজার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আমি তোয়েকাম রোয়াজার বাড়িতে ফিরতি সফরে গেলাম। আমাকে খুব সম্মানের সাথে বরণ করা হলো। তাঁর বাড়ির সামনের একটা চৌকির ওপর পরিষ্কার বেতের তৈরি মাদুর বিছিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ছোট কাপে করে এখানকার স্থানীয় কায়দায় তৈরি করা মদ পরিবেশন করা হলো। এগুলো না কি ভাত থেকে তৈরি হয়।

একটা বিরতির পর আমাকে ঘরের ভেতরে নেওয়া হলো যেখানে রোয়াজার স্ত্রী ও কন্যার রান্না করা ঝলসানো শূকরের মাংস খেতে দেওয়া হলো। সেই সাথে ভাত পরিবেশন করা হলো কাঠের থালায় করে। রান্নার কায়দাটা বর্বর প্রকৃতির হলেও খেতে গিয়ে খুব একটা খারাপ লাগল না। ছোট থালাগুলো আমার সামনে রাখা হলো টেবিল ক্লথের মতো বিছানো কলাপাতার ওপর।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করার সুযোগে দেখতে পেলাম এখানকার নারীরা যে কাপড় দিয়ে বুক ঢাকে, ঘরের মধ্যে সেটা খুলে রেখে কোমরে শুধু ছোট এক ফালি কাপড় পরে কাজ করে। খাওয়ার পাঠ চুকানোর পর আমরা আবারো উঠোনের সেই চত্বরে বসলাম। গ্রামবাসীরা নেচে গেয়ে আমাদের বিনোদিত করল। বাদ্যযন্ত্রগুলো লাউয়ের খোলের মধ্যে একটা চোঙা লাগানো। সেই চোঙার মধ্যে একটা ছিদ্র আছে ওটায় ফুঁ দিয়ে ৰাজাতে হয়। প্রত্যেক বাদকের হাতে একটা করে যন্ত্র। নানান সুর-তালে বাজনা বাজাচ্ছে। একজন বাজানো শেষ করলে আরেকজন শুরু করে। অনেকটা রাশিয়ান শিঙ্গা বাদ্যের মতো। ছোটদের জন্য নিচুমাত্রার সুর, বড়দের জন্য উঁচুমাত্রার সুর যেখানে জোরে ফুঁ দিতে হয়। তারপর আরেকটা দল গুনগুন করে গান গাইল ধীরগতিতে। গান না বুঝলেও পুরো বাদক দলের তাললয়ে একটা সমন্বয় ছিল সেটা বোঝা গেল।

নৃত্য পরিবেশনের জন্য আনুষ্ঠানিক পোশাক পরা, মাথায় পালক গোঁজা, কুড়াল বর্শা হাতে কয়েকজন তরুণ। দীর্ঘ সময় ধরে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে নৃত্যানুষ্ঠান চলল।

মাঝে মাঝে নর্তকরা একটু বিরতি নিচ্ছিল এবং বিচিত্র কিছু শারীরিক কসরত দেখাচ্ছিল। সবশেষে গোল হয়ে পাশাপাশি ঘুরতে ঘুরতে নাচ শেষ করল।

অনুষ্ঠান দেখে উল্লসিত হওয়ার মতো আহামরি কিছু মনে হলো না। তারপর আবারো গল্পগুজব শুরু হলো। ছোট ছোট কাপে করে মদ পরিবেশন করা

হলো। কেউ শুকনো তামাক পাতা পুড়িয়ে ধূমপান করছিল। মহিলারা এসবের জোগান দিচ্ছিল।

আমি খেয়াল করলাম নর্তকদের পেছনে ঘুরতে থাকা কিছু বাচ্চা ছেলে হাতে গিরিগিটি নিয়ে খেলছে। আমরা যখন বসে ধূমপান করছিলাম তখন বাড়ির কার্নিশ থেকে 'ভীমরাজ' নামের একটা দাঁড় কাক উড়ে এসে রোয়াজার মাথায় বসে খুব সম্মানের সাথে কুর্নিশ করল।

এই দয়ালু চরিত্রের প্রকৃতির সন্তানদের সঙ্গ পেয়ে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। সমভূমি ও তার বাসিন্দাদের কাছ থেকে পালিয়ে আসার আনন্দটা জোরদার হলো। এখন রোয়াজার সাথে বন্দোবস্ত করে পরদিনই রওনা দিতে পারি। রোয়াজা নিজে আমার গাইড হিসেবে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি আমার মালপত্র বহন করার জন্য তাঁর গ্রাম থেকে লোকবল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১১. গভীর পার্বত্য জঙ্গল পেরিয়ে সাঙ্গু নদীর তীরে

আমরা পরদিন খুব ভোরে যাত্রা করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনেকটা পথ অতিক্রম করলাম। যাওয়ার পথে আমরা বন্যহাতিদের পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হলাম পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে। যাওয়ার পথে কখনো বাঁশ কেটে পথ করে নিচ্ছিলাম, কখনো আট দশ ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখে মনে হতে পারে একদল পিঁপড়ে খড়ের গাদার মধ্যে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এক জায়গায় আমাদের খাড়া নব্বই ডিগ্রি কোণে নামতে হলো পাহাড় থেকে। নামার সময় পাহাড়ের গর্তে পা দিয়ে, পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা দীর্ঘ লতাপাতা ধরে নামছিলাম আমরা। কিন্তু যারা আগে নামছে সেই গাইড বা কুলিদের জন্য এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ আমার পুলিশ বাহিনী এরকম পথে চলতে অভ্যস্ত নয়, তার ওপর ভয়ে একেকজন এমন কাবু হয়ে আছে যে নামার সময় প্রায়ই তাদের পা হড়কে যাচ্ছিল। তাদের পায়ের ধাক্কায় পাহাড়ের গা থেকে বড় বড় পাথর খসে পড়ছিল। জায়গাটা এমন যে একেকজন যেন ঝুলে থাকা গিরিগিটি, পাথর খসে কারো মাথায় বা কাঁধে পড়লেও সরে যাওয়ার উপায় নেই। তাই যে যেভাবে পারছে কোনোমতে গা বাঁচিয়ে নামার চেষ্টা করছে। সেদিনের পর আমার মনে হলো এই পথে বাঙালি পুলিশ বা কর্মচারীগুলো কোনো কাজে আসবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম সুযোগ পেলেই তাদের ফেরত পাঠাব।

আমার প্রথম পার্বত্য যাত্রায় আমি খুব কাহিল হয়ে পড়লাম। আর সেই ক্লান্তি আর অবসাদকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এখানকার অস্বাভাবিক খাবারদাবার। আমার সমস্ত শরীরজুড়ে জ্বর জ্বর লাগছিল। এইসব অস্বস্তির মধ্যেও আমি সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম যখন দেখলাম অবশেষে আমার ইচ্ছা পূরণ

হয়েছে। আমরা সভ্যতা থেকে অনেক দূরের একটা জায়গায় এসে পড়েছি, নতুন একটা নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছি। রোয়াজা আমাকে বলেছিল যে এই নদীর নাম রিগ্রি খিয়াং। বাঙালিরা এটাকে সাঙ্গু নদী বলে ডাকে।

এই নদীটা বোমাং রাজ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়েছে। এখানে এসে রোয়াজা তোয়েকাম একটু দ্বিধান্বিত হলো। তিনি ভাবছেন আমাকে এই পার্বত্য অঞ্চল পার করার দায়িত্ব নিয়ে তিনি কোনো আইন ভঙ্গ করছেন কি না।

কিন্তু বোমাং রাজ্যও ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল। তাই আমি মনে করি না বোমাং চিফ রোয়াজার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবেন। যদিও আমি শুনেছি যে তাঁর রাজ্যে কোনো ইউরোপিয়ানের আগমন তিনি পছন্দ করেন না।

তবে একটা জিনিস ভেবে শান্তি লাগছে যে যেভাবে পায়ে হেঁটে পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে সাঙ্গু নদীর কাছে পৌঁছেছি, সেভাবে নদীপথে আর দুটো দিন চলতে পারলে হয়। আমাদের আগমন খবর পৌঁছার আগেই আমরা বোমাং রাজার বাড়ি পার হয়ে যেতে পারব।

২ ডিসেম্বর ১৮৬৫ আমি আমার কথিত মিতা রোয়াজাকে বিদায় জানালাম। আন্তরিকতার সাথে তাকে জড়িয়ে ধরে জানালাম বোমাং রাজা যদি তার সাথে ঝামেলা করে আমি তাকে সাহায্য করব। আমাদের সম্পর্কের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি তাঁকে উপহার হিসেবে এক গজ কাপড়, একটা ব্রেসলেট আর দুটো শিলিং দিলাম। তার লোকদের জন্য একটা করে শিলিং এবং এক গ্লাস স্পিরিটের মদ দেওয়া হলো। সবাই উপহার পেয়ে খুশি হলো।

আমাদের ক্যাম্পটা ছিল সাঙ্গু নদীর উজানে খুব চমৎকার একটা জায়গায়। সামনে নদীটা দেখে মনে হবে সামনে কেউ স্বচ্ছ কাচের আয়না বিছিয়ে দিয়েছে। নদীর উপরিতলে এখানে সেখানে বায়ুতাড়িত রেখা, যেটা দেখে মনে হয় জলের মধ্যে কেউ বরফের আঁচড় কেটে রেখেছে। খাড়া পাড় উঠে গেছে ঝুলন্ত পাথর নিয়ে, ফার্ন আর বাঁশের জঙ্গল ছাড়াও রয়েছে বিশাল অর্কিড আর অজানা লতাপাতার ঝোপঝাড়। সামনে যেখানে নদীটা বাঁক নিয়েছে সেখান থেকে প্রবল জলস্রোতের গর্জন ভেসে আসছিল বাতাসের সাথে।

আমার লোকেরা সৈকতে নেমে পাথরের ফাঁকে লুকোনো জায়গা থেকে মাছ ধরতে গেল। ইংল্যান্ডে বাচ্চারা যেরকম ট্রাউট মাছ ধরে এরাও সেরকম কায়দায় ইলের মতো বিদঘুটে কিছু মাছ ধরল। দেখতে কালো আর বাদামি মেশানো, পেটের দিকটা সাদা।

আমার বিশ্বস্ত টোবি এই মাছ দেখে দুঃখিত চেহারায় এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগল যেন সে বলতে চায়— ‘হায়। কপালের ফেরে কনস্টেবলরা কিসব উটকো মাছ ধরে এনেছে, এসব আমাকে রান্না করতে হবে?’

আমি ফজুল্লাকে একজন দোভাষীর সাথে নিকটস্থ গ্রামে পাঠালাম নৌকা আর এখানকার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। তারপর বসে বসে একটা স্বচ্ছ

পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবছিলাম কত তাড়াতাড়ি আমরা ব্রিটিশ এলাকা ছেড়ে যেতে পারব। পূর্বদিকের ওই উঁচু পাহাড়ের ওপাশে কী ধরনের মানুষের বসবাস।

এসব ভাবতে গিয়ে এখন অনুভব করলাম আমার উপহারসামগ্রী নির্বাচন ঠিক হয়নি। এখানে টাকাপয়সার মূল্য নাই তেমন। তার চেয়ে উজ্জ্বল রঙের কানের দুল বা রিং যেটা পাহাড়ি মেয়েরা পরে, ছোট ছোট হাত-আয়না, কাঠের তৈরি চুরুট হোল্ডার ইত্যাদি জিনিসপত্র আনলে ভালো হতো। এরা ওগুলোর বেশি মূল্য দেয়।

তবে যাই হোক, মানুষ তো অভিজ্ঞতা দিয়েই শিক্ষা নেয়। আমার মনে হচ্ছে বেহালাটা এনে ভালো কাজ করেছি। মুরংদের গ্রামে ওটা বাজিয়েছিলাম পাহাড়িদের বাদ্যবাজনার সাথে। ওরা খুব আনন্দ পেয়েছিল। যদিও আমার বেহালা শিক্ষা অতি প্রাথমিক পর্যায়ের। ঘণ্টাখানেক পর ফজুল্লা ফিরে এলো দোভাষীর সাথে। সাথে কয়েকটা ক্যানু ধরনের নৌকা ভাড়া করে এনেছে খুমি উপজাতির কাছ থেকে। ন্যায্য ভাড়া নেবে ওরা। প্রতি নৌকার জন্য দুই পেন্স। আমি নৌকায় বসার কায়দাকানুন শিখলাম কিছুক্ষণ বসে। এখানে ভারসাম্য রেখে চালানো একটু ঝামেলার কাজ। বৈঠা এবং স্টিয়ারিংয়ের কাজ একই সাথে করতে হবে।

ফজুল্লা জানাল যে আমরা সাঙ্গু নদীর অনেক উজানে চলে এসেছি। আমাদের আরো একদিন যাত্রা করে ভাটিতে যেতে হবে, যেখানে রেমাক্রি খিয়ং নামে ছোট্ট একটা শাখানদী এসে মূল নদীর সাথে মিশেছে। এই ছোট স্রোতস্বিনী অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে আমরা একটা পার্বত্য পথের কাছে পৌঁছাতে পারব। ওই পার্বত্য এলাকা পার হলে আমরা কালাদান নামের একটা নদীর কাছে পৌঁছাব, সেই নদীটা ব্রিটিশ অধিকৃত বার্মার আকিয়াব প্রদেশের দিকে চলে গেছে।

১২. সীমান্তের খরস্রোতা নদীতে

অতএব, পরদিন ভোরে আমরা যাত্রা করে সূর্যাস্তের খানিক আগে রেমাক্রি থিয়ংয়ের কাছে পৌছালাম। আমাদের সারাদিন বৈঠা বাইতে হয়েছে, আমিও তাতে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের খরস্রোতা পথ পাড়ি দিতে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে তবে অভিজ্ঞতাটা বেশ মজার ছিল, মনে হচ্ছিল আমরা কোনো তেজি ঘোড়ার গলায় দড়ি বেঁধে পথ পাড়ি দিচ্ছি।

নৌকাটা প্রথমে ধীরগতিতে নদীর উজানের প্রশান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করল। তারপর ধীরে ধীরে অক্ষাংশ বরাবর ছোট ছোট ঘূর্ণি তৈরি হতে দেখলাম। সেই সাথে স্রোতের শক্তিও বাড়তে লাগল। সামনে এগোতে এগোতে আমরা জলস্রোতের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। দ্রুতগতির জলস্রোতের ধারা পাথরের

সাথে ধাক্কা খেয়ে আরো ভয়ানক হয়ে উঠছিল। এখানে স্রোতের শক্তি আর পাথরের সংঘর্ষে নদীজুড়ে ফেনার সৃষ্টি হয়েছে। পাথরগুলো সবসময় দৃশ্যমান থাকছে না। কখনো দেখা যাচ্ছে, কখনো পানির অল্প নিচে ডুবে থাকছে। সেই ডুবন্ত পাথরগুলো সবচেয়ে বিপজ্জনক। অভিজ্ঞ এবং অভ্যস্ত দৃষ্টি না হলে তাদের উপস্থিতি ধরা পড়ে না। অভিজ্ঞ লোকেরা পানির রং এবং উথালপাতাল অবস্থা দেখে বুঝতে পারে সামনে লুকোনো বিপদ আছে কি না।

আমাদের ক্যানুটা দ্রুতগামী সুইফট পাখির মতো উড়ে চলল। এখন একটা সরু গিরিখাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছে যেখানে জলস্রোত খুব তীব্র। ফেনিল ঢেউ প্রচণ্ড গর্জনে ভেঙে পড়ছে। সেই সরু এবং হলুদ বর্ণের জলপথে এত প্রচণ্ড স্রোত যে আমরা অনুমান করতে পারছিলাম না এই পাগলা স্রোতের শক্তি আমাদের কোথায় নিয়ে ফেলবে। আমাদের লোকেরা বৈঠা চালাতে চালাতে দানবের মতো চিৎকার দিচ্ছিল।

তবে যে হাল ধরে বসে ছিল তার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে পেশাদার। সে অবিচল দক্ষতা দিয়ে তার হাতের কব্জি ঘুরিয়ে নাচতে থাকা নৌকাটাকে তীরবর্তী একটা ঝুলন্ত গাছের নিচে নিয়ে গেল দ্রুততার সাথে। কিনারার দিকে সরে যাওয়ার ফলে মাঝনদীর ভয়ানক স্রোতের ধাক্কা থেকে নৌকাটা রক্ষা পেল। তারপর সে দাঁড়িদের ডেকে সতর্ক করে বলল নৌকাটা এবার পাগলা ঢেউয়ের সর্বশেষ ধাক্কার কাছে এসে গেছে।

বলার সাথে সাথে নৌকাটা একটা ডুবন্ত পাথরের সাথে দুম করে ধাক্কা খেয়ে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে লাফ দিয়ে উঠে শান্ত জলস্রোতের অংশে গিয়ে পড়ল। নৌকার অগ্রভাগ নিয়ন্ত্রণে আসার পর এটা দ্রুতগতিতে শান্ত নদীর ওপর দিয়ে চলতে লাগল।

এখানে আসার পর এতক্ষণ আটকে থাকা দম ছেড়ে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। চিৎকার করে নিজেদের বিজয় ঘোষণা করল। তারপর আমরা পেছন দিকে আসতে থাকা বাকি নৌকাগুলোর দিকে তাকালাম।

এটা সত্যিই একটা গৌরবোজ্জ্বল সময় ছিল। নতুন এক অনুভূতি আমাদের গ্রাস করল। এ যেন কাব্যিক গতিময়তা। গর্জনমুখর মহাশক্তিমান স্রোতের সাথে পাল্লা দিয়ে যেন পাখির মতো উড়ে যাওয়া। প্রতিটা মুহূর্তই ছিল উত্তেজনায় পরিপূর্ণ।

আমি খুব গর্বিত যে আমি এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছি স্টার্নে ৰসে থেকে। কিন্তু এতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি মনে মনে ঠিক করলাম ভবিষ্যতে আমি আবারো আসৰ এই পথে। কোনো একদিন আমি একাই এই পথটা পাড়ি দেব নৌকা বেয়ে। এরকম পথে চলতে গেলে শরীর মন দুটোই চাঙ্গা থাকতে হয়। নিখুঁত বিবেচনাবোধ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হয়। প্রতিটা মুহূর্তেই নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। যে কোনো পরিস্থিতি

মোকাবেলা করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে এই পথটা পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

যাদের কাছ থেকে এই ক্যানুগুলো ভাড়া করেছি তারা হাল ধরার জন্য মাঝিও সরবরাহ করেছিল। তীর থেকে তারা আমাকে দেখছিল। 'আশিয়াং বা প্রভু বলে ডাকছিল আমাকে। অবাক হচ্ছিল জীবনে প্রথমবারের মতো বৈঠা বেয়ে তাদের সাথে আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে পথটা পাড়ি দিতে দেখে। প্রতিটি নৌকাই ওই ভয়ংকর জায়গাটা সফলভাবে পার হতে পারল।

ওদের ভাষা না বোঝার জন্য আমার এমন রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর। আমি সামান্য যে কটা শব্দ শিখেছি তা কেবল ওদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য। কিন্তু যখন আসল কথাবার্তা হয়, তখন দোভাষী ছাড়া উপায় নাই। এটা আমার কাছে খুব বিরক্তিকর এবং অসহ্য ঠেকে। তাই কান আর জিহ্বার ওপর নির্ভর না করে আমি ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করলাম।

১৩. সাঙ্গু থেকে কালাদান নদীর পথে

রেমাক্রি খিয়ং ধরে যাত্রা করার আগে আমি আমার বাঙালি কনস্টেবলদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। এই পার্বত্য ভ্রমণে এরা একেবারেই অকেজো। তারা নিজেদের সামান্য জিনিসপত্রগুলো বহন করতেই হিমশিম খাচ্ছিল। এখানকার লোক কিংবা তাদের ভাষা কিছুর সাথেই পরিচিত নয় ওরা। তাছাড়া তাদের সহ্যক্ষমতাও খুব কম। সামান্য জ্বরজারি, ব্যথা বেদনা অথবা একটু কঠিন কাজ হলেই কাহিল হয়ে পড়ে।

আমার ধারণা সত্যিকারের বিপদের মুখোমুখি হলে এরা স্রেফ পালিয়ে যাবে। তাই তাদের এখান থেকে বিদায় করে দেওয়াই ভালো হবে। এই সুযোগে তাদের মাধ্যমে আমি চট্টগ্রামের কমিশনারের কাছে একটা চিঠি পাঠাব। চিঠিতে আমি এ পর্যন্ত যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সামনে কী করতে যাচ্ছি, আমার পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়ন করব তার সম্পর্কে একটা বিস্তারিত বিবরণ পাঠাতে চাই। আমার সঙ্গে থাকবে শুধু লৌহদৃঢ় মনোবলসম্পন্ন সার্জেন্ট ফয়জুল্লাহ এবং আমার প্রিয় সঙ্গী টোবি। যদিও আমি টোবিকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে ফেলে ফিরে যেতে রাজি না। এছাড়া আমি এই অভিযানের জন্য কক্সবাজার থেকে ভাড়া করা দুই মগ দোভাষীকেও সাথে রেখেছি।

সাঙ্গু নদী থেকে কালাদান নদীর শাখা পি খিয়ং পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমাদের পথে পথে বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হলো। কখনো আমরা হাঁটুপানি পেরিয়ে এগিয়েছি, কখনো রাক্ষুসে জোঁকের আক্রমণে পড়েছি যারা আমাদের মোটা কাপড় ভেদ করেও রক্ত চুষে খেয়েছে, কখনো বিষাক্ত বিছুটিপাতার আঘাতে

জর্জরিত হয়েছি। এইসব যন্ত্রণা সহ্য করে আমরা অবশেষে পার্বত্য পথ অতিক্রম করে অন্য প্রান্তের একটা গ্রামে পৌছালাম।

আমরা এখানে মাত্র এক রাত অবস্থান করলাম। কারণ এখানকার লোকজন খুব ভীতু। তাছাড়া এরা এত দরিদ্র যে আমার ছোট দলটার জন্য একবেলা খাবার দিতেও হিমশিম খাচ্ছিল। গ্রামবাসীদের দেখে মনে হলো তারা সবসময় প্রতিবেশীদের আক্রমণের ভয়ে তটস্থ থাকে।

আত্মরক্ষার জন্য তারা একটা বিশাল গাছের ওপর মজবুত একটা আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করেছে। মোটাসোটা একটা গাছের ওপর ভূমি থেকে প্রায় ষাট ফুট উঁচুতে তৈরি করা সেই প্রতিরক্ষা কেন্দ্রটির চারপাশ গাছের মোটা কাণ্ড দিয়ে এমনভাবে তৈরি সেখানে বুলেটও ঢুকবে না। রবিনসন ক্রুসোর গল্পের মতো তৈরি এই বাড়িতে প্রায় বিশজন লোক আশ্রয় নিতে পারবে। ওপরে ওঠার জন্য বেশ কয়েকটি সিঁড়ি লাগে। ওঠার পর সিঁড়িগুলো টেনে তুলে ফেলা হয়। আমার মনে হয় এটা হলো সে ধরনের ঘর যেটার কথা চট্টগ্রামে থাকার সময় শুনেছিলাম। বাঙালিরা বলাবলি করত কিছু কিছু পার্বত্যবাসী বানরের মতো গাছের ওপর বসবাস করে।

৭ ডিসেম্বর আমরা নিরাপদে কালাদান নদীর তীরে দালাকমে গ্রামে পৌঁছালাম। এখানে ৫০টির মতো বাড়ি আছে যেখানে আরাকানের ব্রিটিশ প্রজাদের বসবাস। এটা হলো আরাকানের সীমান্ত এলাকা। এখানকার রোয়াজা বা মোড়ল আমার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান হলেন। তিনি প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হলেন না। তবে তিনি ন্যায্য দামের চেয়ে বেশি টাকা নিয়ে আমাদের খাবার সরবরাহ করলেন এবং আমি কী ধরনের লোক সেটা জানার জন্য খিলু নামের এক বার্মিজ বৈদ্যকে পাঠালেন যিনি তাঁর প্রজ্ঞার জন্য এখানে সুপরিচিত।

আমি তাঁকে আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে চাই, আমার উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি। আমি বললাম যে আমি কেবল এই নদী ধরে শেষ মাথায় পৌঁছে এখানকার গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘুরে চলে আসব।

তিনি আমাকে বললেন, যদি সেটা হয় তা হলে আমার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা ওদিকে সেন্দুদের বসবাস। তারা আমার মাথা কেটে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবে। সেন্দুরা খুব ভয়ংকর উপজাতি। তারা ব্রিটিশ সীমানার বাইরে বসবাস করে। তাদের কাজ হলো এখান থেকে লোকজন ধরে দাস বানিয়ে রাখা আর সীমান্তজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে রাখা। তারা মানুষ বা শয়তান কাউকে ভয় পায় না। পুরো সীমান্ত এলাকা তাদের ভয়ে তটস্থ থাকে। এসব কথা শুনে আমি কিছু না বলে হাসলাম। শুধু তাঁকে অনুরোধ করলাম তার কর্তাদের বলে আমার জন্য একটা নৌকা জোগাড় করে দিতে পারেন কি না।

দালাকমেতে এসেও আমি দেখলাম সেন্দুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে এটা একটু অন্যরকম। পি খিয়ং গ্রামের মতো বৃক্ষ দুর্গ নয়। এটা তৈরি করা হয়েছে নদীর তীরে। বিশাল একটা মজবুত বাঁশের ভেলা। তার ওপর আরামদায়ক বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে। সেরকম আপদ বিপদ দেখা দিলে ভেলাটাকে ঠেলে নদীর মাঝখানে নেওয়া যাবে অনায়াসে। শত্রু তাদের নাগাল পাবে না। কেননা সেন্দুরা উঁচু পর্বতের বাসিন্দা। পানিকে তারা ভয় পায়। তারা সাঁতার জানে না, তাদের কোনো নৌকা নাই।

এখানে আমি জানতে পারলাম যে দালাকমে থেকে অনতিদূরে কিয়োক পান্দোং নামের একটা পর্বতমালা আছে যার চূড়ায় একটা বিশাল মালভূমির মতো জায়গায় প্রাচীন এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। অতীতকালের কোন রাজবংশ সেখানে শাসন করত তার কিছু নমুনা এখনো বিদ্যমান। ড. খিলু আমাকে বললেন তিনি নিজে সেই জায়গায় গিয়ে কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন যার চারপাশে ফলফলাদির বাগান যা সাধারণত মানুষের বসতিতেই থাকে। এখন সেখানে কেউ বাস করে না। ভূতপ্রেত রাক্ষস ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। যে মহান রাজা ওখানে বাস করতেন সেটা বহুকাল আগের কথা।

সেই উপত্যকাটি দশ থেকে বারো মাইল দীর্ঘ হবে। এবং উচ্চতা চার হাজার ফুটের বেশি। শুনেই মনে হলো যেন কোনো ইউরোপিয়ান স্যানিটারিয়ামের জন্য চমৎকার জায়গা। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, ওটা আমার এলাকা না, আর্কিওলজি গবেষণার কোনো অবকাশ নেই আমার। আমার একমাত্র লক্ষ্য হলো সেই নীল পাহাড়ের দেশে পৌঁছানো যেটা সরকারি মানচিত্রে ‘অজানা এবং জরিপহীন জায়গা বলে নির্দেশিত। যেখানে বাস করে সেন্দু নামের একটা আদিম গোত্র।

১৪. সেন্দু জাতির খোঁজে

দালাকমে গ্রামের লোকেরা যখন বুঝতে পারল আমাকে এই ভ্রমণ থেকে বিরত রাখা যাবে না, তখন তারা আমার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাবারদাবার ইত্যাদি সরবরাহ করতে লাগল। যাত্রার অনুমতি আসার আগে আমার জন্য নৌকার বন্দোবস্তও করে ফেলেছে। অবশেষে অনেক কূটনৈতিক চাল এবং আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ খিলু বৈদ্য আমাকে গ্রামের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন। পরবর্তী গন্তব্য খুমিদের গ্রাম। আমাকে সেই গ্রামের মোড়ল ইয়োংয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবেন তিনি।

আমাকে একটি বিষয়ে পরিষ্কার বলে দেওয়া হলো যে এখন থেকে আমার মাথা এবং রক্তের দায়দায়িত্ব আমার নিজের। আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন

এই গ্রামের মানুষ তার জন্য দায়ী থাকবে না।

পরদিন সকালে খিলু বৈদ্য যখন আমাকে সাহায্য করার জন্য নৌকায় প্রবেশ করলেন, তখন তার সাজসজ্জার পুরোটাই ছিল মেকি বা লোকদেখানো। কালো সার্টিনের একটা ভেস্ট, সাথে গাঢ় বেগুনি সিল্কের কোমরবন্ধ পরেছে কালো রঙের লুঙ্গির সাথে, উপরিভাগে পেঁচিয়েছে সাদা মসলিনের পট্টি।

তার পোশাক-আশাকের ধরন আমার ছিন্নপ্রায় মলিন পোশাকের সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া তার গলা থেকে ঝুলছিল নানান প্রসাধনী সামগ্রী। তার বগলের নিচে অলংকারসমৃদ্ধ বার্মিজ তরবারি। এই সব বাহারি প্রস্তুতি নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম রাজকীয় ভঙ্গিতে।

যেতে যেতে তিনি আমাকে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে তাঁর বিচিত্র কাহিনি শোনাতে লাগলেন। যেমন একবার তিনি কোনো এক লোকের পেট থেকে মহিষের চামড়া কেটে বের করেছিলেন যেটা তাকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আমি জানতে চাইলাম ওটা তার পেটের ভেতরে কী করে ঢুকল। তখন তিনি তাঁর ডাক্তারি অবস্থান থেকে সরে গিয়ে বললেন, ‘ওটা শয়তানের কাজ ছিল। শয়তানি উদ্দেশ্যে ওটা তার পেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল।’

তিনি নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে বললেন- ‘তবে আমার জ্ঞানবুদ্ধি সেই শয়তানের চেয়েও শক্তিশালী ছিল বলে আমি সেটা বের করে ফেলে দিতে পেরেছিলাম। আমি অবশ্য প্রায়ই মানুষের মগজ থেকেও রোগজীবাণু পরিষ্কার করে থাকি।’

কথাবার্তা শুনে বুঝলাম তিনি তেমন কিছু জানেন না। এসব আলগা চাপাবাজিই তার সম্বল। এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে তাঁর বিদ্যা অসার। তার সাধারণ জ্ঞান, গ্রাম্য ধূর্ততা আর কথার রঙ্গরসে বেশ দক্ষতা আছে ওটা দিয়েই গ্রামের লোকদের মধ্যে জ্ঞানী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন।

আমরা দুপুরের মধ্যেই ইয়োংয়ের গ্রামে পৌঁছে গেলাম এবং আমাদের সাদরে বরণ করা হলো সেখানে। আমি সংক্ষেপে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বলার পর তিনি বললেন আমাকে এখানে একদিনের মতো থাকতে হবে। কারণ এখানে অশুভ আত্মার কোনো উপস্থিতি আছে কি না সেটা যাচাই করতে হবে। আমি তাতে সম্মতি দিলাম সাথে সাথে। আমার কাছে নতুন জাতের মানুষ একটা নতুন বইয়ের মতো কৌতূহলোদ্দীপক।

ইয়োং খুমি গোত্রের মানুষ। আমার ধারণা এই গোত্রের নাম এসেছে কুহাত, মি=মানুষ এই দুই শব্দ মিলিয়ে। যার অর্থ সম্ভবত কর্মঠ হাতের মানুষ। তাদের হাতের ব্যবহার খুব কৌশলী এবং আঙুলগুলো যে পলকা নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জানা গেছে আদতে খুমি নামটা এসেছে আরাকানিদের কাছ থেকে যারা বার্মার প্রাচীন ভাষার কথা বলে যে ভাষায় খুমি অর্থ কুকুর মানব। এই জাতির রীতি অনুযায়ী এরা কোমরের কাছে এক চিলতে কাপড় পেঁচায় যার সম্মুখভাগ

ঝুলে থাকে তাদের দুই পায়ের মাঝখানে যা দেখতে কুকুরের লেজের মতো লাগে। এই কারণেও খুমি নাম আসতে পারে। আবার এরা কুকুর খেতে পছন্দ করে সেখান থেকেও আসতে পারে।

আমার গৃহকর্তা ইয়োংয়ের কাছে কুকুরের মাংস খেতে কীরকম এটা জানতে চাইলে সে জানাল—'কুকুরটাকে একদম কচি হতে হবে, যদি সম্ভব হয় কালো রঙের। ওটাকে মায়ের দুধ পান করা অবস্থা থেকে ধরে এনে দিনপনেরো ভাত আর মাখন খাওয়ালে স্বাস্থ্য গোলগাল হয়ে যাবে। তারপর যেদিন তাকে হত্যা করা হবে সেদিন তাকে ভরপেট ভাত খাওয়াতে হবে ঠেসে। তারপর কৌশলে তার কানের পাশে লাঠির বাড়ি দিয়ে মেরে ফেলতে হবে। কুকুরের মাংসের সাথে তার পেটের ভেতরে থাকা সদ্য খাওয়া ভাতগুলোও খুব মজাদার হয়।'

ইয়োংয়ের খুব ইচ্ছে আমার জন্য এরকম একটা কুকুরভোজের আয়োজন করা। যদিও আমি প্রায় সর্বভুক জাতীয় মানুষ এবং নতুন কিছু খেয়ে দেখার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ খুঁজে পাই। আমার রাঁধুনী সঙ্গী টোবির ওসবে কেন আগ্রহ নাই সে ব্যাপারে প্রায়ই লেকচার দেই। আবার এটাও ঠিক যে যতই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হই না কেন কোনো একটা জায়গায় আমাদের সীমারেখা টানা উচিত। এই বিদঘুটে কুকুরভোজের কাছে এসে আমার ভুরিভোজনের অ্যাডভেঞ্চারের সীমানা শেষ হয়ে গেল। এরকম বিদঘুটে ভোজে যোগ দেওয়া আমার মতো সর্বভুকের পক্ষেও সম্ভব না।

ইয়োংয়ের গ্রামটা কালাদান নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার বাড়িগুলো বাঁশের তৈরি, ঘরের ছাউনি তাল-সুপুরি পাতার সমন্বয়ে নির্মিত। মোড়লের বাড়ির মেঝেটা আট ফুট উঁচুতে অবস্থিত। বাড়ির সামনে নদীর দিকে মুখ করা একটা খোলা বারান্দা আছে। প্রবেশপথের খুঁটির ওপর বেশকিছু হরিণের শিংয়ের ট্রফি ঝোলানো।

বারান্দার এক পাশে হস্তচালিত তাঁতে নীল রঙের কাপড় বুনছিল এক মহিলা। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় মহিলা সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। বাড়িতে পানি ছিল না বোধহয়। মহিলা পিঠের মধ্যে একটা বেতের ঝুড়িতে বাঁশের তৈরি কয়েকটা পানি রাখার বড় বড় পাত্র নিয়ে নদীতে যাচ্ছে। ঝুড়িটা কায়দা করে খড়ের তৈরি একটা দড়ি দিয়ে কপালের সাথে বেঁধে নেওয়া হয়েছে।

আরেক নারী দরজায় দাঁড়িয়ে পেতলের থালা ধোয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। বাড়ির নিচের ফাঁকা অংশে কয়েকটা শূকর বাঁধা আছে। ওপরের বাঁশের মেঝের ফাঁক দিয়ে পতিত ময়লা পানি আর উচ্ছিষ্ট খাবারদাবারগুলো গিলছে তারা।

ভেতরে ঢোকার পর আমাকে সম্মানের সাথে একটা মাদুরের ওপর বসতে দেওয়া হলো। আমার সামনে ভাতের তৈরি মদ পরিবেশন করা হলো যার বার্মিজ নাম হলো আরক। ইংরেজি ভাষায় arrack শব্দটি এখান থেকে প্রবেশ

করেছে। এই বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘর হলো এই বৈঠকখানা। যার একপাশে উষ্ণ জায়গায় মোড়লের বিছানা। এই ঘরে দুটো মাটির চুলো আছে ঘর গরম করার জন্য। একটি মোড়লের বিছানার পাশে। আরেকটি অন্য প্রান্তে। দূরের চুলাটি চারদিকে কাঠের ফ্রেম করা। চুলার ওপরে লোহার হুকের মধ্যে একটা বড়সড় পাত্র। সেই পাত্রে কিছু একটা রান্না হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল ওটা একটা... কুকুর!

দেওয়ালগুলো দুটো বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। মাঝখানে চার ইঞ্চির মতো ফাঁক আছে। ওই ফাঁকটার কারণে শীতকালে ঘর উষ্ণ থাকে, গরমকালে শীতল থাকে। মোড়লের বিছানার পাশে যে চুলাটা আছে তার ওপরে একটা বড় হরিণের শিং আর মাথার কঙ্কাল ঝোলানো। আমি চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম সেখানে কোনো মানুষের কঙ্কাল আছে কি না। কিন্তু চেষ্টা বৃথা গেল। ওখানে গয়াল, বাইসন, হরিণ এমনকি বন্য ভালুকের কঙ্কালও আছে, মনুষ্য জাতির কিছু নেই।

শিয়রের দিকে দুটো পুরনো মাস্কেট বন্দুক আর একতাড়া তির আছে। ইয়োং প্রথম দিকে আমার ব্যাপারে কিছুটা আড়ষ্ট ছিলেন। কিন্তু সবকিছু শোনার পর সহজ হতে লাগলেন। তিনি আমাকে তেইনওয়ের গ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সম্মতি দিলেন। তেইনওয়ে কিয়ো জাতির ওই গ্রামের মোড়ল। তাঁর সাথে সেন্দুদের ভালো সম্পর্ক। তিনি চাইলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। তবে ইয়োং নিজে সেন্দুদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। যদিও পরবর্তীকালে আমি টের পেয়েছিলাম যে শেষ কথাটা মিথ্যে বলেছিলেন তিনি।

ইয়োংয়ের সাথে সবকিছু বন্দোবস্ত করে আমি নদীর কিনারায় বাঁধা আমার নৌকায় ফিরে গেলাম ঘুমানোর জন্য। কিন্তু ঘুমানোর আগে কিছুক্ষণ সময় খিলু বৈদ্যের সাথে বসে পাইপ ধরিয়ে ধূমপান করতে বসলাম। তিনি তখন আরো কিছু অদ্ভুত তথ্য দিলেন তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁর মতে খুমিরা মূর্খ বর্বর ধরনের মানুষ। তারা মানুষকে সুস্থ করার প্রাথমিক রীতিনীতিগুলোই জানে না। অশুভশক্তি এবং উঁচুস্তরের বিষয় আশয়গুলো তারা একেবারেই বোঝে না। ক্ষত সারানোর জন্য তারা ভাতের মণ্ড কিংবা উষ্ণ কাদা ব্যবহার করে। মাথাব্যথা সারাবার জন্য তারা আগুন তপ্ত চুরিকা চেপে ধরে রোগীর মাথায় অথবা খুঁচিয়ে রক্ত বের করে ফেলে। কলিক বা বদহজমের জন্য তাদের চিকিৎসা হলো অনাহার এবং ব্যথা সারাবার জন্য আক্রান্ত স্থানে ভেজা কাপড়ে পেঁচানো গরম দা চেপে ধরা।

খিলু বৈদ্য গর্বের সাথে জানালেন- ‘আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে সব ধরনের মহামারি হলো দুষ্ট আত্মাদের অপকর্ম। খুমিদের কাছে এটার একমাত্র প্রতিকার হলো আক্রান্ত জায়গা থেকে পালিয়ে যাওয়া। তারা অসুস্থ রোগীকে গ্রামে ফেলে রেখে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। দিনের পর দিন জায়গা বদল করতে থাকে। যদি আশপাশের কোনো গ্রামে মহামারি আক্রমণের খবর পায় তা হলে

তারা সেই গ্রামটাকে কড়াকড়িভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তাদের বাসিন্দাদের সাথে সব ধরনের লেনদেন মোলাকাত বন্ধ রাখে। বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আক্রান্ত গ্রামগুলো থেকে মহামারির বাতাস দূর করে পূতপবিত্র করার কাজে নিয়োজিত হয় ওরা। এই বিষয়টা আমিই ওদের শিখিয়েছি।'

মিথ্যুক বুড়ো! মনে মনে বললাম আমি। মহামারির সময় কোয়ারান্টাইন করার রীতি সকল পার্বত্যবাসীদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ছিল। তিনি বলে যাচ্ছেন--

'হ্যাঁ মহামারি নির্মূল করার জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যবহার খুব কার্যকরী হয়। যেমন জঙ্গল থেকে একটা বানর ধরে সেটাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে এমনভাবে হত্যা করা হয় যেন তার শরীর থেকে রক্ত বের না হয়। তারপর সেই বানরের লেজ দিয়ে সব বাড়ির প্রবেশপথ ঝাড়ু দেওয়া হয়। ঝাড়ুর শেষে বানরের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে সেগুলো ধুলোর সাথে মিশিয়ে প্রত্যেক বাড়ির দরজার ওপরে লাগিয়ে দেওয়া হয়। মহামারি ঠেকাতে এটা খুব কার্যকরী সমাধান।'

১৫. কিয়োদের গ্রামে

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে আমি কিয়োদের গ্রামে পৌঁছালাম। এই গ্রামেরই মোড়ল তেইনওয়ে। গ্রামটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ শক্তিশালী। সম্ভবত সেন্দুদের সীমান্তে অবস্থিত বলে। এই গ্রামটি প্রাকৃতিকভাবেও একটা বিচ্ছিন্নতার পার্বত্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অধীনস্থ উপজাতি এবং স্বাধীন জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। আমি আসার আগেই আমার আগমন সংবাদ পৌছে গিয়েছিল এই গ্রামে। মোড়ল তেইনওয়ে অসংখ্য সঙ্গীসাথি নিয়ে নদীতীরে এলেন আমাকে বরণ করার জন্য। ডেইনওয়ে আনুমানিক ষাট বছর বয়স্ক হবেন। তাঁর পরনে সেন্দু মেয়েদের ঘরে তৈরি কাপড়ের পোশাক, যে ধরনের পোশাক শুধু মোড়লদের জন্য তৈরি করা হয়। তিনি মাথায় পরেছেন একটা ধূসর বর্ণের শিরস্ত্রাণ, যেটার কিনারাগুলোর মধ্যে ভিমরাজ বা দাঁড়কাকের পালক লাগানো। তাঁর পোশাক-আশাক এবং চেহারার আদলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তিনি ইয়োংদের জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা। যদিও কিয়োদের এই গ্রামে বেশকিছু খুমি বাসিন্দা স্থায়ীভাবে বসবাস করে বলে জেনেছি।

আপাতদৃষ্টিতে আমাকে বেশ সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করলেন তেইনওয়ে। প্রথামাফিক কিছু আচার পালন শেষে আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের জন্য নির্ধারিত একটা বাড়িতে।

এই গ্রামটি আমার ইতিপূর্বে দেখা পার্বত্য গ্রামগুলো থেকে খানিকটা আলাদা এবং দর্শনীয় বলতে হবে। কারণ এটাই প্রথম গ্রাম যেখানে আমি একটা সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপস্থিতি দেখলাম। এই গ্রামে চুয়ান্নটা বাড়ি

আছে, সব বাড়ি পাঁচশ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। নিচ দিয়ে সরু পাথুরে পথ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। এই গ্রামের তিনটা দিকই রুদ্ধ বলা চলে, যেদিক দিয়ে প্রবেশ করা অসম্ভব খাড়াই খুব বেশি বলে। তাছাড়া সেটাও কাঠের গুড়ি দিয়ে সম্পূর্ণ ঘেরাও করা। তার ওপর কয়েক ফুট উঁচু চোখা বাঁশ দেওয়া। এই দুর্গপ্রাচীরের মাঝে মাঝে একটা করে ফোকর আছে বাইরে নজর রাখার জন্য এবং গোলাগুলি করার জন্য। শুধু একদিক দিয়েই এই গ্রামে প্রবেশ করা যায়। একটা খাড়া পথ বেয়ে উপরে ওঠার পর তিন স্তরের মজবুত তিন ইঞ্চি পুরো কাঠের দরজা পার হতে হবে।

এরকম কঠিন সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমার চোখে একটামাত্র দুর্বলতা ধরা পড়ল। বাড়িগুলো বাঁশের বেড়া এবং তালপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি। দূর থেকে গোলা নিক্ষেপ কিংবা আগুনের তির ছুড়ে এই বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে।

আমাকে নির্ধারিত ঘরে পৌঁছে দিয়ে তেইনওয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এখানে আমার আগমন আশপাশের লোকদের মধ্যে প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। ইউরোপিয়ান হওয়ার কারণে আমি এদের কাছে অদ্ভুত ধরনের প্রাণীর মতো।

ইয়োং আমার কাছে কাছাকাছি গ্রামের এক সেন্দু মোড়লকে নিয়ে এলেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে আমি তাকে কতটা গভীর কৌতূহল এবং আগ্রহের সাথে দেখছিলাম। কারণ বহুদিন ধরে যে জাতির মানুষকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছি অবশেষে তার নাগাল পাওয়া গেল। সম্ভবত আমিই প্রথম ইউরোপিয়ান যে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে। তার সাথে আরো চারজন নারীও আছে। তিনি নিজের ভাষা বাদে আর কোনো ভাষা জানেন না। তার পরনে সেন্দুদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, কপালের ওপর এক টুকরো কাপড়ে চুলগুলো বেঁধে শিং-এর মতো খাড়া করা আছে। ওই অদ্ভূত সজ্জার ব্যাপারে কৌতূহল দেখালে আমাকে একটা গল্প বলা হলো-

'অনেককাল আগে বনের মধ্যে কাঠবেড়ালি আর পেঁচার মধ্যে তুমুল ঝগড়া লেগে গিয়েছিল। ঝগড়ার একপর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে কাঠবেড়ালিটা পেঁচার মাথায় একটা কামড় দিয়ে রক্তাক্ত করে এবং নিজেও রক্তাক্ত হয়। এতে কাঠবেড়ালি ভয় পেয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। পেঁচাটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কাঠবেড়ালির বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলে। এই দৃশ্যটা এক সেন্দু মোড়ল দেখার পর ভাবনায় পড়ে যায়। তখন তার কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে একটা বাঘ আসে। বাঘটা তাকে জানায় সে যে দৃশ্যটা দেখেছে সেটা একটা ঐশ্বরিক নির্দেশ। অতঃপর তখন থেকে সেন্দু জাতির লোকেরা তাদের চুলগুলো কপালের ওপর বেঁধে রাখে শিং-এর মতো করে, যেটা দেখতে পেঁচার শিং-এর মতো লাগে। যখন তারা যুদ্ধে যায় তখন তারা ওটার ওপর একটা কাপড় পেঁচিয়ে নেয়। তা হলে যুদ্ধের সময় তাদের মাথাটা পেঁচার মতো লাগে।'

সেন্দু নারীদের দেখে অন্যান্য উপজাতির চেয়ে একেবারে আলাদা মনে হলো। আমার এ পর্যন্ত দেখা পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের পোশাক-আশাক খুব সংক্ষিপ্ত। খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরতে দেখেছি। কিন্তু এই সেন্দু মেয়েগুলো তাদের বুকের অংশ আবৃত করেছে সুন্দর একটা শেমিজ দিয়ে, তার ওপর ঘরে তৈরি লম্বা একটা পরিচ্ছন্ন পেটিকোট পরেছে। কাঁধের ওপর থেকে ঝুলছে একটা ওড়নার মতো পট্টি। তাদের চুলগুলো খুব সুন্দরভাবে মুখের দুপাশ দিয়ে পেছনে নিয়ে বেঁধে রেখেছে। সব মিলিয়ে তাদের দেখে মনে হচ্ছে যে তারা সাধারণ পার্বত্যবাসীদের চেয়ে উঁচু শ্রেণির মানুষ। আমি তাদের গঠন আকৃতি ইত্যাদি খেয়াল করে দেখলাম। তাদের মধ্যে মঙ্গোলিয়ান চেহারার ছাপ নেই, তেমন যেটা অন্য পার্বত্যবাসীদের মধ্যে আছে। সেন্দু মহিলাদের দেখে মনে হয় এরা অনেকটা চট্টগ্রামের পর্তুগিজ বংশজাত মেয়েদের মতো।

আমি মোড়লের বউকে বন্ধুতার নিদর্শনস্বরূপ একটা উপহার দিলাম। কিছু ধূসর রঙের পুঁতি এবং একটা ছোট পকেট আয়না। তিনি মুচকি হেসে আমার উপহার গ্রহণ করলেন পরম ঔদার্যের সাথে। তারপর বুকের কাছ থেকে একটা ছোট লাউয়ের খোল বের করে খুব সমীহের সাথে আমার হাতে দিলেন। আমি জানতে চাইলাম ওটা দিয়ে কী করব, আমার কাছে রেখে দেব কি না।

ইয়োং আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে এটা আমার জন্য একটা বড় ধরনের অনুগ্রহ। জিনিসটা হলো তামাক-পানির পাত্র। এটা হুক্কার তলায় লাগানো থাকে। প্রত্যেক মহিলার কাছে এরকম হুক্কা থাকে। ওরা হুক্কার ওই পানিটাকে দাঁত এবং গামের জন্য উপকারী মনে করে। তিনি আমাকে জিনিসটা দিয়েছেন ওখান থেকে হুক্কার পানি নিয়ে মুখের ভেতর কিছুক্ষণ রেখে জিনিসটা ফেরত দেওয়ার জন্য। এটা হলো আমার প্রতি তাঁর প্রদত্ত সম্মানের একটা প্রতিদান।

সত্যি বলতে, এই রীতিটা আমার কাছে খুব ঘেন্নার বিষয় মনে হলো। কিন্তু যেহেতু আমার তীব্র ইচ্ছে—যে কোনো উপায়ে সেন্দুদের দেশে প্রবেশ করা। সেটায় সাফল্য পেতে গেলে এসব ছোটখাটো ব্যাপার আমাকে সহ্য করে নিতে হবে। তাই তীব্র অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও সেই ঘৃণিত তরলকে মুখে নিলাম হাসিমুখে এবং তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিলাম বিনয়ের সাথে।

আমি বুড়ো মোড়লকে এক কাপ মদ খেতে দিলাম। কিন্তু তিনি সেটা স্পর্শ করলেন না যতক্ষণ তার সঙ্গী মহিলারা মুখে দিল। মহিলারাও ইতস্তত করছিল। বেশ নমনীয়তার সাথে অনুরোধ করার পর তারা মুখে দিল। এগুলো যদিও তেমন বড় ব্যাপার না। কিন্তু এর মাধ্যমে আমি এদের চরিত্র সম্পর্কে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম।

সন্ধ্যার সময় আমার জন্য একটা বড় ভোজ এবং আলোচনাসভার আয়োজন করা হলো যেখানে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে। তার ওপর নির্ভর করে তেইনওয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

রাত আটটার দিকে আমি মোড়লের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। মোড়লের বাড়িটা আমার থাকার নির্ধারিত ঘরটার কাছাকাছি। সেখানে গিয়ে দেখলাম ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে অনুষ্ঠান। নাচ গান ভোজন চলছিল। বাদ্যবাজনাগুলো একটু রুক্ষ। নানা ধরনের ড্রাম দেখা গেল, বাঁশের তৈরি একটা বাদ্যযন্ত্র আছে গিটারের মতো দেখতে, যেটা বাদকের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে বাজায়। যন্ত্রপাতিগুলো সব ভাঙাচোরা কিন্তু সেটা দিয়েই সুর তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাদকের দল। সুরের কোনো ঠিক না থাকলেও তাললয় ঠিক ছিল।

শুধু পুরুষেরাই নাচ দেখাল। বিশজনের মতো হবে সংখ্যায়। তাদের নেতার হাতে ছাগলের চামড়ার তৈরি বাহারি হাতলের একটা দা। বাকিদের হাতেও নানা ধরনের দা দেখা যাচ্ছে। এটাকে একটা সম্মিলিত দা নৃত্য বলা চলে। এরা গোল হয়ে নাচছিল একটা নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে। এক পা এগিয়ে একটু থামে তারপর আবার নাচে, এভাবে চললো। বাজনার তালে তালে ওঠাবাসা করতে করতে নাচতে লাগল। তেইনওয়ের বিশেষ অনুরোধে সংগীতের পর্বে আমিও তাদের সাথে অংশ নিলাম।

কিছুক্ষণ পর তেইনওয়ে আমাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল। এই জায়গাটা বিশিষ্ট অতিথিদের পান ভোজনপর্বের জন্য সাজানো হয়েছে। এখানে দুই সারিতে অসংখ্য মাটির পাত্রে খুয়োং নামের এক ধরনের মিষ্টি এবং ভুট্টা থেকে তৈরি হালকা নেশার বিয়ার রাখা আছে। এটা পুরো পার্বত্য অঞ্চলের উৎসবের জনপ্রিয় পানীয়। প্রত্যেকে একেকটি পাত্র সামনে নিয়ে বসে আছে সম্মিলিতভাবে গলধঃকরণ করার জন্য।

জানালার পাশে আমাদের জন্য চমৎকার একটা মাদুর পাতা হয়েছে। সেখানে বসে পাইপ ধরিয়ে পানোৎসবপর্ব শুরু করা হলো। আজ বিকেলে এখানে কিছু ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে। আমাদের ভোজের জন্য যেসব প্রাণীকে বধ করা হয়েছে সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ডিম ভাঙা হয়েছে। এসব কাজে আমার পক্ষ থেকে খিলু বৈদ্য অংশ নিয়েছিল। গণকেরা ভাগ্য গুনে দেখেছে আমাদের আসন্ন যাত্রার সবকিছু ঠিক আছে কি না।

অতঃপর তেইনওয়ে আমাকে জানালেন যে তিনি তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করবেন যেন আমার ইচ্ছে পূরণ হয়।

এখন যে ব্যবস্থাটি স্থির হয়েছে তা হলো এখানে একটা জন্তুকে বলি দেওয়া হবে। সেই বলির মাধ্যমে আমার এবং কিয়োদের মধ্যে বন্ধুতার রক্ত শপথ গ্রহণ করা হবে। তার ভিত্তিতে এখান থেকে একজন দূতকে নিকটস্থ সেন্দু গ্রামে পাঠানো হবে খেইনতিং নামের এক প্রভাবশালী মোড়লের কাছে। তিনি আমাকে তাঁর গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন।

আমি তেইনওয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেই দূতের সাথে আমাকেও পাঠানো হোক। কিন্তু তেইনওয়ে জানালেন যে ওটা এখানকার রীতিবিরুদ্ধ কাজ। অনুমতি ছাড়া সেন্দু এলাকায় কারো প্রবেশকে শত্রুতা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। কোনো মতেই ওখানে আগে যাওয়ার উপায় নাই। কোনো কুলি কিংবা গাইডের পক্ষেও ওখানে ঢোকা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প নেই।

ওই রাতে আমার একফোঁটা বিশ্রাম হলো না। এই গ্রামটি নানারকম বিষাক্ত পোকামাকড়ের হেডকোয়ার্টার, তারা আমাকে সারারাত কামড়ে অস্থির রেখেছে। তাই পরদিন খুব ভোরে আমি নদীতীরে চলে গেলাম যেখান আমার জন্য একটা বাঁশের কুটির তৈরি করা হয়েছে। আমার সঙ্গীদের জন্য আরেকটা কুটির আছে।

বিকেলের দিকে তেইনওয়ে, ইয়োং এবং বেশ কজন প্রভাবশালী স্থানীয় ব্যক্তি এলেন আমার নতুন বাসস্থানের কাছে। একটা কচি গয়াল বলি দেওয়ার জন্য মাটিতে শোয়ানো হলো। তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে এক মাথা আমার কাছে, অন্য মাথা তেইনওয়ে এবং তার সঙ্গীদের হাতে দেওয়া হলো। খুমি চিফ ইয়োং যিনি একাধারে চালাক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে অতিশয় ধূর্ত, তিনি এখন ধর্মগুরুর ভূমিকায় নেমেছেন। তাঁর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে আছেন তার প্রতিপক্ষ খিলু বৈদ্য।

ইয়োং এক হাতে ছাগলের চামড়ার হাতলে তৈরি চকচকে দা নিয়েছেন, অন্য হাতে একটা পেতলের পাত্রে আরক। তিনি মুখ ভর্তি করে আরক নিয়ে মুখে ফুঁ দিয়ে ছড়িয়ে দিলেন গয়ালের দেহের ওপর। আরেক দফা ছুড়ে দিলেন আমার ওপর। তারপর তেইনওয়ে এবং তার সঙ্গীদের ওপর। তারপর জন্তুটার শরীর থেকে কিছু লোম ছিঁড়ে নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলেন। এসব পর্ব শেষ করার পর দা উঁচিয়ে কয়েক কোপ দিয়ে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেললেন। জন্তুটির গলা থেকে উষ্ণ রক্ত ছিটকে তার হাতের ওপর পড়ল, কিছু আমার শরীরে, কিছুটা তেইনওয়ে এবং তার সঙ্গীদের গায়ের ওপর পড়ল। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো- আমরা যারা এই বলিদান পর্বে হাত লাগিয়েছি ওই প্রাণীর মাথার ওপর ভর করে থাকা আত্মা তাদের সবার কাছ থেকে যে কোনো রকমের অসততা এবং অবিশ্বস্ততা মুছে দিয়ে বন্ধুতার বাঁধনকে মজবুত করবে।

বলি দেওয়া গয়ালের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কেটে উপস্থিত সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হলো। সবাই নিজ নিজ খুশিমতো রান্না করে খাবে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলো না। তেইনওয়ে পশুটার কলিজাকে ছোট ছোট টুকরো করে আমাদের সবার হাতে দেওয়া দিলেন। মানত পরিপূর্ণ করার জন্য এটা কাঁচা খেতে হবে চিবিয়ে। আমার জন্য এটা একটু মুশকিল হলো। আমি কোনোমতে চিবিয়ে গিলে ফেলে তাড়াতাড়ি আমার কুঁড়েতে ফিরে এলাম এবং এক চুমুক

ব্র্যান্ডি গলায় ঢাললাম। কাঁচা মাংস খেয়ে আমার গা গুলাচ্ছিল। তারপর বাঁশিটা হাতে নিয়ে একটা সুর তুলে মনটাকে ফুরফুরে করার চেষ্টা করলাম।

১৬. অতর্কিত আক্রমণের মুখে

সেদিনই বার্তাবাহকেরা কেইনতিং-এর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। জানি না ওরা সেখান থেকে কী ফলাফল বয়ে আনবে, কিন্তু আমি বুঝলাম যে আমাকে অন্তত এক পক্ষকাল অপেক্ষা করতে হবে। অতএব, আমি এই অনিবার্য বিলম্বের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তারপর ঠিক করলাম যে এই সময়টুকু আমি আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখব। নইলে এই দীর্ঘ সময় এখানে অলস বসে থাকা খুব বিরক্তকর এবং অর্থহীন। তেইনওয়ে এবং তার লোকদের দেখে সরল এবং আন্তরিক মনে হয়। তারা প্রথাগত আচারপর্ব দিয়ে আমার সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তাতে নিশ্চয়ই এই মোড়লদের ওপর আস্থা রাখা যায়।

এসব ভাবতে ভাবতে আমি বেহালাটা নিয়ে তাতে সুর তুলে যখন বাজাচ্ছিলাম ‘নীল পাহাড়, তোমার একান্ত গোপনীয়তার কাছাকাছি এসেছি আমি...’

তখন হঠাৎ করে একটা গুলির আঘাত আমাকে ছিটকে ফেলে দিল। আমি প্রচণ্ড ব্যথায় কাত হয়ে পড়ে গেলাম।

ঘটনাটা যখন ঘটল তখন আমি কুঁড়ের ভেতর একটা শাল বিছিয়ে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম। আমি আমার বেহালার সুরের ভেতর ডুবেছিলাম। তখনই আচমকা একটা বুলেট এসে আমার কোমরের একটু নিচ দিয়ে আমার উরুর মধ্য দিয়ে ঢুকে হাঁটুর কাছাকাছি গিয়ে থামল।

গুলিটা এসেছে আমার পাহাড়ি গাইডদের একজনের বন্দুক থেকে। যে চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে কালাদান পর্যন্ত এসেছে আমাদের সাথে। গুলি করেই সে জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেল। গুলিটা তার বন্দুক থেকে দুর্ঘটনাক্রমে বেরিয়ে গিয়েছিল না কি এখানকার মোড়লেরা আমার যাত্রা বন্ধ করার জন্য করতে বলেছে, আমি নিশ্চিত নই।

পরে জেনেছি আমার সহযোগী টোবি দূর থেকে দেখেছিল লোকটা পা টিপে টিপে আমার কুঁড়ের দরজার কাছে গিয়ে বাঁকা হয়ে ভেতরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সে ভেবেছে লোকটা হয়তো আমার বাজনা শোনার জন্য ওদিকে গেছে। তারপরেই গুলির শব্দ শোনা গেল আর লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল।

আমি তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম যে আমার শেষ সময় চলে এসেছে। ফজুল্লা আর টোবি আমাকে দ্রুতগতিতে নদীর তীরে রাখা ইয়োংয়ের নৌকায় তুলল। মাঝিদের বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে আকিয়াবের পথে নৌকা চালাতে বলল। আমাকে স্বীকার করতে হবে আমি বেঁচে থাকার সব

আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি গুলির জায়গাটা দেখেছিলাম এবং ওটা যদি আমার হাড় নাও ভেঙে থাকে তবু যে পরিমাণ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তাতে শুধু রক্তপাতেই আমি মারা যাব নিশ্চিত।

আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে আমি সেই ছোট্ট নৌকাটির তলায় শুয়ে নিজের রক্তে ভেসে যাচ্ছিলাম এবং রাগে ক্ষোভে পুড়ে যাচ্ছিলাম এরকম অপ্রত্যাশিত একটা বাধায় আমার অভিযানটা ভেস্তে গেল দেখে। এভাবে মরে যাওয়া কষ্টকর। আমার চোখের সামনে সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছিল, আমি জ্ঞান হারালাম অতিরিক্ত রক্তপাতে।

আবার যখন চোখ মেললাম, তখন আমি জানি না কতটা সময় কেটেছে। কিন্তু আমি খুব অবাক হয়েছিলাম তখনো বেঁচে আছি দেখে। আমি খুব নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলাম। পায়ে ব্যথার তীব্র যন্ত্রণা আমাকে মনে করিয়ে দিল কী ঘটেছিল। রক্তপাত বন্ধ হয়েছিল তবে আমার শারীরিক যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাটা বেশি পীড়াদায়ক ছিল। এভাবে পরাজিত হওয়ার মতো লজ্জাজনক বিষয় আর কিছু নেই।

সে যাই হোক, অসহায় শুয়ে থাকা ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না, তখনো আমার জীবন সংশয় কাটেনি। আমার প্রিয় টোবি মাথার কাছে বসে কান্নাকাটি করছিল, সার্জেন্ট ফজুল্লা মাঝিদের জোরে নৌকা চালাবার জন্য তাগিদ দিচ্ছিল। কতটা সময় ওরকম অচেতন অবস্থায় কেটেছিল তার কোনো হিসাব আমার ছিল না। পুরোটা সময় প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে বেহুঁশের মতো ছিলাম।

তিনদিন পর আমি একটা বন্ধুতাপূর্ণ ইংরেজের কণ্ঠ শুনলাম। ফজুল্লা কার সাথে যেন কথা বলছিল। ঘটনাক্রমে তিনি ছিলেন আকিয়াব পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট মি. এম, যিনি কালাদান নদীর এদিকে টহল দিতে বেরিয়েছিলেন। তিনি শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন একজন আহত অচেনা ইংরেজ ভদ্রলোক এই ছোট নৌকায় করে নদীর দিকে যাচ্ছে।

গত তিনদিন সামান্য ভাত ছাড়া আমি কিছু খাইনি। এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে কথা বলার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে যাব। একজন ইংরেজের দেখা পেয়ে, ইংরেজের কণ্ঠ শুনে আমি সাহস পেলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আকিয়াব পৌঁছে গেলাম।

সেখানে আমাকে যত্ন করে মেজর এম.-এর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার এসে আমার শরীর থেকে গুলিটা বের করে নিলেন। অভয় দিয়ে বললেন, বড় বিপদ কেটে গেছে। কোনো হাড় ভাঙেনি। মাংসপেশির যেসব অংশ ছিঁড়ে গেছে সেটা জোড়া লেগে যাবে অল্পদিনের মধ্যে।

তিনি বললেন এমন গভীর ক্ষত খুব কম দেখা যায়। আমার হাঁটু যে ফেটে যায়নি সেটা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি মেজর এম-কে বললেন কীভাবে গুলিটা আমার শরীরের কোন অংশ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করেছে এবং

আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থা কী ইত্যাদি। তারপর আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন আমার শরীরের অবস্থা বেশ ভালোর দিকে। কদিন পরেই আমি ভালোমতন খাওয়াদাওয়া শুরু করতে পারব।

আমার ফাঁড়াটা এভাবেই কেটে গেল। আমি বিস্ময়করভাবে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম এবং আমার ভেতরে একটা অতিমানবিক খিদে জাগ্রত হলো। অল্প সময়ের মধ্যে আমার আহত পা সম্পূর্ণ ভালো হওয়ার পথে চলে এলো।

পথভ্রষ্ট স্বপ্ন

১৭. আকিয়াব থেকে দ্বিতীয় সেন্দু অভিযান

সেই সময়ে বার্মার চিফ কমিশনার স্যার আর্থার ফেয়ারে আকিয়াব পরিদর্শনে এসে আমার ঘটনা শুনলেন। তিনি খুব আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন যে আমি কী আমার অসমাপ্ত অভিযানে আবারো সেন্দুদের এলাকায় যেতে চাই কি না। বলাবাহুল্য, এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে আমি এক লাফে রাজি হয়ে গেলাম। তারপর দ্রুতগতিতে আবারো প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হলো। এবার আমার সাথে মেজর এম.ও যাবেন এবং আমরা দুজনে ওই অজানা অঞ্চল আবিষ্কারের চেষ্টা করব। এই দফায় আমরা সরকারি অনুমোদন নিয়ে যাচ্ছি।

বলে রাখা ভালো আমার পূর্ববর্তী অভিযান সম্পর্কে বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে জানানো হয়েছিল। স্যার আর্থার ফেয়ারের সুপারিশক্রমে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অনুমোদন পাওয়া গেল। আমার বন্ধু চট্টগ্রামের কমিশনারের চিঠিও পেলাম। তিনি এই অভিযান নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন এবং আমার নতুন প্রচেষ্টার ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন। নতুন অভিযানের ব্যাপারে সবদিক থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল। আমি আহত হয়েছিলাম ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬৫। আকিয়াব পৌঁছেছিলাম ২০ ডিসেম্বর দুপুরে।

৫ জানুয়ারি ১৮৬৬ আবারো নতুন করে যাত্রা শুরু করলাম আকিয়াব থেকে। আমার পা তখনো পুরোপুরি সারেনি, তবু যাত্রা করার জন্য সেটা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ালো না।

স্যার আর্থার ফেয়ারে এই অভিযানের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে দুইশ মাইলের মতো এলেন। ১২ জানুয়ারি আমরা দালাকমে পৌঁছানোর পর তিনি আমাদের বিদায় জানালেন এবং আমি আর মেজর এম. সেন্দু এলাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

আমার আঘাতের ব্যাপারে চিফ কমিশনারও আমার সাথে একমত হলেন যে ঘটনাটি দুর্ঘটনাবশত ঘটেছিল। সেটা না হয়ে থাকলেও তার সাথে তেইনওয়ে বা তার লোকেদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। যদি কাজটা ইচ্ছাকৃত শয়তানি হয়ে থাকে সেটা হতে পারে বোমাং রাজার দিক থেকে। যে গুলি করেছে সে তার অধীনস্থ প্রজা। আমাদের বর্তমান অভিযান তেইনওয়ের দিক থেকে বন্ধুসুলভ হবে বলে আশা করা যায়।

এবার খুব ছোট একটা দল নিলাম আমাদের সঙ্গী হিসেবে। ১৮ জানুয়ারি আমরা আবারো তেইনওয়ের গ্রামে পৌঁছালাম, যেখান থেকে অল্প কদিন আগেই তড়িঘড়ি করে চলে আসতে হয়েছিল।

বৃদ্ধ মোড়ল আমাকে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন। তিনি আমার গা ধরে, ঝাঁকুনি দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলেন আমি আসলেই বেঁচে আছি। তাঁর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল যদি আমি না মরেও থাকি, আমার অন্তত মরে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত ছিল।

আমার ক্ষতটা সত্যি অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সেরে গিয়েছিল। এই দ্রুত আরোগ্যের পেছনে যে কারণটি প্রধান তা হলো ওই ঘটনার পূর্বে আমার কয়েক সপ্তাহের প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন। রুটি, মাখন, বিয়ার, মাছ, মাংস কিছুই খাইনি। মাঝে মাঝে শুধু মুরগির মাংস আর মাছ খেয়েছি। খোলা আকাশের নিচে ক্রমাগত পরিশ্রম করে গেছি। যেসব খাদ্য জুটেছে তার সবই ছিল খুব সাদামাটা। এসব কারণে ক্ষতটা তাড়াতাড়ি সেরে গেছে।

আমি এখনো ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞবোধ করি সেদিনের ওই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল বলে। সে কারণেই আমি আবারো তেইনওয়ের বাড়িতে আসতে পেরেছি। ডিম দিয়ে ভরপেট ভাত খেয়ে এখন মেজর এম.-এর সাথে বসে পাইপ টানতে টানতে আমাদের যাত্রার ভালোমন্দ বিষয়ে আলাপ করছি।

নিচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, দূরে ঘন সবুজ পাহাড়ের সারি, ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা, একের পর এক জঙ্গলের স্তর নিয়ে দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। আমাদের এখানে নিয়ে আসা ছোট ক্যানু নৌকাটা নদীর তীরে বালিয়াড়িতে নোঙর করে রাখা হয়েছে। আমার বিশ্বস্ত রাধুনী টোবি সেই নৌকার তলদেশে দুয়েকখানা লাল মরিচের সন্ধানে আছে। সে আমার ডিনারে বাড়তি সুগন্ধী যোগ করার চেষ্টা করছে।

তেইনওয়ের বাড়িতে গিয়ে আমরা জানলাম আমাদের বার্তাবাহকেরা সেন্দু এলাকা থেকে ফিরেছে। সাথে নিয়ে এসেছে মোড়ল খেইনাং-এর এক পুত্র আইলাংকে। মোড়ল তার পুত্রকে পাঠিয়েছে আমার সাথে দেখা করে আলাপ করার জন্য। তার সাথে দর কষাকষি করে স্থির হলো তাদের দেশে প্রবেশ করার জন্য আমরা কিছু লাল কাপড়, পেতলের পাত্র, পুঁতির মালা ইত্যাদি উপঢৌকন দেব খেইনাং-এর হাতে। সবকিছু জোগাড় হওয়ার পর আমরা যাত্রার জন্য আবারো রক্ত শপথ গ্রহণ করলাম। এবারে মেজর এম. শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। পরদিন সকালে আমরা আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু করলাম সেন্দু চিফ খেইনাং-এর গ্রামের উদ্দেশ্যে। সেই গ্রামে একশর মতো বাড়ি আছে। ওখানে পৌছাতে পারলে আমরা আরো গভীরে যেতে পারব বলে আশা করছি।

সেন্দু চরিত্রের একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল এখানে। আইলং-এর দলে ছজন আছে। তারা সবাই পানিকে ভীষণ ভয় পায়। তারা পানিকে ভয় পায় বলে হাতমুখ পর্যন্ত ধোয় না, এমনকি পানি খায় খুব কম। তাদের কিছুতেই নৌকায় তোলা গেল না। অতঃপর আমি আর মেজর এম. নৌকায় করে রওনা দিলাম। তারা নদীতীরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাদের সমান্তরালে চলতে লাগল।

অনেকদূর যাওয়ার পর সূর্যাস্তের সময় আমরা যেখানে ক্যাম্প করার জন্য থামলাম, সেখানে তারা আবার আবির্ভূত হলো।

তরুণ আইলং আর তার বন্ধু ইৎসির সাথে আমার ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তারা আমাকে এবং আমার জিনিসপত্রে হাত দিতে কোনো দ্বিধা করছে না। আমার জামাকাপড়, আমার লেখার সরঞ্জাম, আমার পাইপ, আমার বাহু এবং আমার ব্যবহার্য সকল জিনিস তারা হাতিয়ে দেখে খুব আগ্রহের সাথে। আমার সাথে ওদের গাত্রবর্ণের যে পার্থক্য সেটাও তাদের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

আইলং কখনো আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে যত্নের সাথে নিরীক্ষা করে বলতো, 'আপাহ, আপাংলো' (এটা খুব সুন্দর, এটা খুব ফর্সা) অথবা কখনো আমার রোদে পোড়া কোনো একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ইৎসির হাতে দিলে সে ওটা পরীক্ষা করত গভীর মনোযোগের সাথে। তাদের এসব কাণ্ড দেখে মনে হয় এর আগে ওরা কোনো শ্বেতাঙ্গকে দেখেনি।

আমার তামাক ফুরিয়ে গিয়েছিল, আইলং তার কাছ থেকে কিছু ধার দিল। এটা খুব প্রয়োজনীয় একটা উপহার। তামাক জিনিসটা সারা পৃথিবীতে প্রায় একই বলা চলে। প্রথম দিনের যাত্রার পুরোটাই কালাদান নদী ধরে এগিয়ে সুল্লা খিয়ং নামের ছোট একটা স্রোতস্বিনীর কাছে পৌঁছাই যেটা পূর্ব দিক থেকে আসা একটা বড় নদীতে গিয়ে মিশেছে। আমরা ছোট শাখা নদী বেয়ে এগিয়ে সূর্যাস্তের সময় একটা জায়গায় যাত্রাবিরতি করি। সেন্দুরা আমাদের বলল ওখান থেকে আমাদের পায়ে হেঁটে যাত্রা করতে হবে। তেইনওয়ের গ্রাম থেকে আসা কুলিরা দ্রুত নেমে গিয়ে বাঁশ কেটে একটা অস্থায়ী কুঁড়ে তৈরি করল। ওরা ওখানেই ঘুমালো রাতে। আমি আর মেজর এম. নৌকাতেই ঘুমালাম। পরদিন খুব ভোরে আমরা আমাদের নৌকাগুলো নদীর ধারের ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম যাতে এ পথে যাতায়াতকারী কেউ চুরি করতে না পারে। সব গোছানো শেষ করে সূর্যোদয়ের পরপরই আমরা যাত্রা শুরু করলাম।

আমরা যে বনপথ দিয়ে চলছিলাম সেটা ছিল অন্ধকার এবং বিষণ্ন ধরনের, অধিকাংশ বৃক্ষই খুব উঁচু, ছোটখাটো গাছপালা তেমন নেই। জীবন্ত কোনো প্রাণীর ছায়ামাত্র দেখা যাচ্ছে না কোথাও, এমনকি একটা পাখি বা বানর কিছুই নেই। স্তব্ধ হয়ে থাকা এই গভীর জঙ্গলে কোনো শব্দ নেই, মাঝে মাঝে দূর কোনো জায়গা থেকে অজানা পাখির মিষ্টি একটা স্বর ভেসে আসে শুধু। কোথাও কোথাও মাটিতে পড়ে থাকা বুনো ফলের স্তূপ দেখা যায়।

পুরো দলের নেতৃত্বে আছে ইৎসি, যে আমাদের একটা প্রায় অগম্য বুনোপথে নিয়ে যাচ্ছে তার নিজস্ব বোধ বিবেচনা দিয়ে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে আন্দাজে পথ চলছে। তবে চলার পথে নিশ্চয়ই কিছু কিছু চিহ্নকে সে অনুসরণ করছে। ব্যাপারটা সহজ নয়। জঙ্গলের মধ্যে হাতিরা যেসব পথ দিয়ে

চলে, সে মোটামুটি সেই পথ দিয়ে চলছিল। চলার পথে পার্বত্য হাতির অসংখ্য লাদি দেখা যাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছে এদিকে অগণিত হাতি চলাচল করে।

১৮. অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বিপন্ন প্রাণ

আমরা উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় পনেরো মাইলের মতো পথ পাড়ি দিলাম। কোনদিকে যাচ্ছি সেটা অনুমান করছিলাম কিছুটা সূর্যের অবস্থান দেখে, কিছুটা বৃক্ষের মোটা কাণ্ডের পাশে গজানো মসগুলো দেখে। ওগুলো সবসময় বৃক্ষের উত্তরদিকে বেশি ঘন হয়ে জন্মায়। দিনের শেষে আমরা জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গায় যাত্রাবিরতি করলাম।

পরদিন সকালে উঠে আবারো যাত্রা শুরু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা এলোপাতাড়ি পথ চললাম। কখনো রোদের মধ্যে হাঁটছি, কখনো ছায়ায় মধ্যে।

এভাবে চলতে চলতে বেলা দুটোর দিকে আমরা বিপরীত দিক থেকে আসা তিনজন অদ্ভূত দর্শন সেন্দুর মুখোমুখি হলাম। তাদের একজনের হাতে তির-ধনুক, অন্য দুজনের হাতে ইংলিশ মাস্কেট বন্দুক। তাদের কাছে পাহাড়ি বাইসনের শিং-এর তৈরি বারুদের আধার আছে যেটা রুপা এবং হাতির দাঁতে সজ্জিত।

এই আগন্তুকরা আইলংকে জেরা করতে শুরু করল। আমরা কে, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইল।

তাদের বলা হলো আমরা একটা বন্ধুতাপূর্ণ ভ্রমণে আইলং-এর বাবা খেইনাং-এর গ্রামে যাচ্ছি। আগন্তুকরা জানালো তারা অন্য একটা গ্রামের মোড়লের দলে আছে। সেই মোড়লের অনুমতি ছাড়া আমাদের যেতে দেওয়া হবে না।

এটা নিয়ে আমরা একটা ঝামেলায় পড়ে গেলাম। শেষমেশ এই সিদ্ধান্ত হলো যে আইলং তার দুজন লোক নিয়ে ওদের মোড়লের সাথে দেখা করবে। তাকে বুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করবে।

লক্ষণ খারাপ দেখে আমাদের পাহাড়ি কুলিরা অস্বস্তিবোধ করছিল। তারা আস্তে আস্তে তাদের মালপত্র নিচে নামিয়ে রাখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আইলং এবং তার সঙ্গী ইৎসি ফিরে এসে জানালো যে আমাদের দুর্ভাগ্য এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। ওই সেন্দুরা একটা যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে, তাদের সংখ্যা চারশর মতো।

সে এখন একটা বড় ঝামেলার আশঙ্কা করছে। বলল, যেহেতু সে নিরস্ত্র আমি আমার অস্ত্রটা তাকে ধার দিতে পারি কি না। আমি আমার রূপোলি হাতলের একটা তলোয়ার, যেটা ভারতীয় সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি হিসেবে ছিল, সেটা তার হাতে তুলে দিলাম। আমার নিজের জন্য একটা গুর্খা ছুরি আর রিভলবারটা রাখলাম। সে আমার তলোয়ার নিয়ে চলে গেল। ওই তলোয়ারটা

আমি পরবর্তী দু বছর দেখিনি। দুবছর পর অবশ্য সেটা বিশ্বস্ততার সাথে আকিয়াব কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল ইৎসি।

বুড়ো তেইনওয়ে আমাদের সাথে এসেছিলেন, তাঁকে দেখে খুব বিচলিত মনে হলো। তিনি আমার কনুই ধরে টান দিয়ে ইশারায় বললেন, আমাদের এখুনি পালানো উচিত। পেছনে ফিরে দেখি কুলিরা মালপত্রগুলো নিয়ে যে পথে এসেছি সেদিকে প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে।

এতদূর এসে মেজর এম. এবং আমি উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়া পালিয়ে যেতে চাইছি না। আমরা সেটা তেইনওয়েকে ইশারায় বললাম। সেই মুহূর্তে আমরা শুনলাম সেন্দুরা জঙ্গলের মধ্য থেকে আইলংকে ডাক দিচ্ছে। তাতে মনে হলো সে পালিয়ে গেছে।

সেই সংকটমুহূর্তে ইৎসি সাবধানে ঝোপের আড়াল থেকে আমাকে ইশারায় জানতে চাইল তার সাথে পালিয়ে যাব কি না। কিন্তু আমি আমার সঙ্গীদের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম ওদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারব না। সে আর দেরি না করে দ্রুত পায়ে জঙ্গলের ভেতরে হারিয়ে গেল।

বুড়ো তেইনওয়ে আমাদের সাথে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লেগে ছিলেন প্রবল পৌরুষের সাথে। তিনি ওই আগন্তুকদের আন্তরিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। কী বলছেন সেটা বোঝা না গেলেও দেখছিলাম তিনি দ্রুত কথা বলছিলেন। কিছু একটা জোর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। তারপর তিনি ওদের নেতাগোছের লোকটার হাত ধরে কপালে ঠেকিয়ে মিনতি করতে লাগলেন।

কিন্তু আগন্তুকদের চেহারা ছিল কাঠিন্যে ভরপুর। তেইনওয়ের মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজল না। তারা স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দুয়েকবার হুঁ হাঁ বাদে আর কোনো শব্দ করল না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর তেইনওয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর কুলিদের পথে রওনা দিলেন, যারা বহু আগেই পগার পার হয়ে গেছে। কুলিরা পালাবার সময় আমাদের সকল জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। খাবারদাবার, অস্ত্রপাতি, উপহারসামগ্রী সব।

পরিস্থিতি সত্যি খারাপ মনে হচ্ছে এখন। আমরা যেখানে আছি, এই অজানা বনভূমিতে, আমাদের সামনে দাঁড়ানো পাঁচজন বিপজ্জনক আগন্তুক, যাদের পেছনের জঙ্গলে আছে তাদের মতো আরো চারশ জন। আমরা মাত্র ছয়জন। তার মধ্যে আমি, মেজর এম, তাঁর দুই আর্দালি এবং সার্জেন্ট ফজুল্লা। আমাদের সবার অস্ত্র আছে। আমাদের সাথে থাকা বাবুর্চি টোবির হাতে রান্না করার একটা খুন্তি বাদে আর কিছু নেই। আমরা খেয়াল করলাম যে ওই লোকগুলো ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে আমাদের ঘিরে ফেলছে। সেন্দুদের চারজন আস্তে করে গাছের পেছনে আড়াল নিল। সার্জেন্ট ফজুল্লার দৃষ্টি তাদের অনুসরণ করছিল, সে জানালো সেন্দুরা তাদের কোমরের কাছ থেকে গানপাউডার নিয়ে বন্দুকে ভরছে।

মেজর এম. এবং আমি পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দ্রুত আলাপ সেরে ফেললাম। আমরা এখানে একা, আমাদের কোনো দোভাষী নেই। এদের সাথে সংলাপ বিনিময় করার কোনো উপায় নেই। বোঝানোর কোনো উপায় নেই যে আমাদের মনে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। আমরা বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী।

তাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আমাদের জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় আটক করাই তাদের উদ্দেশ্য। তারপর আমাদের যা আছে সব কেড়ে নেবে। এতটা পথ এগিয়ে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে আমাদের পরিকল্পনা মার খেয়ে যাচ্ছে। এটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে।

আমরা যখন এসব নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন সেন্দুদের একজন গাছের পেছন থেকে মেজর এম.কে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করল। সাথে সাথে সার্জেন্ট ফজুরা তার হাতের রাইফেল তুলল সেই ব্যাটার দিকে। তখন সে যেন একটু বিব্রত হয়ে মাথা নেড়ে বন্দুক নামিয়ে নিল। ওদিকে ধূসর দাড়িওয়ালা একজন লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে মৃদু হেসে পোষ মানাবার ভঙ্গি করে মেজর এম.-এর এক আর্দালির হাত থেকে তার রাইফেলটা পরীক্ষা করার জন্য চেয়ে নিচ্ছে এমন ভান করে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

অবস্থা দেখে আমি মেজর এম. কে বললাম, তাদের মতলব এখন পরিষ্কার। আমরা এখানে বেশিক্ষণ থাকলে তারা আমাদের ক্রমশ ঘেরাও করে আটকে ফেলবে।

মেজর এম. তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন রাইফেল তাক করে রাখতে, তবে কোনো গুলি না ছুড়তে। তারপর আস্তে আস্তে আমরা পিছিয়ে যেতে থাকব। সেন্দুরা আমাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব টের পেয়ে আড়াল নিল। তবে তারা আমাদের জীবিত ধরতে চেয়েছে কিংবা আমাদের বন্দুকের সামনে ভয় পেয়েছে ঠিক জানি না, তারা কোনো গুলি ছুড়ল না। আমরাও আগাম গোলাগুলি করার পক্ষপাতী ছিলাম না। তাই রাইফেল তাক করা অবস্থাতে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে শুরু করলাম।

তখন ফজুল্লা আমাকে বলল, ‘সাহেব ওরা কিন্তু আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।’

আমি দেখলাম, সত্যি তাই। আমাদের ডান ও বামদিকে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে তারা আমাদের অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর জঙ্গল অনেক বেশি ঘন দেখলাম। আড়াল পেয়ে আমরাও যতটা দ্রুত সম্ভব ছুটতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ ছোটার পর আমি টের পেলাম আমার পায়ে ভালোরকম ব্যথা শুরু হয়েছে। আমি পালাতে পারব কি না সে ব্যাপারে সন্দিহান হলাম।

আর কিছুদূর গিয়ে আমরা আমাদের মালপত্রের ঝুড়িগুলো পেলাম যেগুলো ফেলে আমাদের কুলিরা পালিয়ে গেছে। হায় এখানে আমার প্রিয়

তামাকের পাইপ, আমার প্রিয় বেহালা, আমার লেখার ডায়েরি পড়ে আছে। যে ডায়েরিতে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত আর স্কেচ আঁকা আছে। এসব দেখার কোনো সময় নেই আমাদের হাতে। তবু এর মাঝেও ফজুল্লা আমার ড্রেসিং গাউনটা কুড়িয়ে নিল।

কিছুদূর যাওয়ার পর গুলির শব্দ শোনা গেল। শত্রুরা আমাদের অতিক্রম করে গিয়ে সম্ভবত আমাদের কুলিদের আক্রমণ করে বসেছে। তারপর নিশ্চয়ই আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা দ্রুত একটা যুদ্ধ পরিষদের সভা ডাকলাম। সত্যিকারের লড়াইয়ের ময়দানে যেভাবে ডাকা হয়। আমাকে স্বীকার করতে হলো যে আমি আর হাঁটতে পারব না। আমার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, পা দুটোকে সীসার মতো ভারী মনে হচ্ছিল। অতঃপর আমরা ডানদিকে একশ গজের মতো সরে গেলাম। সেখানে একটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা গর্ত পাওয়া গেল। আমরা সবাই হামাগুড়ি দিয়ে শিকার আক্রান্ত পশুর মতো ঢুকে পড়লাম গর্তের ভেতর। যদিও জানি এখানে ধরা পড়লে মরণ ছাড় গতি নাই, কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না।

মেজর এম. সারা পথ ধরে একটা পোষা কুকুর বয়ে এনেছেন। কুকুরটা তাঁর তীর যিনি এখন ইংল্যান্ডে আছেন। এখন এই ছোট্ট পশুটা আমাদের জন্য বড় বিপদ হ দাঁড়াল। এতক্ষণ ধরে আমরা দূর থেকে বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এছাড়া আর সব চুপচাপ। আমরা প্রায় ধরে নিয়েছিলাম, এ যাত্রা বুঝি বেঁচে গেলাম। আমাদের ওরা খুঁজে পায়নি।

কিন্তু হঠাৎ করে কাছের জঙ্গল থেকে সেন্দুদের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। জা একে অন্যকে ডাকছে। মনে হচ্ছে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরা পরস্পরের দিয়ে চোখাচোখি করলাম এবং কবরের নিস্তব্ধতা বজায় রাখলাম। আমি আমার নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সবাই ভাবছিল যে কোনো মুহূর্তে সিসার গুলিটা ছুটি আসবে। আমরা শক্ত করে আমাদের অস্ত্র ধরে রাখলাম।

মেজর এম.-এর অভিশপ্ত কুকুরটা মৃদুস্বরে ঘরঘর শব্দ করতেই আমি ওটার গল কেটে ফেলার জন্য ছুরি বের করলাম। মেজর এম. জন্তুটাকে খুব মায়া করেন, তিনি তাড়াতাড়ি ওটাকে কোটের ভেতর ঢুকিয়ে শান্ত করলেন। ঈশ্বরের অসীম দয়ার ফলে নিতান্ত ভাগ্যগুণে আমরা ধরা পড়লাম না।

সার্চপার্টি চলে গেল, গুলির শব্দ থেমে গেল। দিনের আলো নিভে আসলে বলে মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা ভর করল। বিশাল স্বস্তি নিয়ে ধীরে ধীরে রাত নেমে এলো। আমর এখনো বেঁচে আছি, এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দের খবর।

আমরা এখন আবারো বন্যহাতির ডাক শুনতে পেলাম। হাতির দল খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে। মাঝে একবার একটা বাঘের গর্জনও শোনা গেল। শিগগিরই চাঁদ উঠতে শু করল এবং আমরা একমত হলাম যে চাঁদের আলোয় পথ খুঁজে

পাওয়া আমাদের জন এখন সহজ হবে। যদি পথ খুঁজে পাই তা হলে আমাদের লুকিয়ে রাখা নৌকার কাছে ফিরতে পারব। খুব সতর্কতার সাথে আমাদের লুকোনো গর্ত থেকে আমরা ইন্ডিয়ান ফাইলের মতো লাইন ধরে বেরিয়ে এলাম। সকালবেলা আমরা যেদিক থেকে এসেছিলায় সেদিকে চলতে শুরু করলাম। মনে হচ্ছিল এর মধ্যে কত দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে!

জঙ্গলটা ক্রমশ খুব ঘন এবং অন্ধকার হয়ে আসছিল। সামনে আর কোনো প আছে মনে হয় না। তবু আমরা জোর করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। নিরাশার মধ্যে আশার আলো খুঁজতে লাগলাম। কাঁটার আঘাতে আমরা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম, আমাদের শরীর আটকে যাচ্ছিল। নানা ধরনের লতার মধ্যে আমাদের প আটকে যাচ্ছিল। ঘন ঝোপের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমর হাঁচড়ে-পাঁচড়ে, ঝোপঝাড় সরিয়ে, পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়িয়ে আবার চলতে লাগলাম। কোথাও আমাদের চুল আটকে যাচ্ছিল, কোথাও আমাদের ঘাড়ে আঘাত লাগছিল।

এক জায়গায় মেজর এম. এর মাথার হ্যাট ছিটকে পড়ে গেল একটা গাছের ডালের সাথে লেগে। অন্ধকারে ওটা খুঁজে পাওয়া গেল না আর। আমরা যেন এক ধারাবাহিক দুর্বিষহ দুঃস্বপ্নের পথ পাড়ি দিচ্ছি। তবু সব সহ্য করে এগিয়ে খাচ্ছি। যদিও আমরা আসল পথ থেকে দূরে আছি তবু প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এই বর্বরদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি বলে বিশ্বাস করছি, যারা আমাদের এই দুর্যোগের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

ঝোপজঙ্গলের আঘাতে কাটাছেঁড়া হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় অবশেষে আমরা একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে একটা খাড়া পাহাড় উঠে গেছে এবং আমরা বুঝতে পারলাম এটা পার হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই ঢাল বেয়ে কিছুটা এগিয়ে আমরা ছজন মাটিতে শুয়ে পড়লাম। প্রবল ক্লান্তিতে আমি একটা পাথরের ওপর মাথা রেখে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম। পুরোপুরি অচেতন হওয়ার আগে আবছা দেখতে পেলাম সার্জেন্ট ফজুল্লা আমার সেই গাউনটা গায়ের ওপর মুড়িয়ে দিচ্ছে। পুরো পথটা সে কোমরের সাথে বেঁধে নিয়ে এসেছে জিনিসটা।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল আমি কোথায় আছি। তারপরই মনে পড়ল আমাদের অভিযানের সেই তিক্ত ব্যর্থতার কথা। সব ছেড়ে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি দিশাহীন অজানা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে।

আমরা সবাই জেগে উঠে যাত্রার জন্য নিজেদের তৈরি করে নিলাম। আমার বাঁ পা শক্ত আর অবশ হয়ে আছে। তবে ব্যায়াম করে কিছুটা উন্নতি হবে বলে মনে হচ্ছে। মেজর এম. গত রাতে তার টুপিটা হারানোর ফলে মাথা বাঁচাতে গাছের পাতা বেছে নিয়েছে।

আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম কিন্তু কোনো খাবার নেই, আমরা তৃষ্ণার্ত কিন্তু এক ফোঁটা পানি নেই কারো কাছে। প্রশ্ন হলো আমরা কোন দিকে যাব? আমরা যদি

উপত্যকার দিকে যাই তা হলে আমাদের ধরার জন্য যারা কিলবিল করছে তাদের হাতে গিয়ে পড়ৰ। আমাদের সামনের এই পাহাড় অতিক্রম করে পালাতে হবে। আমার ধারণা এই পাহাড়টা পার হলেই কালাদান নদীতে পৌঁছাব। কালাদান নদীতে আমাদের নৌকা বাঁধা আছে, সেটা দিয়ে আমরা তেইনওয়ের গ্রামে পৌঁছাতে পারব।

অতঃপর আমরা সামনের পাহাড়টায় চড়তে শুরু করলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা ঘন বাঁশের জঙ্গলের সামনে পড়লাম। ওটার মধ্য দিয়ে আমাদের পথ করে যেতে হবে। এখানে এসে আমার কাছে থাকা কুকরিটা খুব কাজে দিল। ওটা দিয়ে বাঁশের জঙ্গল কেটে এগোতে লাগলাম।

সূর্য ক্রমশ মাথার ওপরে উঠে গেলে মেজর এম. সমস্যায় পড়ে গেলেন। টুপি ছাড়া রোদে হাঁটতে গেলে তার সানস্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেটা আমাদের নতুন করে বিপদগ্রস্ত করবে। আমরা তার জন্য কলাপাতা দিয়ে ছাউনি তৈরি করে দিলাম, তিনি ওটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আমরা পরস্পরকে আশ্বস্ত করে যাচ্ছি সামনেই কালাদান নদী, আমরা শিগগির সেখানে পৌছাব। এভাবে আমরা সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে থাকলাম।

দীর্ঘ পাঁচটা ঘণ্টা মরণপণ চেষ্টা করে, দমবন্ধ করে অতি কষ্টে চূড়ায় উঠতে পারলাম অবশেষে। সবার আগে ফজুল্লা আমাদের দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। দেখলাম সে চূড়ায় উঠে চিন্তিত মুখে বসে পড়ল। চূড়ায় ওঠার পর আমিও হতাশায় ডুবে বসে পড়লাম। আমাদের সামনে সেই প্রত্যাশিত কালাদান নদীর কোনো চিহ্নমাত্র নেই, পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি দূর দিগন্তের দিকে চলে গেছে। ওদিকে নদী থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আমরা স্পষ্টতই এই অঞ্চলের ভূগোল চিনতে ভুল করেছি। ফলে ব্যাপারটা খুব মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। আমাদের কাছে কোনো খাবারদাবার নেই। তাও কিছু সময় টেকা যাবে যদি মেজর এম.-এর কুকুরটা জবাই করে খাওয়ার ব্যবস্থা করি। কিন্তু যেটা ছাড়া আমরা একেবারেই অচল তা হলো খাবার পানি। পানি ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমাদের ঠোঁট এক ফোঁটা পানির স্পর্শও পায়নি।

ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণায় ভগ্নদশায় পতিত হয়ে যখন বসেছিলাম তখন আমার যেন একটা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল। আমি যেন কোন সুদূরের কালাদান নদীর কাছে পৌঁছে গেছি, সেখানে ভোরের মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, ঠান্ডা এবং সুগন্ধযুক্ত, স্বচ্ছ সবুজ জলধারা আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। আমি ভারতের মরু অঞ্চলের কথা ভাবলাম, প্রাচ্যের লোকেরা জলের জন্য কতটা হাহাকার করে। তাদের প্রতিটা ধর্মে জলের ব্যবহার আছে, জল দিয়ে তারা পবিত্রতা অর্জন করে, কীভাবে তারা ঝরনার জলকে নিয়ে কবিতা রচনা করে, কীভাবে একটা কুয়োর ওপর নির্ভর করে তারা বেঁচে থাকে। কীভাবে একজন মরণাপন্ন লোকের

কাছে জলধারার মরীচিকা এসে বিভ্রান্ত করে। মাত্র এক পেয়ালা পানির জন্য আমি কি না দিতে পারি!

টোবির ডাকে আমি দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। সে একটা কলাগাছের বাকল নিয়ে সেটা পিষ্ট করে রস বের করেছে, সেই সামান্য রস আর কিছু কাঁচকলা ভাগ করে সবাই খেলাম আমরা।

আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে সেন্দুদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখা যাচ্ছে। একের পর এক নীল পর্বতের সারি চলে গেছে দূর দিগন্তে। আমাদের দক্ষিণ দিকে অনেক দূরে নিচের উপত্যকার মধ্যে সরু রূপোলি সুতোর মতো যা উঁকি দিচ্ছে সেটাকে দুদিন আগে ফেলে আসা সুল্লা খিয়াং নদী বলে মনে হচ্ছে।

সামনের পাহাড়গুলো অতিক্রম করার কোনো শক্তি আমাদের অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া ওদিকে যেসব উপজাতির বসবাস তাদের দেওয়ার মতো কোনো উপহার আমাদের নেই। আমাদের এখন যে কোনো উপায়ে পানির কাছে পৌঁছানো দরকার। যে কোনো মূল্যে বেঁচে থাকার মতো পানি দরকার আমাদের।

তাই আমরা সুল্লা খিয়াংয়ের দিকে যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলাম। যাওয়ার পথে সেন্দুদের চোখ এড়িয়ে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আমরা আবারো পিছু হেঁটে যাত্রা করলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আমি একটা ঘররঘররর শব্দ শুনতে পেলাম।

'ওটা কী?' আমি জানতে চাইলাম।

মেজর এম.-এর এক আর্দালি বলল, 'সাহেব, ওটা একটা বাঘ, সাহেব। এখানে সে শুয়েছিল আমি তার গায়ের ওপর পা দিতে যাচ্ছিলাম প্রায়। আমার মনে হয় বাঘটা ঘুমিয়ে ছিল।

বাহ! একটা মাত্র বাঘ! আমরা যেদিকে যাচ্ছে সেখানে তো মনুষ্যবাধে পরিপূর্ণ। 'সাবধানে পথ চলো, নইলে প্রাণ হারাবে।'

আমি এখন একটু ভালোভাবে হাঁটতে পারছি, কারণ আমাদের পথটা চালুর দিকে চলে গেছে। কিন্তু আমার ক্ষতটা এখনো পুরোপুরি সারেনি। পা টেনে টেনে চলতে হচ্ছিল। অবশ লাগছিল পায়ে। আমি আগে চলার চেষ্টা না করে মেজর এম. এবং তার এক আর্দালির পেছন পেছন হাঁটছিলাম।

হঠাৎ করে এম. এবং তার আর্দালিকে মাথা নিচু করে বসে পড়তে দেখা গেল। যেন তাদের কেউ গুলি করেছে। আমিও দেখাদেখি চট করে বসে পড়লাম। বাকিরাও একইভাবে বসে পড়ল। আমি পেটের ওপর শুয়ে ঘাসের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি আমাদের সামনে তিনজন সেন্দু পথরোধ করে আছে। তাদের একজন গাছের ডালের ওপর বন্দুক নিয়ে বসে আছে। বাকি দুজন গাছের নিচে। দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা চারপাশে নজর রাখছে।

আমরা সবাই হামাগুড়ি দিয়ে দীর্ঘ ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম। এখন কী উপায়? আমাদের সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর আচমকা আক্রমণ করে তাদের ধরাশায়ী করা যাবে নিঃশব্দে। সংখ্যায় আমরা তাদের দ্বিগুণ।

কিন্তু খানিক পরেই আরো নিচ থেকে অগণিত কণ্ঠের শব্দ ভেসে এলো। তখন বুঝলাম এ পথে আর যাওয়া যাবে না। আমরা আবারো ফিরতি পথ ধরলাম। পর্বতারোহণের কষ্টকর যাত্রা। অনেক কষ্টে কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা ছায়াঢাকা জঙ্গলঘেরা জায়গা পেলাম সেখানে নিজেদের লুকিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ পর তাদের জোরালো কন্ঠস্বর শোনা গেল, হাসাহাসি আর উল্লাসের শব্দ। তারপর আস্তে আস্তে কোলাহল কমতে লাগল। একসময় চারপাশ পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শত্রুরা তাদের বাড়ি ফিরে গেছে মনে হলো।

রাতের অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেলে আবার আমরা সাবধানে নামতে শুরু করলাম। আমাদের পথরোধ করে থাকা শত্রুরা যদিও চলে গেছে তবু ওখানে এখনো তাদের জ্বালানো আগুনের পোড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর কিছুদূর নামার পর আমরা একটা ঝরনার দেখা পেলাম যেটা আমাদের গন্তব্যের দিকে চলে গেছে। এটা খুব আনন্দের ব্যাপার। আমি পরম স্বস্তির সাথে আমার মুখ ডুবিয়ে দিলাম ঝরনার মধ্যে, পেট ভরে পানি খেলাম।

এখানে আমরা এক ঘণ্টার মতো যাত্রাবিরতি করলাম। প্রাণভরে তৃষ্ণা মেটালাম সবাই। আমরা যখন আবারো পথ চলতে শুরু করেছি তখন চারদিকে ঘন কুয়াশা আর অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে। তার মধ্য দিয়েই আমাদের পথ চলতে হচ্ছে সকালে দেখা গন্তব্যের দিক অনুমান করে। যেটাকে আমরা সুল্লা খিয়ং বলে ভাবছি সেদিকে যাচ্ছি 1 যতই নিচের দিকে যাচ্ছি বড় বড় গাছ সামনে পড়ছে। জঙ্গলও ঘন হচ্ছিল।

রাত হয়ে গিয়েছিল। ঠান্ডায় আমাদের হাড় কাঁপুনি দিচ্ছিল। তাছাড়া আমরা খুব ক্ষুধার্তও ছিলাম। সবাই মিলে ঠিক করলাম আমরা এখানে একটা জঙ্গলঘেরা জায়গায় আশ্রয় নেব। সেখানে আমরা একটু আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করব। ঘন ঝোপঝাড়ে ঘেরা বলে দূর থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। তাছাড়া জঙ্গলের হিংস্র পশুরাও দূরে থাকবে আগুন দেখলে। আমাদের চারপাশে কিছু বুনো জন্তু-জানোয়ারের চলাফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

ভাগ্যক্রমে আমার কাছে চারটা ম্যাচের কাঠি ছিল। সেগুলো দিয়ে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করলাম শুকনো পাতা আর ডালপালা জোগাড় করে। কিন্তু শুকনো পাতাগুলো কুয়াশায় নেতিয়ে গিয়েছে। ফলে আগুন জ্বালানোর তিনবারের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তিনটা কাঠি নষ্ট হওয়ার পর শেষ কাঠিটা নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে জ্বালাবার চেষ্টা করলাম। এবার সফল হলাম কোনোমতে। আগুনের চারপাশ ঘিরে বসলাম সবাই।

এখন প্রশ্ন হলো এই অবস্থা আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারব? খিদের জ্বালায় সবার নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে। শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই।

তাই সবাই পরদিন মেজর এম.-এর কুকুরটা ভক্ষণের ব্যাপারে একমত হলো। বেচারা মেজর এম. নিজেও খুব কাহিল। তিনি বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। প্রিয় কুকুরটাকে উৎসর্গ করতে রাজি হলেন সবার প্রাণ রক্ষার তাগিদে।

আমাদের স্থানীয় সঙ্গীরা খুব ভেঙে পড়েছিল। একমাত্র ফজুল্লা ব্যতিক্রম। সে এত কষ্টের মধ্যেও তার বিনীত আচরণ এবং হাসিমুখ ধরে রেখেছিল। বেচারা টোবি কেবল কান্নাকাটি করছিল। সে বলছিল তার কপালের দোষে আজ এই অবস্থা। সে চিরকালই দুর্ভাগা। এখানেও তাকে দুর্ভাগ্য ছাড়েনি। সে নিশ্চিত জীবনে আর কখনো পরিবারের কাছে ফিরতে পারবে না। তবু হাতে রান্নার খুন্তিটা ধরে রেখেছে এখনো।

আগুনটা বেশিক্ষণ জ্বলতে পারল না। জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে আগুনের শিখা ছোট হয়ে এলো, কিছুক্ষণ পর পুরোপুরি অন্ধকার। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দ। অনেক দূর থেকে হাতির ডাক শোনা গেল দুয়েকবার।

১৯. দুর্গম অজানা পর্বতে পথ হারানো

সকাল হওয়ার পর বিতর্ক উঠল আমরা কোন পথে রওনা দেব? একটা দল বলছে ঢালু পথে সোজা এগিয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্না খিয়ং নদীতে না পৌঁছায়। মেজর এম তাদের দলে। তাদের ধারণা ওদিকে গেলে তারা কালাদান নদীর কাছে পৌঁছাতে পারবে।

আমি তাদের বিপরীত দিকে অবস্থান নিলাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এর উল্টোদিকে আমাদের যাওয়া উচিত। আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেলাম। মেজর এম.এর দলে সবাই গেল। আমার সাথে শুধু ফজুল্লা।

অতঃপর আমরা রওনা হলাম। কিন্তু ত্রিশ গজ না যেতেই আমাদের দলটা পরিষ্কার একটা পথের দেখা পেল। এই পথ দিয়ে কুলিরা পালিয়েছে বলে মনে হলো। বোঝা যাচ্ছে এখান দিয়েই আমাদের শত্রুরা কুলিদের তাড়া করেছে। এই আবিষ্কার আমাদের খুব চাঙ্গা করে তুলল।

আমি তাড়াতাড়ি ফজুল্লাকে পাঠালাম অন্য দলের সবাইকে ডেকে আনতে। সবাই এলে আমরা নতুন খুঁজে পাওয়া পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর না যেতেই আমরা জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেলাম।

কে ফোঁপাচ্ছে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল মেজর এম.-এর চাকরদের একজনকে। সেও কুলিদের সাথে পালিয়েছিল। কিন্তু তাদের সাথে তাল মেলাতে না পেরে পেছনে পড়ে গেছে। আমাদের সাথে দেখা না হলে সে হয়তো মারা পড়ত এখানে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাবু হওয়া ছাড়াও সে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। আমরা তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করলাম।

সে জানালো, সে এই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল অন্তত শ দুয়েক সেন্দু কুলিদের তাড়া করে যাচ্ছে। তারা পার হয়ে যাওয়ার পর চিৎকার আর গুলির শব্দ শুনেছিল। কিছুক্ষণ পর দলবল নিয়ে এই পথে তারা আবার ফিরে এলো। তখন তাদের সংখ্যা চারশর কম হবে না। তাদের সাথে লুট করা মালামাল এবং কিছু বন্দিও দেখা গেছে। সবাই উৎফুল্ল হয়ে খোশালাপ করতে করতে চলে গেল।

দুপুর একটার দিকে আমরা সুল্লা খিয়ং-এ পৌঁছলাম। কিন্তু অস্বস্তির সাথে দেখলাম যে আমাদের রেখে যাওয়া নৌকাগুলো ওখানে নেই। আরো কিছু সময় খোঁজার পর আমরা একটা নৌকার দেখা পেলাম যেটা নদীর উল্টোদিকে রাখা আছে। এদিকে স্রোত খুব প্রবল এবং এখানে কুমির থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের এসব ভাবার কোনো সময় নেই। আমরা নৌকাটা মোটামুটি অক্ষত অবস্থাতে পেয়েছি ওটাই ভাগ্য। নৌকাটা কাছে আনার পর দেখা গেল ওটার একটা মাত্র বৈঠা। আরেকটা বৈঠা বানিয়ে নিলাম বাঁশ কেটে। তারপর সবাই উঠে বসবার পর দাঁড় বাইতে শুরু করলাম।

এ ধরনের নৌকা চালানোতে আমার পূর্বাভিজ্ঞতা এখানে বেশ কাজ দিল। দলের বাকি লোকদের মধ্যে কারো নৌকা চালানোর বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। কালাদান নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে আমি ভঙ্গুর ভেলায় যেভাবে দাঁড় বাইছিলাম সে কথা ভেবে এখানেও বসার জায়গা ঠিক করলাম যদিও সেটা খুব নির্ভুল ছিল বলা যাবে না।

নদী তীরে যেখানে আমরা নৌকায় উঠছিলাম সেখানে বেশকিছু চাল ছড়িয়ে পড়েছে দেখা গেল। সম্ভবত আমাদের মালপত্রের ঝুড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে চিবিয়ে খেলাম। পেটে সামান্য খাবার পড়ার পর আমরা একটু ভালো বোধ করতে লাগলাম। তারপর ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার নৌকা চালাতে শুরু করলাম।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা সুল্লা খিয়ং ছেড়ে বড় নদীতে এসে পড়লাম। উজ্জ্বল রোদ চারপাশে। খরস্রোতা ঢেউয়ের গর্জন ভেসে আসছে চারপাশ থেকে। আমার বুকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল। ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম আমাদের রক্ষা করার জন্য। আমি এত বিধ্বস্ত এবং এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে ওইসব ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে পড়লে আমি তলিয়ে যাব। তবে এত ধকল পার হওয়ার পর এতক্ষণে শরীরের ব্যথা বেদনাগুলো তাদের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করল। আমার পা ঠান্ডায় জমে অবশ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল পা দুটো মরা কাঠের টুকরো বিশেষ। তবু আমি সশব্দে আমার সঙ্গীদের চিৎকার দিয়ে উৎসাহ দিলাম যেন জোরসে টেনে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

স্রোতের গর্জন ক্রমশ বাড়ছিল। নদীর মধ্যে সমান্তরাল ধারায় জলস্রোত ছুটে যাচ্ছিল নিচের দিকে। বিপজ্জনক সময় সামনে আসছে। আমি দেখছিলাম

সামনে উথালপাথাল স্রোত, ঘূর্ণিপাকে নেচে বেড়াচ্ছে, ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে ঢেউয়ের মাথায়। আমি প্রস্তুত হলাম বিপজ্জনক পথটা পার হওয়ার জন্য। অপেক্ষাকৃত শান্ত অংশ দিয়ে জায়গাটা পার হওয়ার চেষ্টা করছি। সবাইকে সাবধান করে দিলাম যেন প্রাণপণে শক্ত করে নৌকাটা ধরে রাখে। তারপর দ্রুত হাল ঘুরিয়ে নৌকাটাকে স্রোতের মধ্যে ঠেলে দিলাম।

হুইশ করে মোলায়েম গতিতে আমরা লাফিয়ে পড়লাম নিচের স্রোতধারার ওপর। ডুবে যেতে যেতেও ভেসে উঠল নৌকাটা। আমার লোকেরা দানবের মতো বৈঠা চালাতে লাগল। ঢেউয়ের প্রবল গর্জনের মধ্যে উত্তাল স্রোত পেরিয়ে সবার সম্মিলিত চেষ্টার পর আমরা শান্ত জলধারার মধ্যে পৌঁছে গেলাম।

এবার আমরা দ্রুতগতিতে দাঁড় বেয়ে তেইনওয়ের গ্রামে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম যেখানে খাবার পাওয়া যাবে। যেখানে আছে গ্রামের বন্ধুসুলভ মানুষেরা। এটা ভাবতেই আমাদের বুকটা আনন্দ এবং স্বস্তিতে ভরে উঠল। অবশেষে আমরা প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারলাম।

মেজর এম. আর আমি পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে নৌকা থেকে নামলাম। এভাবেই আমাদের সেন্দু অঞ্চলে প্রবেশ করার অভিযানটি ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো।

পাহাড়ে বদলি (১৮৬৬)

২০. ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসা

গত কয়েক সপ্তাহের কথা ভাবলে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে যায় যিনি আমাকে ভয়ানক সব বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। সেন্দুদের হাতে ধরা পড়লে নির্যাতন বা দাসত্ব করে মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। তবে এটা ঠিক যে আমাদের এই ব্যর্থতার জন্য আমাদের কোনো অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করা যায় না, দুর্ভাগ্যই বেশি দায়ী ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যুদ্ধংদেহী সেন্দুদের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। যার ফলে আমাদের সাথে থাকা সেন্দু গাইড তাদের সাথে তিক্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। আমাদের সেন্দু গাইডরা ছিল খেইনং গ্রামের অধিবাসী। আমাদের সাথে বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছিল ওরা। আমার মনে হয় না তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। আমরা তাদের সাথে হেসে-খেলে পান তামাক খেয়ে কাটিয়েছি। আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের সাথে সহযোগিতা করলে তাদের ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ অনেক বেশি হতো। আমার আরো মনে আছে পালিয়ে যাওয়ার সময় ইৎসি আমাকে ডেকেছিল তাদের সাথে যাওয়ার জন্য। তাকে ধার দেওয়া তরবারিটা নিয়ে সে নিশ্চয়ই অনেক ঝামেলায় পড়েছিল। তবু সেটা সে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। চাইলে সে ওটা ফেরত না দিলেও পারত।

যাই হোক, সেই ভয়ানক অধ্যায়টার অবসান হয়েছে। আমার মনে আছে ওই জঙ্গলের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতার পর আকিয়াবের সভ্য জগতে ফিরে আমার কাছে সবকিছু অদ্ভুত লাগছিল। নিরাপদ বলয়ে ইংরেজদের মধ্যে ফিরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খেতে বসেছি, এটা যেন একেবারে অবিশ্বাস্য একটা কিছু।

আমি চট্টগ্রামে টেলিগ্রাম করলাম। ওখান থেকে ‘ফোম’ নামের পুলিশ ইয়টটি আকিয়াবে পাঠাতে বললাম আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দীর্ঘ সময় ধরে খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত স্থানে একের পর এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাটিয়েছি। এর ফলে শরীরের ওপর যে ভয়ানক ধকল গেছে তাতে আমার মনে অন্য কোনো ভাবনা ঠাঁই পায়নি। আমাদের রীতিমতো বন্য জন্তু-জানোয়ারের মতো জীবনযাপন করতে হয়েছে এই কদিন। এতদিন পর আমি বাংলার পথে রওনা দেওয়ার সাথে সাথে আমার কাছে আমার কর্মক্ষেত্রের ভাবনাগুলো ফিরে এলো। আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম আমার অনুপস্থিতিতে আমার পুলিশি কাজকর্ম কীভাবে চলেছে। এতদিন পর আমাকে দেখে ইন্সপেক্টর জেনারেল কীরকম মনোভাব দেখাবেন, কী বলবেন, ইত্যাদি।

আকিয়াব হলো আমার দেখা সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত একটা জনপদ। এটার প্রায় সম্পূর্ণ স্থলভাগ উপসাগরবেষ্টিত, যার পেছন দিকে খিয়েন এলাকার নীল পর্বতমালা ছড়িয়ে আছে। এখানে ইউরোপিয়ানদের বাড়িগুলো মাইলের পর মাইল সাদা বালুকাময় সৈকতজুড়ে তৈরি করা হয়েছে যেটা দেখে মনে হয় এটা ভারতীয় কোনো স্টেশন নয়, বরং ইউরোপের কোনো সৈকত। এখানে অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, যারা মূলত হাসিখুশি দিলখোলা। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের মতো গোঁড়া কিংবা সংকীর্ণমনা নয়।

আমি খানিকটা আক্ষেপের সাথে আমার বন্ধু এবং সহযাত্রী মেজর এম. এবং অন্যান্য সহৃদয় স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ তারিখে ফোম জাহাজে উঠে পড়লাম। অনুকূল বাতাসে জাহাজটা চট্টগ্রামের দিকে পাল তুলে চলল। ডেকের মধ্যে মাস্তুলের ছায়ায় শরীর এলিয়ে দিয়ে আমি শুভ্র সৈকত রেখা এবং তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা নীল পর্বতের দিকে তাকিয়ে আছি।

বসে বসে শুনছিলাম আমার জাহাজের সারেং আবদুল মাঝির কথা। সে চট্টগ্রামের একজন ভালো মুসলমান। আমার বিস্ময়কর অভিযান নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে যেসব চমকপ্রদ কথাবার্তা ছড়িয়েছে সেসব নিয়ে সে আমাকে বলছিল।

'বুঝলেন সাহেব, ওই যে কাপড়ের ব্যবসায়ী শেরবান আলী, যাকে আপনি চেনেন, যে বড় বাজারের মসজিদের পাশে বসবাস করে, সে আমাকে কয়েকদিন আগে বলেছে আপনার অভিযান সম্পর্কে। আমরা শুনেছি আপনি না কি কাবুলি ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধরে, হাতমুখে রং মেখে সেন্দু রাজার দেশে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সেন্দুরা টের পেয়ে যায় যে আপনি আসলে একজন ইংরেজ এবং তৎক্ষণাৎ আপনাকে আটক করার জন্য আদেশ জারি করে। কিন্তু ইনশাল্লাহ সেটা তো সত্যি হতে পারে না। আপনি রাজার চোখে ধুলো দিতে পেরেছেন বলে সার্জেন্ট ফজুল্লা আমাকে বলেছে।'

আমি জাহাজের সামনের অংশে তাকিয়ে দেখলাম সার্জেন্ট ফজুন্না প্রশান্তির সাথে হুঁকায় টান দিতে দিতে মাঝি-মাল্লাদের সাথে দীর্ঘ গল্পের আসর জমিয়ে বসেছে। পাশেই টোবি বসে আছে। তার মুখে দাঁত কেলানো হাসি।

আবদুল মাঝি বলে চলল ----

'আমরা শুনেছি আপনি কীভাবে সেন্দুদের গ্রাম থেকে পালিয়েছেন, কীভাবে উপত্যকার মধ্যে দিনের পর দিন তাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন। তারপর আল্লাহতালার দয়ায় রাতের অন্ধকারে সাতার দিয়ে নদী পার হয়ে পালিয়ে এসেছেন। এটা সত্যি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কিন্তু সাহেন ফজুরা তো স্বীকার করবে না আপনাদের সবাইকে কুকুর খেতে হয়েছে। ওখানকার লোকেরা তো কুকুর খেয়ে বেঁচে থাকে, তাই না সাহেব? আহা! থাক, ওতে আপনার তো কিছু করার ছিল না।

তবে সাহেব, আপনার ভাগ্য অতি চমৎকার। আমি যেদিন চট্টগ্রাম থেকে রওনা দিলাম, সেদিন কলকাতা থেকে জাহাজে করে লাটসাহেব এসেছেন এবং তিনি আপনাকে বিশেষ সম্মান জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

এটা একটা বিশেষ খবর বটে। লাটসাহেব মানে নিশ্চয়ই বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর। তিনি চট্টগ্রাম সফরে এসেছেন এবং আবদুলের বাকোয়াজি মতে আমাকে "বিশেষ সম্মান জানাবার জন্য। তবে সেটা যাই হোক এ সময়ে চট্টগ্রামে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সবচেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তার উপস্থিতির সময় ইন্সপেক্টর জেনারেলের সাথে আমার মোলাকাতটা অপেক্ষাকৃত মসৃণ হবে বলে মনে হয়। বলা যায় না, আমার এই অভিযানের ঘটনাটি কর্মক্ষেত্রে আমার উন্নতির পথে সহায়কও হতে পারে।

আমি চট্টগ্রাম পৌঁছালাম ১৯ ফেব্রুয়ারি। আমাকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানালেন আমার সুহৃদ বন্ধু এবং কমিশনার। তিনি আমাকে পেয়েই আমার সাম্প্রতিক ডায়েরি, তাঁকে পাঠানো আমার পূর্বেকার চিঠি সবকিছু জড়ো করে লাটসাহেব অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। লাটসাহেব এখন চট্টগ্রাম বন্দরে কর্ণফুলী নদীতে একটা বিশেষ জাহাজে অবস্থান করছেন।

বিকেলে আমরা সেই মহান কর্তার সাথে দেখা করতে গেলাম যিনি আমাকে খুব আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসার পর আমার নিজেকে অনেকটা ভারমুক্ত মনে হলো। আমি একটু শঙ্কিত ছিলাম আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানের বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে কোনোরকম বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন এই কি না।

ইংল্যান্ডে টেলিগ্রাম করে আমার বাড়ির লোকদের জানিয়ে দিলাম যে আমি নিরাপদে ফিরে এসেছি (মাত্র কয়েক শব্দের একটা টেলিগ্রাম বার্তা পাঠাতে আমার তখন ৫.৮ পাউন্ড খরচ হয়েছিল এবং পাঁচদিন সময় লেগেছিল)।

তারপর আমি আমার পাহাড় চূড়ার বাংলোতে উঠে পড়লাম। আমার পুরনো দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়া, সন্ধেবেলা র‍্যাকেট কোর্টে হাজিরা দেওয়া, যেটা সব স্টেশনের রীতি—সব আগের মতো শুরু করলাম। তাছাড়া কমিশনারের বাড়িতে সংগীতের আসরেও মাঝে মাঝে যোগদান করি।

২১. চন্দ্রঘোনায় নতুন দায়িত্ব

১৮৬৬ সালের মার্চ মাসের কলকাতা গেজেটে দেখলাম আমাকে ১০৪ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে আরো জানা গেল যে আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সুপারিন্টেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। শেষের পদটি আমাকে দেওয়া হয়েছে কমিশনারের সুপারিশে যিনি

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন করার জন্য একজন যোগ্য প্রশাসক খুঁজছিলেন। এই পদের জন্য তিনি আমাকে উপযুক্ত মনে করেছেন।

সরকারি নিয়োগপত্রের মধ্যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর একটু সংশয় প্রকাশ করেছেন পার্বত্য এলাকা শাসন করার মতো আমার যথাযথ প্রশিক্ষণ আছে কি না। খাজনা আদায় কিংবা ভূমি বিরোধ নিরসনের মতো জটিল কাজে আমার যোগ্যতা কতটুকু। কিন্তু কমিশনার প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার যোগ্যতা এবং দক্ষতা নিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি নিজ দায়িত্বে নজর রাখবেন বলে জানালেন। এর ফলে আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল।

এপ্রিলের ১৫ তারিখ আমি আমার সরকারি দায়িত্ব বুঝে নিলাম। সিভিল এবং রাজস্বসংক্রান্ত দায়িত্বের পাশাপাশি ফৌজদারি মামলা চালাবার জন্য বিচারিক ক্ষমতাও দেওয়া হয় আমাকে। আমার নতুন জেলায় যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং মালামাল আনা নেওয়ার জন্য কমিশনার আমাকে তাঁর নিজস্ব নৌযানটি দিয়েছিলেন।

চন্দ্রঘোনায় আমার নতুন হেডকোয়ার্টার চট্টগ্রাম থেকে নদীপথে প্রায় আশি মাইল ভেতরে পার্বত্য জেলার সীমান্তে অবস্থিত। সুপারিনটেনডেন্টের বাংলোটা ছোট একটা টিলার ওপর নির্মিত। ওটা আমাকে বিনামূল্যে থাকার জন্য প্রদান করা হয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে কর্ণফুলীর প্রশস্ততম অংশ দেখা যায় এবং উত্তর-পূর্ব দিকে গভীর জঙ্গল বেষ্টিত উঁচু পার্বত্য এলাকা। পর্বতমালাগুলো ধাপে ধাপে উঁচু হতে হতে অজানা অঞ্চলের দিকে চলে গেছে।

আমার বাংলোটা ছোটখাটো। মাত্র একটা বসার ঘর আর একটা থাকার ঘর। সাথে আছে একটা বাথরুম আর স্টোররুম। তবে সামনের দৃশ্যাবলি এত মনোরম যে আমি টেবিলে বসে কাজ করতে করতে আমার সামনে ছড়ানো অপরূপ দৃশ্যাবলি দেখতে পারি। বারান্দার সামনের জায়গায় লজ্জাবতী গাছের পুরু কার্পেট বিছানো। এক কোণে একটা ডালিম গাছ। আমি যখন প্রথম আসি তখন ওটার মধ্যে থরে থরে ফল ধরে ছিল।

টিলার একটু নিচের দিকে কাচারিঘর, যেখানে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চলে। এখানে পুলিশের প্রহরায় একটা ট্রেজারিও আছে যেখানে সরকারের রাজস্ব জমা করা হয়। আরো নিচের দিকে নদী তীরে দশ বারোটি দোকান আছে যেটাকে বাজার বলা হয়। তার পাশেই মাটির তৈরি পুলিশের ব্যারাক। এখানে পঞ্চাশ জনের মতো রিজার্ভ পুলিশ আছে যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পার্বত্য সীমান্ত এলাকার মধ্যে বদলি হিসেবে কাজ করে। তাদের মূল কাজ হলো সীমান্ত এলাকার স্বাধীন ও বেয়াড়া উপজাতিগুলোর উৎপাত ঠেকানো।

আমি অবিলম্বে কাজকর্ম শুরু করলাম এবং নিজের আওতাধীন কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলাম। আমি সবসময় সেই পুরনো প্রবাদটি মনে রাখি- ‘তুমি যদি ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করে রাখো তা হলে তুমি

একদিনে তিনদিনের কাজ এগিয়ে রাখো।’ আমি সেই সূত্র মেনে আমার সকল কাজকর্ম করি।

সাধারণত ভোর ছটায় ঘুম থেকে উঠে ফলমূলের সাথে এক কাপ চা খেয়ে ঘণ্টাখানেক বার্মিজ ভাষা অধ্যয়ন করি। এরপর আমি চিঠিপত্রগুলো খুলি, সকল পুলিশ রিপোর্টের ওপর চোখ বুলাই, নির্দেশ জারি করি। দশটার দিকে আমি কাচারিতে যাই এবং বিভিন্ন মামলার শুনানিতে অংশ নেই। এখানে খাজনা সংক্রান্ত মামলাই বেশি আসে। আর অল্প কিছু পারিবারিক বিরোধের মামলা থাকে। পার্বত্য এলাকায় তেমন গুরুতর বিষয়ের মামলা দেখা যায় না। কিন্তু আমার মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ালো নিম্ন আদালতের উকিলগুলো। এরা পাহাড়ি লোকদের অজ্ঞতা এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের খামাকা নানান ইস্যুতে মামলা করার জন্য প্ররোচিত করে, উসকানি দেয়।

খাঁটি পাহাড়ি লোকেরা ইংরেজের আদালতে বিচার চায় না, ওরা এসব আইনি প্রক্রিয়াকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, তারা বাংল বোঝে না। আদালতের ভাষা হলো বাংলা। সেই সাথে আদালতের খরচ, উকিলের ফি, সরকারি স্ট্যাম্পের খরচ ইত্যাদি যে কোনো মামলার জন্য অপরিহার্য। এটা তাদের জন্য ব্যয়বহুল এবং ঝামেলাপূর্ণ। আমি এসব দেখে ঠিক করলাম যে কমিশনারের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে এদের জন্য আদালতের মধ্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না।

প্রতিদিন কাচারির কাজ সেরে আমি আমার পুলিশদের ড্রিল করাই। এই কাজে আমাকে সাহায্য করে আমার পুরনো সুহৃদ ফজুল্লা যাকে আমি নিজের স্বার্থেই এখানে বদলি করে এনেছি। সে এখন পদোন্নতি পেয়ে সাব-ইন্সপেক্টর হয়েছে। সেন্দু অভিযানে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পুরস্কার। আরো একজন যোগ্য সৈনিককে আমার সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি। তার নাম রালদ্রো খান, সে সিপাহি বিদ্রোহের সময় হাবিলদার হিসেবে শিখ রেজিমেন্টে কাজ করত। পরে পুলিশ বিভাগে যোগ দিয়ে আমার ভাগ্যের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। সে নোয়াখালী থেকেই আমার সাথে সাথে আছে।

সে আর ফজুল্লা দুজনেই পরীক্ষিত সৈনিক। তাদের খুব ভালো প্রশিক্ষণ আছে পুলিশের ড্রিল এবং শৃঙ্খলার ব্যাপারে। কিন্তু বাকি পুলিশদের অবস্থা যা তা। অধিকাংশ ৰাঙালি কঠিন কোনো কাজের জন্য উপযুক্ত না। যদি কোনো লড়াই করার পরিস্থিতি আসে তা হলে তারা সম্ভবত প্রথমেই প্রাণ হাতে নিয়ে পালাবে। তবে তাদের মধ্যে যেসব মণিপুরী জাতিগোষ্ঠীর লোক আছে, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিলে ভালো সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু এদের আবার সমস্যা হলো বর্ণবৈষম্য, এই কারণেই এরা পিছিয়ে পড়ে আছে।

ড্রিল করা শেষ করে আমি বাজারের দিকে যাই, কারো কোনো অভিযোগ আছে কি না জানার চেষ্টা করি। তারপর আমি সরকারি হাতিগুলো পরিদর্শন করি। এই জেলার কাজের জন্য ছয়টা হাতি আছে। এই অঞ্চলে সাধারণত

নৌকা কিংবা পায়ে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। যখন গভীর জঙ্গল কিংবা ঝিরিপথ ধরে এগোতে হয় তখন হাতির পিঠে চড়ে যাওয়াই রীতি।

আমি জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি যে পাহাড়ের লোকদের কাছে আমি 'আরবার্ট তংলুইন' নামে পরিচিতি পেয়ে গেছি। কালাদানের পথে যাওয়ার সময় মাতামুহুরি নদীর কাছে যে তোয়েকাম তংলুইনের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, তিনি সেটা ভোলেননি। সবার কাছে আমাদের দুজনের সম্পর্কটা রটিয়ে দিয়েছেন।

বর্ষাকাল শুরু হলে আমার নতুন কর্মস্থলে কাজ কমে গেল। তখনই প্রথমবারের মতো পার্বত্য অঞ্চলের বর্ষার মজাটা টের পেতে শুরু করলাম। এক রাতের মধ্যে আমার জুতো ফাঙ্গাসে ছেয়ে গেল। যদি কোনো বই দুদিন না উল্টাই সেগুলো নেতিয়ে যায় এবং পাতায় পাতায় নীল রঙের শ্যাওলা জন্মাতে শুরু করে। আমার প্রিয় বেহালাটা টুকরো টুকরো হয়ে খুলে পড়ল। তার সব আঠা উঠে গেল। বাক্স খুলে আমি তাকে ভগ্ন দশায় আবিষ্কার করলাম একদিন। বর্ষার শুরুতে জ্বরজারি এবং অন্যান্য অসুখবিসুখ সেরে যায়। তাপমাত্রা নেমে গিয়ে একটা আরামদায়ক আবহাওয়া তৈরি হয়। তবু সত্যি বলতে, এই সময়ে পার্বত্য অঞ্চলটা তেমন স্বাস্থ্যকর স্থান নয়। তারপরও পরবর্তীকালে আমি এই পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম এবং এই অঞ্চলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রথম দিকের অনভ্যস্ততা এবং নানামুখী চাপের কারণে আমার মাথার চুল পেকে গিয়েছিল যদিও আমার বয়স তখন মাত্র সাতাশ বছর।

ধীরে ধীরে আমি আমার নতুন সাম্রাজ্যের সাথে পরিচিত হচ্ছিলাম তাত্ত্বিকভাবে। আমি অতি আগ্রহের সাথে আগামী শীতের অপেক্ষা করছি যখন আমি পার্বত্য এলাকা ভ্রমণে বের হব, তখন তাদের সাথে পরিচিত হব।

বর্ষাকালে এখানে সব ধরনের যাতায়াত ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। নদীগুলো এমনভাবে পাহাড়ি ঢলের প্রভাবে প্রচণ্ড খরস্রোতা হয়ে পড়ে যে সেগুলো পারাপার করা কঠিন হয়ে যায়। আমি এই স্থবির সময়টা বার্মিজ ভাষা শেখার কাজে লাগালাম। পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষার মূল উৎস বার্মিজ ভাষা। আমি সেই স্থানীয় প্রবাদের সাথে একমত যেখানে বলা হয়েছে, 'কথা নাই তো, শেখাও নাই"। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি তার ফল পেতে শুরু করলাম। আমি স্থানীয় ভাষা বেশ ভালোভাবে বুঝতে শুরু করলাম এবং কথা বলতেও শিখলাম মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে।

আমার অধীনস্থ এলাকা, যেটা বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পরিচিত, সেটা প্রায় সাত হাজার বর্গমাইল এলাকা। ওখানকার লোকসংখ্যা ছিল ৬৩ হাজার ৫৪ জন। এই জেলাটার উত্তর দিকে স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরা, দক্ষিণে আকিয়াব জেলা এবং পশ্চিমে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। পার্বত্য

চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্ত তখনো নির্ধারিত হয়নি। কিন্তু যতদূর পর্যন্ত ইংরেজের শাসন চলে ততদূর পর্যন্ত এর সীমানা ধরা যায়।

এই পার্বত্য জেলা তিন ভাগে বিভক্ত-

১. দক্ষিণে বোমাং এলাকা, যেটা শাসন করে বার্মিজ বংশোদ্ভূত রাজা।

২. মধ্যভাগ শাসন করে চাকমা রাজার বিধবা স্ত্রী কালিন্দী রানি, তাঁর উত্তরাধিকারী পৌত্র এখনো শিশু 1

৩. উত্তর দিকের অংশে বাস করে বার্মিজ ভাষাভাষী কিছু গোত্র, তাদের সাথে আছে ত্রিপুরা থেকে আগত অভিবাসী। এরা মং রাজার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা প্রদান করে।

উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। পুরো এলাকাই ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু পূর্বদিকে এমন কিছু গোত্র আছে যারা ব্রিটিশ শাসনের তোয়াক্কা করে না। তারা বাঙালিদের কাছে কুকি বলে পরিচিত। কিন্তু তারা নিজেদের লুসাই হিসেবে পরিচয় দেয়। তাদের সংখ্যা অগণিত, তাদের আচরণ আগ্রাসী, তারা সম্ভবত চীন থেকে বার্মা পর্যন্ত বিস্তৃত আসাম অঞ্চলের সিংফো গোত্রের অংশ। তাদের শাখাপ্রশাখা দক্ষিণের শ্যামদেশের সীমান্ত শান প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আমার পুরনো শত্রু সেন্দু তাদেরই একটা শাখা।

এই লুসাই গোত্রের লোকেরা স্থানীয় প্রশাসনের জন্য একটা মূর্তিমান সমস্যা হয়ে আছে বহুদিন ধরে। তারা এই পার্বত্য জেলায় একের পর এক ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এখানকার বাসিন্দাদের সম্পদ লুট করছে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। নারী পুরুষ শিশুদের ধরে নিয়ে দাসত্ব জীবনে বাধ্য করছে। বছরের পর বছর ধরে এই অত্যাচার চলার ফলে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে আমাদের সীমান্ত এবং লুসাইদের সীমানার মধ্যভাগের অন্তত পঞ্চাশ মাইলের মতো এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে নিকটবর্তী লুসাই চিফের নাম রতন পুইয়া। ব্রিটিশ অফিসার মেজর রাৰান ১৮৬১ সালে তার গ্রামে এক অভিযান চালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। তারপর থেকে আরো কয়েকবার অভিযান চালানো হয়েছে লুসাইদের বিরুদ্ধে, তেমন বেশি লাভ হয়নি। ওই দুর্বৃত্তদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। তবে সেই থেকে লুসাইদের সাথে আমাদের এক ধরনের আপাত শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে সেই শান্তিপূর্ণ অবস্থা ভেঙে পড়ে যে কোনো মুহূর্তে আবারো হাঙ্গামা শুরু হতে পারে।

আমার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো দুজন সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। প্রথমজন ক্যাপ্টেন এম. স্থানীয়দের কাছে পাগলা সাহেব নামে পরিচিত

ছিলেন। পাগল হোক বা না হোক, তিনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তার দুর্ধর্ষ কর্মকাণ্ড এখনো স্থানীয় লোকদের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে আছে।

এসব গল্পের মধ্যে একটি হলো, তিনি একবার লুসাইদের একটা দলকে ধাওয়া করছিলেন যখন তারা একটা গ্রামে হানা দিয়ে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের হাতেনাতে ধরার জন্য তিনি ছুটে গেলেন। কিন্তু সংখ্যায় তারা অনেক বেশি ছিল। তাঁর দলের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। কাছে যাওয়ার পর লুসাইরা উল্টো তার দলকে ঘেরাও করে মার দিতে শুরু করল। তখন তিনি খুব ক্ষিপ্র গতিতে পাল্টা আঘাত হেনে তাদের দুজনকে হত্যা করলেন এবং বন্দিদের মুক্ত করে নিয়ে আসলেন।

আরেকবার তিনি বরকলের কাছে একটা খাড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে কর্ণফুলী নদীর ফেনায়িত স্রোতের ওপর পড়েছিলেন। তারপর প্রবল প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে আধ মাইল সাঁতার কেটে নিরাপদে কূলে উঠে পাহাড়িদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

শারীরিক শক্তি আর অদম্য মনোবলের কারণে তিনি এখানে খুব জনপ্রিয়তা পেলেও তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসব অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে এখান থেকে বদলি করে আমার পূর্ববর্তী অফিসারের জন্য জায়গা খালি করেছিল।

কিন্তু আমার পূর্ববর্তী অফিসার ছিলেন অতিরিক্ত নীতিবাগীশ ভদ্রলোক মানুষ। বেড়ে উঠেছেন নিয়ম-কানুনের কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের মধ্যে। এই পার্বত্য অঞ্চল এত বেশি নীতিবাগীশ মানুষের জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। অতএব তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এখন আমার পালা চলছে।

পার্বত্য এলাকায় আমার নিয়োগের কিছুদিন পরই আমি ব্রিটিশ বার্মার চিফ কমিশনার কর্নেল ফেয়ারের চিঠি পেলাম, যার সাথে আমার আকিয়াবে দেখা হয়েছিল। তিনি জানালেন ভারত সরকারের কাছে তিনি আমার নাম সুপারিশ করেছেন কালাদানের পার্বত্য এলাকার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে আমি রীতিমতো আপ্লুতবোধ করছিলাম। আমি তাৎক্ষণিকভাবে ওই পদ গ্রহণে আমার সম্মতির কথা জানিয়ে তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখলাম। কারণ আমি বাংলার চেয়ে বার্মাকে বেশি পছন্দ করেছিলাম, তাছাড়া বার্মিজ এলাকার নিয়োগটা ছিল স্থায়ী কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে আমার নিয়োগটা ছিল সাময়িক।

আরো একটা কারণ ছিল। কেন যেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আবহাওয়া আমার সহ্য হচ্ছিল না। গত কয়েক মাস ধরে আমি খুব ক্লান্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমার পুরনো ক্ষতটাও যন্ত্রণা দিচ্ছিল। যদিও ডাক্তার আশ্বস্ত করেছেন যে হাড়ে বা পেশিতে কোনো সমস্যা নেই, তবু আঘাতের জায়গাটা

ফুলে গিয়েছিল। ডাক্তারের মতে আমার শরীরের সমস্যার মূল কারণ এখানকার আবহাওয়ার প্রভাব।

তবে শেষমেশ বার্মার নিয়োগটা পাওয়া হলো না আমার। বাংলার সরকার সেই প্রস্তাব নাকচ করে আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার এবং পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিল। সেই সাথে আমার বেতনও বাড়িয়ে দিল। একই সময়ে মহারানির ১০৪ রেজিমেন্ট থেকে সরিয়ে আমাকে ক্যাপ্টেন হিসেবে বেঙ্গল সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করা হলো।

লুসাইদের পরবর্তী আক্রমণের খবর পেতে আমাকে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি।

জুলাই মাসের ৭ তারিখে খবর পাওয়া গেল তাদের একটা দল ব্রিটিশ এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং চন্দ্রঘোনার দক্ষিণ দিকে বোমাং রাজার অধীনস্থ তিনটা গ্রামে লুটপাট চালিয়েছে। আরেকটা দল কাপ্তাই নদীর কাছে একটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, চারজনকে হত্যা করেছে এবং আশিজনের বেশি লোক ধরে নিয়ে গেছে। এই আক্রমণটা একটু অস্বাভাবিক সময়ে এলো। এই ঘোর বর্ষাকালে পার্বত্য অঞ্চলে চলাফেরা করা খুব কঠিন। এই সময়ে লুসাইরা অন্য সব পার্বত্যবাসীর মতো চাষবাসের কাজ করে সময় কাটায়।

খবর পেয়ে দুর্বৃত্তদের ধাওয়া করার জন্য আমি পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম পুলিশের একটা দল নিয়ে। কিন্তু গিয়ে কারো চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। তারা ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ চালিয়ে তাদের কার্যসিদ্ধি করে হাওয়া হয়ে গেছে।

আমি বর্ষাকালের বৈরী সময়ে জঙ্গলের মধ্যে পার্বত্য সন্ত্রাসীদের পেছনে নিষ্ফল ধাওয়া করতে গিয়ে ভারী বৃষ্টির মধ্যে জঙ্গলে রাত কাটিয়ে, খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম করে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ফলে আমার কাজের গতি অনেক ধীর হয়ে গেল।

দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা রক্ষা করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এখানে শত শত মাইলব্যাপী এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ, যেখানে চলাচলের কোনো পথ নেই। এই সমস্যাটা আমার ওপর এত কঠিনভাবে চেপে বসেছে যে আমি দিনরাত ওই সমস্যার সমাধানের জন্য একটা পথ বের করার চেষ্টা করছি।

আমার কাছে দুটো বিকল্প আছে। প্রথমটা হলো-আমাদের যে কোনো মূল্যে অভিযান চালিয়ে ওইসব পার্বত্য সন্ত্রাসী গোত্রগুলোর গ্রামকে ধ্বংস করা। দ্বিতীয়টা হলো- আমাদের গোটা সীমান্ত এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি বসিয়ে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে মজবুত করা। দুটো ক্ষেত্রেই সরকারকে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হবে। সরকারের ব্যয় না বাড়িয়ে এই সমস্যার সমাধানের কোনো পথ খোলা আছে বলে মনে হচ্ছে না। আবার আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমার এই দুটো প্রস্তাবের একটাতেও সায় দেবে তেমন সম্ভাবনা কম।

আমার কাছে আর কী পথ খোলা আছে? এটাই আমার সকল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকল। আমি দিনের পর দিন ভাবতে লাগলাম। নানান

পরিকল্পনা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লুসাইদের কাছ থেকে সমীহ আদায় করা। যেটা আমার পূর্ববর্তী ক্যাপ্টেন এম পেরেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে লুসাইদের ধারণা হয়েছিল যে তিনি অজেয়। তাঁকে গুলি কিংবা তির-ধনুক কোনো কিছু দিয়ে ঠেকানো সম্ভব নয়। তাঁর ঝটিকা অভিযানগুলো তাদের জন্য ভীতিকর ছিল।

এখন আমাকে একটা কাজ করতে হবে। সব ইংরেজ শাসকই ক্যাপ্টেন এম.-এর মতো দুর্ধর্ষ ক্ষমতাধর এরকম কোনো ধারণা যদি তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সেটা আমার অনেক সুবিধা দেবে।

বসে বসে নানা ধরনের বইপুস্তক পড়তে গিয়ে রবার্ট হাউডিংয়ের একটা আরব অভিজ্ঞতা চোখে পড়ল। ফরাসি সরকার তাঁকে আলজিয়ার্সের স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে একটা প্রতিযোগিতায় ন্যস্ত করেছিল। তিনি কীভাবে সেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে নিজেকে শক্তিমান জাদুকর হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন সে বৃত্তান্ত পড়লাম। তিনি যে কৌশলগুলো প্রয়োগ করেছিলেন তার মধ্যে একটা ছিল তিনি এক স্থানীয়কে তার গুলিভরা বন্দুক দিয়ে তার বুক বরাবর গুলি করতে বলেছিলেন। বুলেটের মধ্যে একটা বিশেষ চিহ্ন দেওয়া ছিল। তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করার পর তিনি সেই চিহ্ন দেওয়া বুলেটটা তাঁর দাঁতের ফাঁক থেকে বের করে দিয়েছিলেন। কৌশলটা শিখতে আমার বেগ পেতে হলো না। আমি দ্রুততম সময়ে আঙুল চালনায় পারদর্শী ছিলাম। সুযোগ পেলে লুসাইদের মধ্যে এই ম্যাজিকটা দেখাতে চেষ্টা করব। যদি সফল হই তা হলে আমার খ্যাতি নিশ্চিতভাবে বিখ্যাত ক্যাপ্টেন এম.কে ছাড়িয়ে যাবে। এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় বহুল কাঙ্ক্ষিত সুযোগটা নিজেই এসে উপস্থিত হলো আমার সামনে।

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে আমি ঈশান দেওয়ান নামে এক চাকমা মোড়লের গ্রাম পরিদর্শন করতে গেলাম। সেই গ্রামটা কাসালং নদীর তীরে আমাদের সবচেয়ে দূরবর্তী পুলিশ ফাঁড়ির পাশে অবস্থিত। আমার হেডকোয়ার্টার থেকে এক দিনের যাত্রাপথ।

ওই গ্রাম পরিদর্শনের কারণ হলো সেখানে আমাদের পুরনো শত্রু রতন পুইয়ার কয়েকজন বার্তাবাহক এসেছে। রতন পুইয়া তাদের একটা বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছে আমার কাছে। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমি তাদের সাথে রতন পুইয়ার গ্রামে যেতে চাই।

কাসালং পৌঁছানোর পর যথাসময়ে লুসাই কারবারিরা এসে উপস্থিত হলো। রতন পুইয়ার বার্তার সারমর্ম হলো সে আমাদের সাথে বর্তমানে বিদ্যমান স্থিতিশীল সম্পর্কটা বজায় রাখতে আগ্রহী। সে বিশ্বাস করে এই অবস্থা থাকলে তাদের লোকেরা আমাদের সীমান্ত এলাকার বাজারে বেচাকেনায় অংশ নিতে পারবে। সে আরো জানিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে বোমাং গ্রামে যে হামলা হয়েছে সেটার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

আমি তাদের সব কথা ধৈর্য ধরে শুনলাম এবং বললাম যে বার্তাটা বয়ে এনে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব পালন করেছে। এখন রতন পুইয়ার প্রস্তাবটার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে দেখা করা দরকার। সে কি এখানে কাসালংয়ে এসে আমার সাথে দেখা করবে? করলে তো ভালো হতো। কিন্তু টা অসম্ভব। তা হলে আমাকেই যেতে হবে তার গ্রামে।

এই প্রস্তাবে প্রথমে ওরা রাজি হয় না। অনেক দোনামোনা করলেও অবশেষে রাজি হলো ।

ঈশান দেওয়ান তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করল আমাকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভ্রমণ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য। তিনি জানালেন খুব বেশিদিন আগের কথা নয়-রতন পুইয়া একজন সার্জেন্ট এবং দুজন পুলিশকে হত্যা করেছে। তাদের বার্তাবাহক হিসেবে তার কাছে পাঠানো হয়েছিল।

বারণ সত্ত্বেও আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। মৃত্যুর হুমকি আছে ঠিক কিন্তু আমার বিশ্বাস তারা আমার মতো উচ্চপদস্থ কাউকে সহজে হত্যা করার কথা ভাববে না।

২২. লুসাই গ্রামে অনিশ্চিত যাত্রা

আমি জমাদার ফজুল্লাকে হুকুম দিলাম বিশজন পুলিশকে নিয়ে আমার সাথে অভিযানে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে। আমরা একটা নৌকা নিয়ে রওনা দিলাম কাসালং নদী বেয়ে। ছয় মাইল যাওয়ার পর বরকল নামক একটা খরস্রোতা অঞ্চলে পৌছালাম। এখানেই আমার পূর্ববর্তী ক্যাপ্টেন এম. একটা ১০০ ফুট উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে নিচে প্রবল গর্জনে উত্তাল ঢেউয়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে প্রতিকূল স্রোতে সাঁতার কেটে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সত্যি এক দুর্ধর্ষ দুঃসাহসী বান্দা ছিলেন তিনি!

আমার পুরনো শত্রু সেন্দুদের মতো লুসাইরাও নৌকার ওপর ভরসা করতে পারে না। তারা পায়ে হেঁটে চলল। আমার নৌকাটা ঈশান দেওয়ানের চাকমা লোকেরা নিয়ে যাচ্ছে খুব অনিচ্ছার সাথে। তারা প্রাণের ভয়ে আছে। কিন্তু আমি তাদের বাধ্য করেছি আমার সাথে যেতে, কারণ আমার সঙ্গী পুলিশগুলো নৌকা বাইতে পারে না। এমনকি বৈঠা ধরতেও অপারগ তারা। প্রবল খরস্রোতা নদীতে ঠেলে ঠেলে অনেক কষ্টে আমাদের এগোতে হচ্ছিল। কখনো কোমর পানিতে নেমেও ঠেলতে হচ্ছিল নৌকাটা। সূর্যাস্তের আগে আমরা উঠানছত্র নামের একটা জায়গায় পৌঁছালাম, যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সেই লুসাইরা যারা পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই পথটুকু অতিক্রম করেছে।

এখানে আমরা নদীতীরে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট একটা সমতল বড় পাথরের সাথে আমাদের নৌকাটা বেঁধে রাতের মতো ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিলাম। চাকমা মাঝিরা তীরবর্তী বালিয়াড়িতে আগুন জ্বালাল। আগুনের শিখা চারপাশের জঙ্গলের মধ্যে যে উজ্জ্বলতা ছড়িয়েছে তাতে জঙ্গলটা আরো রহস্যময় লাগছিল। জঙ্গলের পাশে নদীর কালো জলের মধ্যে আগুনের আলোর প্রতিফলন দেখছিলাম। সবাই তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে ক্লান্ত শরীরে শুয়ে পড়ল। কেউ আগুনের চারপাশ ঘিরে শুয়ে পড়ল, কেউবা নৌকার মধ্যে কাত হলো। কোথাও থেকে কোনো শব্দ এসে রাতের গভীর নিস্তব্ধতা ভ করল না। শুধু পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর কলকল শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আমি নৌকার মধ্যে বসে রাতের শেষ পাইপটা ধরিয়ে সারাদিনের নৌকা ভ্রমণের কা ভাবতে লাগলাম।

আমি চেয়েছিলাম খুব ভোরে যখন নদীর ওপর ধূসর কুয়াশা ভেসে থাকে সেই সময় রওনা দিতে। তারপর যখন এই স্বর্গভূমিতে সূর্যোদয়ের অপরূপ দৃশ্যের সূচনা হলো আমার লোকেরা সানন্দে দাঁড় বাইতে শুরু করল। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের 'হেইও শব্দটা পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরই তাদের মধ্যে একটা ফিসফিসানি শুরু হলো। যেটা কান থেকে কানে ঘুরতে ঘুরতে আমার কাছে এসে পৌঁছালো। আমাদের নাগালের মধ্যে একটা হরিণ নদীর কিনারে জল খেতে এসেছে। নদীর ওপর ঝুলে থাকা গাছের ওপর এক পাল বানর বসে তাদের ছোট ছোট হাত দিয়ে জলপান করছে। কয়েকশ গজ দূরের জঙ্গলে চমৎকার একটা বনমোরগ হাঁক দিয়ে সকালের সূর্যের আগমন ঘোষণা করছে।

সারাটা দিনের মধ্যে দুপুরটাই একটু নীরস। যখন শুনশান নিস্তব্ধতায় ভরে যায় চারপাশ। মাথার ওপর থেকে জঙ্গলের ছায়াটা সরে যায়। শুধু বড় বড় কালো বুনো মাছি উড়ে এসে কারো হাতের ওপর এমনভাবে বসে প্রথমে মনে হবে যেন এক টুকরো তুলো পড়েছে। কিন্তু যখন সে তার তীক্ষ্ণ হুল ফুটিয়ে দেয়, তখনই তার অস্তিত্ব ভালোমতন টের পাওয়া যায়। একটা বড় ধনেশ পাখি তার বিশাল পাখা ছড়িয়ে উড়ে যায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যেন একটা উড়ন্ত মেশিন। সে নিশ্চয়ই তার প্রেয়সীকে ডিমে তা দিতে বসিয়ে উড়ে চলেছে খাবারের খোঁজে। তার সঙ্গী কাদা মাখা ডিমের ওপর বসে আছে কখন সে খাবার নিয়ে ফিরবে। স্থানীয়রা তাদের বাড়িতে এই পাখি পোষে না, যদিও তারা এর মাংস খেতে পছন্দ করে। না পোষার কারণ তাদের বিশ্বাস এই পাখিদের পুষলে সংসারের মধ্যে অশান্তি দেখা দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়।

যেতে যেতে বেলা পড়ে গেল। পশ্চিমের অস্তগামী সূর্যের সোনালি রূপচ্ছটা ছড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো নদীতে। জংলি মশাদের অবিরাম গুনগুনের সাথে যুক্ত হলো ব্যাঙের সম্মিলিত কোরাসের সুর। আমার মনে আছে, সন্ধ্যার পর যখন আমরা নদীতীর ধরে একটা প্রাচীন বৃক্ষের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন

তীরের জঙ্গলে অসংখ্য জোনাকি ঝিকমিক করছিল। সেই বৃক্ষটি অপূর্ব এক রুপোলি আভায় জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন হাজার হাজার খুদে বিজলি বাতি বারবার জ্বলছে আর নিভছে।

পরদিন সকালে আমরা নৌকা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দশ বারো মাইল দূরের একটা উঁচু পর্বতমালার দিকে হেঁটে চললাম। ওই পাহাড়ের চূড়ায় রতন পুইয়ার গ্রাম। আমাদের পথটা কিছুদূর উঁচু-নিচু এবড়ো-থেবড়ো এলাকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে।

মাঝে মাঝে পাহাড়ি ছড়া পার হতে হচ্ছিল। কখনো ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগোতে হচ্ছিল। তারপর পথটা পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল। বড় বড় পাথরের ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে বিশালাকার সব বৃক্ষ দেখা গেল। যার মধ্যে নানান ধরনের অর্কিড এবং লতাপাতা ঘন হয়ে ঝুলছে।

এখানে এসে আমাদের একটু থামতে হলো। আমাদের পথ দেখিয়ে আনা লুসাই কারবারিরা খানিক সামনে পাহারায় থাকা দুজন বুনো চেহারার লুসাইর সাথে আলাপ করতে গেল। তারা দুজন অস্ত্র হাতে সতর্ক অবস্থায় পথের ধারে একটা বড় পাথরের ওপর দাঁড়ানো। তাদের অনুমতি পেয়ে আমরা এগোতে থাকলাম আবার। যেতে যেতে আমাদের পথটা কয়েকশ ফুট গভীর একটা খাদের কিনারে এসে পৌঁছালো। ওই খাদটা পার হওয়ার জন্য এক ধরনের বাঁশের মই বিছানো আছে গাছের কাণ্ডের ওপর। কাণ্ডগুলো পাথরের খাঁজে দৃঢ়ভাবে আটকানো। জুতা পায়ে ওটা পার হতে আমাকে রীতিমতো খাবি খেতে হয়েছে। ওটা পার হতে পেরে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর একটা ঘাসের জঙ্গলের ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করলাম। চূড়ায় ওঠার পর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন লুসাইর মুখোমুখি হলাম, যারা বন্দুক ও তির-ধনুকে সজ্জিত। তাদের চেহারায় হিংস্র আক্রমণাত্মক ছাপ পরিষ্কারভাবে ফুটে আছে।

আমি তাদের দিকে খেয়াল না করে নিজের মতো করে হাঁটতে থাকলাম। হাঁটতে হাঁটতে দুটো পুরনো প্রবাদের কথা মনে পড়ল।

‘যখন তুমি কোনো অচেনা নদী পার হবে তখন তোমার পতাকা তুলে রাখবে, যখন তুমি কোনো অচেনা গ্রাম পার হবে তোমার পদক্ষেপ দৃঢ় রাখবে।’

আবার আমার চাকরেরা বলে থাকে- ‘তোমার নিজের গ্রামের কাকদের মধ্যে তুমি উদ্ধত মোরগের মতো থাকতে পারো, কিন্তু যখন অন্য গ্রামে যাবে তখন তোমাকে নিরীহ মুরগি হয়ে থাকবে হবে।’

আমি এই খাড়া পাহাড় বেয়ে চূড়ায় ওঠার পর কাহিল হয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। কারবারিরা রতন পুইয়ার সাথে দেখা করতে গেল। তিনি নিজেকে বাইরের লোকদের কাছ থেকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করেন।

২৩. রতন পুইয়ার মুখোমুখি

লুসাইদের দেখে বোঝা যাচ্ছে আমাদের উপস্থিতিতে তারা চরম অসন্তুষ্ট এবং ক্ষিপ্ত। আমার লোকেরা খাতির করে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুবিধা হলো না। আমি ফজুল্লাকে বলে রাখলাম ওরা যেন আমাদের পালাবার পথ বন্ধ করে দিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। আমার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। আমরা এখানে ফাঁদে আটকে পড়া ইঁদুর হয়ে যাব যদি ওরা খানিক আগে পার হয়ে আসা সেই বাশের মইটা সরিয়ে ফেলে। আমি কৌতূহলের দৃষ্টিতে লুসাইদের দিকে তাকাতে লাগলাম। আমাদের সাথে নিয়ে আসা লুসাই কারবারিদের কথা বাদ দিলে এরাই প্রথম হুসাই যাদের আদিম চেহারায় সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছি।

তারা সবাই শারীরিকভাবে সুগঠিত পেশিবহুল মানুষ, গায়ের রঙ একটু কালো। এরা সেই নিষিদ্ধ গোত্রের মানুষ। তাদের পরনে ঘরে বোনা এক টুকরো কাপড়। সাদা রঙের ওপর নীল স্ট্রাইপ, কারো পরনে কালচে নীলের ওপর হলুদ স্ট্রাইপ। এটা ছাড়া ওদের গায়ে আর কিছু নেই।

তাদের সোজা চুলগুলো সামনে কপালের ওপর বেঁধে রাখা। কোনো কোনো সুদর্শন সাহসী চেহারার তরুণ আবার মাথার ওপর নীল, হলুদ, গোলাপি রঙের পালক গুঁজে নিয়েছে। কানে পরেছে দুল। তাদের অর্ধেকের কাছে বন্দুক আছে। ওগুলো দেখে মনে হচ্ছে রাজা তৃতীয় জর্জের আমলের বন্দুক। কোনো কোনো বন্দুক দেখে মনে হচ্ছে এগুলো মেরামত করে নতুন রঙ করা হয়েছে। দুতিনজনকে দেখা গেল কোমরে গয়ালের শিং ভরতি বারুদ রাখা। সেন্দুদের কাছে এরকম কায়দায় বারুদ রাখতে দেখেছিলাম। কেউ কেউ বাঁশের পাইপে ধূমপান করছিল। ওরকম একটা ধূমপানের চোঙ্গা ইসি আমাকে উপহার দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর কারবারিরা ফিরে এলো। তারা আমাকে জানাল যে রতন পুইয়া শুধু আমার সাথে দেখা করবে। তার পাড়ার নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার খাতিরে আমার অস্ত্রধারী সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে যাওয়া চলবে না। তাদের বাইরে রেখে যেতে হবে আমাকে।

আমি কোনো বিতর্কে গেলাম না এটা নিয়ে। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে আমি আমার লোকদের বললাম তারা যেখানে আছে, সেখান থেকে যেন এক পাও না নড়ে, আর ওই বাঁশের সেতুটার দিকে যেন খেয়াল রাখে। তারপর আমি ফজুল্লা এবং আমার পাহাড়ি বালক আদুপাকে সঙ্গে নিলাম, সে আমার দোভাষী হিসেবে কাজ করবে। তাদের নিয়ে আমি কারবারিদের অনুসরণ করে রতন পুইয়ার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

আমার সামনে যে লুসাই গ্রামটা দেখতে পাচ্ছি ওটা পাহাড়ের পাশে নানান উচ্চতায় ছড়ানো ছিটানো কিছু বাড়ির সমষ্টি। গ্রামের চারদিকে হাতির পায়ের সমান মোটা এবং দশ ফুট উঁচু গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরাও করা। গ্রামে প্রবেশ করার যে গলিপথ সেদিকে মজবুত চোখা বাঁশের তৈরি দেওয়াল। তার

মাঝখানে মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি দুটো দরজা যেটা ভেদ করা বন্দুকের গুলির পক্ষেও অসাধ্য। আমরা ওটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একদল লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে আছে যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করার জন্য। লুসাইরা এমনিতে ধূর্ত একটা জাতি, তারা যে কোনো সময় বিগড়ে যেতে অভ্যস্ত।

গ্রামটা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তৈরি হয়নি। প্রত্যেকে তাদের ইচ্ছামতো পছন্দের জায়গা বেছে নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছে। তবে গ্রামের মধ্যে একটা প্রধান রাস্তা আছে যেটা দিয়ে আমরা লুসাই কারবারিদের অনুসরণ করে হেঁটে যাচ্ছি গ্রামের কেন্দ্রে অবস্থিত উঁচু একটা বাড়ির দিকে। তারা জানালো ওটা না কি গ্রামের অতিথিশালা। আমাকে ওখানেই থাকতে হবে। তার সামনেই রতন পুইয়ার বিশাল বাড়ি। চার ফুট উঁচু মাচার ওপর তৈরি করা প্রায় দেড়শ ফুট প্রশস্ত বাড়িটা। বুনো তালপাতা দিয়ে বাড়িটার ছাউনি করা হয়েছে। বাড়ির প্রবেশপথে মাথার ওপরে দীর্ঘ সারিতে মহিষ, শূকর এবং হরিণের মাথার খুলি ঝোলানো আছে।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে আমি উদ্বেগের সাথে লক্ষ করে দেখছিলাম ওই খুলিগুলোর মধ্যে মানুষের মাথা আছে কি না। কারণ এখানে আসার আগে শুনেছিলাম বছরখানেক আগে যে পুলিশগুলোকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের মাথার খুলি গ্রামের মাতব্বরের বাড়ির প্রবেশপথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এখন আমার স্বস্তি লাগছে দেখে যে ওই খুলিগুলি আমার আগমনসংবাদ পেয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এটা আমার জন্য একটা সুসংবাদ।

আরেকটা আশার কথা হলো এই গ্রামের নারী ও শিশু সবাই দলবেঁধে অদ্ভুত এক শ্বেতাঙ্গকে দেখার জন্য এসেছে। আমি জানতাম যে এখানকার লোকেরা বিপদের আশঙ্কা করলে তাদের নারী ও শিশুদের আড়ালে সরিয়ে দেয়। তাদের নারীদের পায়ের গোছা বেশ মজবুত এবং তারা দেখতেও খারাপ না। তারা কোমরে স্কার্টের মতো নীল রঙের একটা কাপড় পেঁচিয়ে পরেছে, আরেক ফালি কাপড় দিয়ে উপরের অংশ ঢেকেছে। সবই ঘরে তৈরি হস্তনির্মিত কাপড়। দশ বছরের নিচে কোনো বাচ্চার পরনে এক চিলতে কাপড়ও নেই অবশ্য।

আমাকে অতিথিশালায় প্রবেশ করার সিঁড়ি দেখিয়ে দেওয়া হলো। উঠে দেখি চারদিকে বাঁশের বেড়ার তৈরি একটা ঘর। বেশ উঁচুতে তৈরি ঘরটায় ওঠার জন্য একটা কাঠের গুঁড়িতে খাঁজ কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে।

আমি জানতে চাইলাম আমার সাথে দেখা করার জন্য মোড়লের কখন সুবিধা হবে? বলা হলো এখনো সময় আসেনি। রতন পুইয়া প্রতিবেশী গ্রামের বেশ কয়েকজন মোড়লকে খবর দিয়েছে, তারা আসার পর দেখা করবে। তবে আমাকে পরিবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে পরের দিনই। এই খবর

আমাকে দিয়েছে সেই কারবারিটা, যাকে রাখা হয়েছে এখানে আমার দেখভাল করার জন্য। সে আমাকে নানান মজার মজার কথা বলে আনন্দ জোগায়।

সন্ধ্যার মুখে আমাদের জন্য কিছু খাবার এলো মোড়লের বাড়ি থেকে। ভাতের সাথে সেদ্ধ শূকরের মাংস আর ক্যাপসিকাম মেশানো একটা বর্বর পদ্ধতিতে রান্না করা খাবার। কিছু চাল আর কাঁচা তরকারি পাঠানো হলো বাইরে থাকা আমার লোকদের জন্য। আমি ফজুল্লাকে বাইরে পাঠিয়ে দেখে আসতে বললাম ওরা ঠিকঠাক আছে কি না। সেন্ট্রিরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে কি না।

ঘরের মধ্যে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল এখানকার সব কিশোর আর তরুণদের অতিমাত্রার কৌতূহল দেখে। তারা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে যেন চিড়িয়াখানার জন্তু দেখছে। ব্যাপারটা মোটেও সুখকর নয়। অবশেষে অন্ধকার নেমে আসার পর নিস্তার পাওয়া গেল। আমি কোনোরকম অনাহূত আক্রমণ ঠেকাতে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে চাই। তাই স্থির হলো মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থেকে পাহারা দেব আমি। মাঝরাতের পর ফজুল্লা আর আদুপা পাহারার দায়িত্ব নিলে আমি শুতে যাব। আমি ঘুমানোর জন্য একটা নরম তুলোর বিছানা এনেছিলাম, ওটার ওপর শুয়ে একটা চাদরে নিজেকে মুড়িয়ে আমার ছোরা আর পিস্তলটা মাথার নিচে রেখে কাত হলাম। শুয়ে শুয়ে আগামী দিনের কর্মপন্থা নিয়ে ভাবছিলাম।

রাতের প্রথম ভাগে নিকটস্থ মোড়লের বাড়ি থেকে ধীরলয়ে একঘেয়ে ড্রামের শব্দ ভেসে আসছিল। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধতার চাদরে ঢেকে গেল। মোড়লের বাড়ির সামনে পাহারায় থাকা দুতিনজন লুসাই ধূমপান করছিল। আর কোথাও কেউ জেগে নেই। এই জায়গার অবস্থান অতি চমৎকার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অন্তত দুই হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। আমার চেনা জগৎ থেকে সবকিছুই আলাদা এখানে। আবহাওয়া, চারপাশের দৃশ্যাবলি, শব্দ, গন্ধ, সবই আলাদা।

ফজুল্লারও ঘুম আসছিল না। সে আমার কাছে এসে গল্প করতে শুরু করল। সে বলল, খুনে চেহারার এই লুসাইগুলো বদের হাড্ডি। আমাদের উচিত ছিল অন্তত পঞ্চাশজনের একটা বাহিনী নিয়ে এসে গ্রামটা পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া। তারপর আমাদের আলাপ মোড় নিল সেন্দু অভিযানের বিষয়ে। সেখান থেকে ঘুরে ফজুতার অতীতের দিকে চলে গেল আলাপ। ফজুল্লা যখন তরুণ ছিল তখন কাশ্মীরের মহারাজার সৈনিক হিসেবে কাজ করেছিল।

আমি বর্তমান নিয়ে চিন্তিত ছিলাম বলে অতীতের এসব কথা আমাকে টানছিল না। ফজুল্লা তখন লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত এগারোটার দিকে পা টিপে টিপে এক কারবারি এসে উকি দিল আমাদের ঘরের মধ্যে। আমার সাথে চোখাচোখি হতে একটা ফিচেল হাসি দিয়ে চলে গেল। বোধহয় দেখতে এসেছে আমরা কোনো বদকর্মে লিপ্ত আছি কি না।

মাঝরাতে আমি ফজুল্লাকে জাগিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। চোখে যেই ঘুমটা ধরে এসেছে অমনি অদ্ভুত কিছু শব্দ শুনে জেগে উঠলাম। ষাঁড়ের ডাক এবং রেলের হুইসেলের মাঝামাঝি ধরনের বিচিত্র একটা আওয়াজ।

কী ওটা?

ফজুল্লা আর আমি তড়াক করে উঠে আমাদের অস্ত্রপাতি হাতড়াচ্ছি অন্ধকারে। আদুপা তখন আমাদের আশ্বস্ত করে জানাল- ‘ওটা গয়ালের ডাক সাহেব। ওই দেখুন ভোরের আলো ফুটছে, গ্রামের লোকেরা গয়ালগুলোকে ঘাস খাবার জন্য বাইরে ছেড়ে দিচ্ছে।

এই গয়াল ভারি সুন্দর একটা জন্তু। তাদের সম্মুখভাগ প্রশস্ত, দুপাশে ছড়ানো ধারালো দুটো শিং। শান্ত সুন্দর দুটো চোখ। পাহাড়ের আদিম পশু। তাদের মতোই আরেক আদিম বন্য লুসাইরা তাদের বাড়িতে পোষে। তারা সারাদিন জঙ্গলে চরে-টরে ঘাস লতাপাতা খায়। সন্ধ্যার সময় তারা মালিকের ঘরে ফিরে আসে। ফেরার পর তাদের লবণ খেতে দেওয়া হয়। লবণ তাদের বিশেষ প্রিয়। লুসাইরা গয়ালের দুধ খায় না। ওটা তাদের কাছে একটা অপরিষ্কার জিনিস। তবে তারা মাঝে মাঝে উৎসব পালা পরবে গয়াল জবাই করে মাংসের জন্য। গয়ালের মাংস তাদের বিশেষ প্রিয় খাবার।

সূর্যোদয়ের খানিক পর সেই কারবারি আর দুতিনজন লুসাই এসে জানাল রতন পুইয়া আমার সাথে দেখা করার জন্য প্রস্তুত। আমি তাদের সাথে গিয়ে একটা নিচু কালো দরজার মধ্য দিয়ে রতন পুইয়ার ঘরে প্রবেশ করলাম। ভেতরে দেখলাম একটা নিচু দীর্ঘাকৃতি ঘর। যদিও তখনো ভোরের আমেজ কাটেনি, তবু সেখানে ভিড় করে আছে প্রচুর লুসাই। তারা বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে। বসে ধূমপান করছে। ঘরের মাঝখানে অনেক মাটির পাত্রে পাহাড়ি মদ রাখা। কেউ কেউ সেখান থেকে পাইপ দিয়ে চুমুক দিয়ে মদ খাচ্ছে।

আমি যখন ভিড়ের মাঝখান দিয়ে ঘরের অন্যপ্রান্তে যাচ্ছিলাম, তখন। ছেড়ে দিচ্ছিল না কিংবা সৌজন্য দেখাচ্ছিল না। দেখলাম ঘরের শেষপ্রান্তে একটা জানালার পাশে রতন পুইয়া আর অন্য মোড়লেরা বসে আছে। জানালা দিয়ে বাইরে দূরের পাহাড় দেখা যাচ্ছিল।

আমি খুব কৌতূহলের সাথে লুসাই চিফ রতন পুইয়ার দিকে তাকালাম। চিফ একই রকম কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকাল। তিনি ছোটখাটো আকৃতির কৃষ্ণবর্ণের শক্তসমর্থ দেহের মানুষ। তার চোখ দুটো বড় বড় এবং বেশ সপ্রতিভ। তিনি পদমর্যাদা অনুযায়ী কোনো অলংকার পরেননি। শুধু তার পরনের জামাটা অন্যদের চেয়ে দামি এবং সুন্দর। আমার আগমনে রতন পুইয়া কিংবা তার সঙ্গী মোড়লেরা কেউ কোনো সৌজন্য কিংবা কোনো রকমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করল না। সবাই গোমড়া মুখে বসে আছে।

সাথে আসা কারবারিরা আমাকে বসার জায়গা দেখিয়ে দিল। আমি দুই সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে বসে পড়লাম। সব চুপচাপ। আমাদের দুপাশে বসে থাকা

মোড়লেরা একেকজন বাদামি রঙের ভাস্কর্যের মতো স্থবির হয়ে বসে আছে নিজ নিজ আসনে। কারো মুখে কোনো অভিব্যক্তির চিহ্নমাত্র নেই। এই বর্বরদের অভদ্রতা দেখে আমার খুব রাগ হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। কিন্তু এতটা পথ এসে মেজাজ হারালে সব ভেস্তে যাবে, তাই আমি নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রেখে চুপচাপ বসে থাকলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর রতন পুইয়ার মুখ থেকে একটা ঘোঁত ঘোঁত ধরনের আওয়াজ নির্গত হলো। ওটা কী কোনো শব্দ না কি বাক্য আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার পাশে বসা কারবারি সেই ঘোঁতঘোঁতানির ব্যাখ্যা দিল। এর মানে হলো চিফ জানতে চান, আমি কেন এরকম একটা অবাঞ্ছিত এবং সশস্ত্র দল নিয়ে তার গ্রামে উপস্থিত হয়েছি।

আমি তার মাধ্যমে চিফকে জানালাম যে আমার মনে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। আমার লোকেরা পথের আপদ-বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য অস্ত্র বহন করেছে। এই যে এখন রতন পুইয়ার গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছি, এখানে আমার কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। আমি চিফকে অনুরোধ করলাম আমার সাথে যে উপহারের বস্তা এনেছি সেগুলো খুলে বিতরণ করার জন্য।

বস্তা খুলে আমার বয়ে আনা বিভিন্ন বস্ত্রসামগ্রী, মালা, আয়না ইত্যাদি মোড়লের লোকেরা ভাগ করে নিয়ে নিল। কিন্তু রতন পুইয়া আর তার সঙ্গী মোড়লেরা তখনো পাথরের মূর্তির মতো থম ধরে বসেই রইল।

অতএব আমি একাই কথা বলতে লাগলাম- ‘আমি শুনে আনন্দিত হয়েছি যে সম্প্রতি দক্ষিণ দিকে যে খুনোখুনির ঘটনা ঘটেছে তার সাথে রতন পুইয়া যুক্ত ছিলেন না। সে খবর শুনে আমি এখানে ছুটে এসেছি তার সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা নিশ্চিত করার জন্য।’

তারপরও কোনো জবাব নাই। শুধু কড়া মদ ভরতি কয়েকটা পেতলের পাত্র হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। আমি বললাম - ‘এখন কথা হলো অদূর ভবিষ্যতেও যেন সেরকম কোনো ঘটনা না ঘটে সেটা ঠেকানো আমাদের সবার দায়িত্ব। যদি ঠেকানো সম্ভব না হয় তা হলে আমরা জানি কীভাবে শত্রুকে শায়েস্তা করতে হয়। রতন পুইয়া জানে আমি যেটা বলছি সেটা সত্যি।’

এই কথাটার মধ্যে রতন পুইয়ার জন্য একটা পার্শ্ব ইঙ্গিত ছিল। কারণ আমার পূর্ববর্তী ক্যাপ্টেন এম. রতন পুইয়াকে বেশ কঠিন একটা ধাক্কা দিয়েছিল। এই কথা শোনার পর রতন পুইয়া একটু নড়েচড়ে বসল। হাতের গেলাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে তার পাশে বসা দোভাষীকে কী একটা যেন বলল। আমি তার কথার মধ্যে একটু দুর্বলতার লক্ষণ দেখতে পেলাম। হয়তো এভাবে কথা বলা তার অভ্যেস, অথবা সে নার্ভাস বোধ করছে। কোনটা সত্যি আমি নিশ্চিত নই। তবে আমার মনে হলো তাকে কিছুটা হলেও নার্ভাস করতে পেরেছি।

দোভাষী বলল, ‘মোড়ল বলছেন ক্যাপ্টেন এম. একজন জাদুকর ছিলেন। এটা কি সত্যি যে তার কাছে গুলি এবং লোহা সবকিছু ঠেকানোর বিদ্যা ছিল?

আমি যেন এটাই শুনতে চাইছিলাম। এবার আমি সন্তুষ্টির সাথে বললাম, ‘সত্যি বলতে সব সাহেবই ওরকম শক্তি ধারণ করে। সরকারের পক্ষ থেকে ওরকম শক্তিসম্পন্ন সাহেবদেরই পার্বত্য অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদি আপনার কাছে একটা বন্দুক থাকে আমি সহজেই সেটা প্রমাণ করে দিতে পারি।’

রতন পুইয়ার ইঙ্গিতে একটা বন্দুক আনা হলো। মোড়লেরা নিচু গলায় ফিসফাস করতে লাগল। যারা মদ পান করছিল, তারা পাত্রটা রেখে সোজা হয়ে বসলো। ঘরের বাইরে অসংখ্য দর্শনার্থীর মাথা দেখা গেল।

আমি বললাম, ‘এখন বন্দুকটার মধ্যে বারুদ ঢেলে গুলি করার জন্য তৈরি করো। কারবারি সাবধানে বারুদ ভরে নিল।

বললাম, ‘এখন একটা বুলেট লাগবে।

দাও।’ সে বুলেট ভরতে যাচ্ছিল। আমি তাকে বললাম, ‘দাঁড়াও। আমাকে বুলেটটা দেখতে বুলেটটা আমার হাতে দেওয়া হলো। বললাম, ‘আমাকে একটা ছুরি দাও। এক মোড়ল আমাকে একটা ছুরি এগিয়ে দিল। আমি ছুরিটা নিয়ে বুলেটের মধ্যে একটা ক্রস আঁকলাম।

তারপর বললাম— ‘আপনারা সবাই এই চিহ্ন দেওয়া বুলেটটা আবার দেখলে চিনতে পারবেন তো?’

সবাই গুঞ্জন করে উঠল। তারপর বলল, হ্যাঁ চিনতে পারবে।

“তা হলে দেখেন। আমি বুলেটটা নিয়ে বন্দুকে ভরে দিলাম। এখন বন্দুকটা করার জন্য প্রস্তুত।’

ওটা ছিল একটা ফ্লিন্ট-লক মাস্কেট বন্দুক। কারবারি সাবধানে বন্দুকটা হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলো। রতন পুইয়া উঠে বন্দুকটা ভালোমতন পরীক্ষা করে দেখল গুলিটা জায়গামতো ভরা হয়েছে কি না।

আমি কারবারিকে বললাম, ‘এখন আমার বুক বরাবর গুলি চালাও।’ কারবারি দ্বিধা করছিল গুলি করতে। তখন রতন পুইয়া বলল, ‘সাহেব যেটা বলেছে, সেটা করো।’

গুলি করার আগে আমি দুই হাত দিয়ে আমার চোখ আর মুখ ঢেকে ফেললাম। তারপর কারবারি দশগজ দূর থেকে আমার বুক লক্ষ্য করে গুলি করল।

আমি মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলাম যেন গুলির আঘাত এসে লেগেছে বুকের মধ্যে তারপর মুখে হাত দিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ক্রস দেওয়া বুলেটটা বের করলাম। রতন পুইয়ার হাতে বুলেটটা তুলে দিতে দিতে শান্ত কণ্ঠে বললাম, ‘দেখেন তো এই গুলিটাই আপনারা তখন দেখেছিলেন কি না?’

গভীর বিস্ময়ে সবাই গুঞ্জন করে উঠল। মোড়লেরা সবাই উঠে দাঁড়ালো। বুলেটটা সবার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সবার মুখ থেকে বিস্ময় ধ্বনি বের হতে লাগল। ওটা সত্যি সেই দাগ দেওয়া বুলেট।

আমরা আবার বসে পড়লাম। লুসাইদের মধ্যে এবার কথার খৈ ফুটলো। তাদের মধ্যেকার স্থবিরতা দূর হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে বিশালদেহী একজন, তার নাম বোধহয় ভানলুলা, সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা বক্তৃতা দিল।

বাকি ঘটনা বিস্তারিত বলার দরকার দেখছি না, আমার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। সেই মুহূর্ত থেকেই রতন পুইয়া আর তার দলবলের সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। আমার সম্মানে একটা গয়াল জবাই করে উৎসব আয়োজন করা হলো। ব্যাপক খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। সেদিন বিকেল চারটার দিকে আমরা নৌকায় উঠে আমাদের ফিরতি পথ ধরলাম।

২৪. আবারো চাটগাঁ শহরে

আমি যতদূর জানি একজন দক্ষ জাদুকর কখনো নার্ভাস হয় না। অথবা যে কোনো মূল্যে অবিচলিত থাকা তাদের পেশাগত কাজের অংশ। কিন্তু ফেরার পথে নৌকার মধ্যে ওয়ে শুয়ে আমি ভাবতে ভাবতে শিহরিত হচ্ছিলাম যে লুসাইদের গ্রামে বন্দুকের মধ্যে আসল বুলেটের জায়গায় মোমের তৈরি নকল বুলেট প্রবেশ করাতে গিয়ে আমি রীতিমতো কেঁপে উঠেছিলাম। প্রফেসর হাউডিংয়ের পদ্ধতি মোতাবেক আমি ওই বুলেটটা তৈরি করেছিলাম যাত্রা শুরুর আগেই। মোমের তৈরি গুলিটা যখন ছোড়া হয়েছিল, তখনই ওটা বন্দুকের ভেতর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। আসল বুলেটটা আমার বুড়ো আঙুলের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিলাম। যখন কারবারি আমাকে গুলি করছিল, তখন আমি দুহাত দিয়ে আমার চোখমুখ ঢেকে রেখেছিলাম যেন মোমের গুঁড়ো এসে চোখে না পড়ে। একই সময়ে আমি হাতের ফাঁক থেকে গুলিটা মুখের ভেতর চালান করে দিয়েছিলাম। যেটা বিস্ফোরণের পর আমি মুখের ভেতর থেকে বের করে এনেছিলাম।

আমরা নদীপথে সোজা চন্দ্রঘোনা চলে গেলাম। সেখানে এক রাত কাটিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছালাম ২৪ অক্টোবর ১৮৬৬। কমিশনারের কাছে আমার অভিযানের বিবরণ জমা দিলাম। কমিশনার আমার অভিযান সম্পর্কে খুব মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন। তবে অফিসিয়ালি এই রিপোর্ট প্রকাশ করতে বারণ করলেন। কারণ সরকার হয়তো এ ধরনের অভিযানের অনুমোদন দেবে না। বিশেষ করে আমি যে লুসাই চিফের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছি, এসব ব্যাপার সরকার ভালো চোখে দেখে না। এরকম বিষয় কড়াকড়িভাবে সেন্সর করে।

অতএব আমি ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু বললাম না। তবে মনে মনে ঠিক করলাম রতন পুইয়ার সাথে বিশ্বস্ততার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখব। তার গোত্রকে আমি যথাসাধ্য সহযোগিতা করব তাদের বর্বর প্রতিবেশী গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে। আমাকে এটাও স্বীকার করতে হবে যে রতন পুইয়া এবং তার দল পরবর্তীকালে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। যতদিন পর্যন্ত আমি ওই এলাকার দায়িত্বে ছিলাম ততদিন তারা আমার পাশে ছিল।

আমি এক পক্ষকালের মতো আমার বন্ধু কমিশনারের বাড়িতে থাকলাম। এক হলো মুক্ত বাতাস সেবনের জন্য, দ্বিতীয় কারণ হলো পার্বত্য এলাকায় যেসব সংস্কার কাজ করতে চাই সেসব নিয়ে আলাপ করার জন্য।

মং রাজা কিছুকাল আগে আমাকে একটি উপহার দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গী আদুপা একসময় ক্রীতদাস ছিল। কেউ একজন ঋণের জামানতস্বরূপ শৈশবকালে ছেলেটাকে রাজার কাছে বন্ধক রেখেছিল। অবশ্য আমার কাছে যখন সে আসে তখন সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তার এই দাসত্ব মুক্তির ব্যাপারটা আমার কাছে কৌতূহলের ব্যাপার ছিল। আমি যতদূর দেখেছি মধ্যএশিয়ার গোত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র এই পার্বত্য অঞ্চলেই দাসপ্রথা এখনো বহাল আছে।

এখানে কেউ যদি কারো কাছ থেকে টাকা পয়সা ধার করতে চায় তা হলে তার পুত্র বা কন্যাকে জামানত হিসেবে দিয়ে দিতে হয়। তাদের দিয়ে যে কাজ করানো হবে সেটা ঋণের সুদ। ছেলেমেয়েকে ফেরত নিতে হলে আসল টাকার পুরোটাই শোধ করতে হবে।

আমি জানি এসব ঋণের দাসত্ব আইন মেনে বেশ ভালোভাবে চালু আছে এখানে এই রীতিটা অনেক প্রাচীন এবং সার্বজনীন, যেটাকে বেশ যত্ন করে মেনে চলা হয়।

পার্বত্যবাসীদের একটা প্রবাদ আছে- ‘চামড়ার নিচে একটা কাঁটা ফুটে থাকলে যেমন কষ্ট, পরিবারের কোনো সদস্য দাসত্বের জালে আটকা পড়লেও তেমন কষ্ট।’

আমার আগে যে সাহেব এখানে দায়িত্বে ছিলেন, তিনি পাহাড়িদের এই রীতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। যখনই এরকম কোনো ঘটনা তার কানে আসত তখন তিনি সেই ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এতে ঋণগ্রহীতার লাভ হলেও ঋণদাতার মাথায় হাত।

ওরা সাহেবকে বোঝানোর চেষ্টা করত এটা দুজনের সম্মতিতে হয়েছে, এখানে কেউ জোরাজুরি করেনি। কিন্তু সাহেব সেসব কথায় কান দিতেন না। তিনি সোজা বলে দিতেন—ইংরেজ রাজত্বে কোনো দাসত্বের রীতি চলবে না। ঋণ আদায় করার জন্য আদালতে যাও। পাওনাদারেরা আদালতে যাওয়ার চেয়ে ঋণের আশাবাদ দেওয়া শ্রেয় ভাবতো।

সেই সময় আমাদের আইন আদালতের ওপর আস্থা ছিল না তাদের। সচ্ছল পার্বত্যবাসীরা বাড়ির চাকরবাকর সংগ্রহের ব্যাপারে এই পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল ছিল 1 কারণ বাড়ির কাজের লোক নিয়োগ দেওয়ার কোনো সাধারণ রীতি সেখানে চালু নেই। আমাকে মং রাজা জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের আইন-কানুনের কারণে তিনি খুব অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। আমার পূর্ববর্তী সাহেব তাঁর বাড়ির সব ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে কিছুকাল তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের বাড়ির সব কাজকর্ম করতে হয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে এই অঞ্চলটা এখনো বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। আমাদের আইনকানুনের ওপর যদি এখানকার লোকদের আস্থা গড়ে ওঠে, তা হলে তাদের পুরনো রীতিগুলো আপসেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সত্যি বলতে পুরো জেলার মধ্যে আমিই একমাত্র জুডিসিয়াল অফিসার। এখানকার আদালতের ভাষা বাংলা, যা অধিকাংশ পার্বত্যবাসীর কাছে অবোধ্য। ফলে দূর-দূরান্তের পাহাড়ের মধ্যে বাস করা হাজার হাজার পাহাড়ি জনগণের কাছে ইংরেজের আইন সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে পার্বত্য এলাকার আসল শাসক হলো এখানকার মোড়লেরা। তারা সবসময় সতর্ক থাকে তাদের ক্ষমতার ওপর কোনো আঘাত আসছে কি না সে ব্যাপারে। তারা ভাবত এখানে আমার কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখার দরকার নাই। আমি শুধু আলংকারিক শাসক হিসেবে এখানে থাকব। তবে আমার তাতে একমত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

এই অঞ্চলে আমার কাজকে ক্রমশ পছন্দ করতে শুরু করলাম। আমার মনে হতে লাগল আমি এই কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠেছি। ভাবতে ভালো লাগছিল যে পুলিশের কাজের বদলে আমি নিজের পছন্দমতো একটা কাজের সাথে যুক্ত হতে পেরেছি।

কিন্তু শিগগির অনুভব করলাম যে মানুষের জন্য ভালো কাজ করার শত ইচ্ছা থাকলেও চারদিকে এত শত্রু নিয়ে সেটা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। এখানে পুরনো কায়দায় যেসব বিষয় চলছিল তাতে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমি যেখানেই অসন্তোষজনক বিষয় পেতাম, সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে যেতাম এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেটার সমাধান হচ্ছে না ততক্ষণ বিশ্রাম নিতাম না।

দুর্ভাগ্য হলো যে এটা সবাইকে সন্তুষ্ট করত না। তবে সাধারণ মানুষের কথা আলাদা। তারা হলো ভেড়ার পালের মতো, সামনের জন যেদিকে গেছে সেও একই পথ ধরবে। যারা ভুল পথে যায় তারা তাদের অনুসরণ করে না। পুরনো প্রথার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রবল, পূর্বপুরুষের দেখানো পথ ধরেই তারা এগোতে পছন্দ করে। কেউ ভুল পথে গেলে তাকে তারা পছন্দ করে না। এই কারণে সরকারও তাদের ঘাঁটাতে চায় না। জল ঘোলা করলে সরকারেরই

ক্ষতি। সরকার শুধু চায় শান্তি। শান্তি বজায় থাকলে সরকারের আয় বৃদ্ধি হয়। এখানে কেউ আলগা মাতব্বরি দেখাতে গেলে কলকাতা সেটা সমর্থন করে না।

অতএব নানা ধরনের অভিযোগ আর পিটিশন জমা হতে লাগল আমার প্রশাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামের কমিশনার আমার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তিনি আমার ইউটোপিয়ান পরিকল্পনাকে সমর্থন করে গেছেন সবসময়। আমার শুধু ঝামেলা ছিল পিটিশনগুলোর জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে। যেখানে তাদের অভিযোগের কোনো ভিত্তি ছিল না। পরিস্থিতিটা ভালো করে বোঝাবার স্বার্থে আমি এখানে সংক্ষেপে সেই সময়কার পার্বত্য এলাকার বাস্তবতা সম্পর্কে সামান্য কিছু বলছি।

প্রথমত, স্বাধীন বেয়াড়া পার্বত্য গোত্রসমূহ যেমন লুসাই, সেন্দু এবং অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। তাদের সাথে আমাদের সরাসরি কোনো লেনদেন ছিল না। কিছুদিন পরপর তারা যেসব ঝটিকা আক্রমণ করে আমাদের এলাকার লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাসত্বে নিয়োজিত করে কিংবা মুক্তিপণ আদায় করে সেগুলো ঠেকানো কিংবা তাদের শাস্তি দেওয়ার উপায় ছিল না আমাদের।

পার্বত্য এলাকাজুড়ে পুলিশ পোস্ট বাড়াতে হবে এবং শক্তি প্রয়োগ করে দমন করতে হবে এসব দুষ্ট লোকদের। এছাড়া যদি সম্ভব হয় তাদের গোত্রপতিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। যার একটি নজির আমি সৃষ্টি করেছি সম্প্রতি। আমি নিশ্চিত জানি আমাদের সরকার আগে বা পরে এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান চালাবেই। এদের দমন করার জন্য ‘প্রথমে শক্ত পিটুনি, তারপর মিষ্টি কথা* পদ্ধতি হলো সর্বোত্তম।

তারপর আরেক সমস্যা হলো আমাদের অনুগত গোত্রগুলোর প্রধানদের নিয়ে। ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের গোত্রপ্রধান বা রাজাদের স্ট্যাটাস কীরকম হবে সেটা নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তরে মং রাজা, মধ্যভাগে কালিন্দী রানি, দক্ষিণভাগে বোমাং রাজার এলাকা। এই তিন গোত্রপতি পুরো পার্বত্য এলাকা শাসন করে। তাদের কাছেই সকল ক্ষমতা। এই এলাকার সব ধরনের তথ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য তারা বাইরে থেকে প্রয়োগ করা যে কোনো শাসনের বিরোধিতা করে। সেটা সরকারের পক্ষে নিয়োজিত প্রশাসক হলেও।

আমি যদি সামান্যতম কর্তৃত্বও ফলাতে চাই, আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমার ক্ষমতা তাদের চেয়ে বেশি। এই অঞ্চলে প্রচ্ছন্ন পোশাকি ক্ষমতা তো তাদের হাতে আছেই। তার সাথে যুক্ত আছে গোত্রপ্রধান হিসেবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ক্ষমতা। রাজাদের মূল আয়ের উৎস হলো ব্যক্তি কর। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি রাজাকে কর দিতে বাধ্য। এমনিতে তাদের কাছে এই কর দেওয়া অপছন্দের বিষয়, এখন তার সাথে সরকারকে খাজনা দেওয়ার

ব্যাপারটা যুক্ত হয়ে আরো বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় রীতিনীতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের অজ্ঞতা ব্যাপারটাকে বাড়িয়ে জটিল করে তুলেছে।

এই তিন পার্বত্য রাজা তাদের প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে সেখান থেকে কিছু পরিমাণ অর্থ সরকারের কাছে জমা দেয়। এই খাজনা আদায়ের জন্য তারা গ্রামে গ্রামে কিছু লোক নিয়োগ করেছে, যারা সাধারণ প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রাজার কাছে পৌঁছে দেয়। ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট রাজস্ব আদায়ের এই পন্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলে এক ধরনের ভূমি দাসত্ব চালু হয়েছে। কেউ যদি ঠিকমতো খাজনা আদায় না করে, তাকে হেনস্থা করা হয়, শাস্তি দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিতে আমি যদি বিদ্যমান আইনের কোনো পরিবর্তন করার চেষ্টা করি, তা হলে আমার শত্রুসংখ্যাই বৃদ্ধি হবে কেবল। কারণ এরকম আইন অনেকের স্বার্থে আঘাত করবে। যদিও আমি জানি বিদ্যমান সিস্টেমটা ভুল। এই পদ্ধতির বদলে মানুষের যাতে কল্যাণ হয়, সেভাবে আইনের কিছু সংশোধনী আনা প্রয়োজন।

কমিশনারের সাথে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য আমাকে কলকাতা গিয়ে সরকারের সাথে দেন দরবার করতে হবে। পুরো বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে খুলে বলতে হবে। তাতেই যদি ভূমি রাজস্ব আইনের কোনো পরিবর্তন আনা যায়।

অতঃপর আমি কলকাতায় গিয়ে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছে বিষয়টা উপস্থাপন করলাম। আমার প্রস্তাবের সপক্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব রকমের যুক্তি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নতুন আইন পাস করার জন্য প্রস্তাব পেশ করলাম। এ ধরনের আইন বাস্তবায়ন করার জন্য কিছু বাড়তি খরচপাতি লাগলেও তাতে মানুষের যেমন উপকার হবে, পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়েরও উন্নতি হবে।

আমি যখন কলকাতা ছিলাম তখন আমার বন্ধু জনের বাড়িতে উঠেছিলাম। যার তরুণী স্ত্রীকে অত্যন্ত সুখী মনে হয়েছিল দেখে। আমি তার সুখী বিবাহিত জীবন দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম, কারণ বন্ধুটা বিয়েশাদির ব্যাপারে সবসময় খুঁতখুঁতে এবং ছিদ্রান্বেষী মনোভাবের ছিল। আমরা বেশ আনন্দে কয়েকটা দিন একসাথে কাটিয়েছিলাম সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার স্মৃতি রোমন্থন করে।

আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম, তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে তার সামনে কত বড় একটা বিপদ অপেক্ষা করছিল।‘

পার্বত্য জীবনের মুগ্ধতা বনাম তিক্ততা

২৫. প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে ফেলা

১৮৬৭ সালের শুরুতে একটা বড় ধাক্কা এসে আমার জীবনকে প্রচণ্ড রকমের ঝাঁকুনি দিল। আমার প্রিয় বন্ধু জনকে হারিয়ে ফেললাম আমি। এটা আমার জন্য এত বেশি বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল যে সারাজীবন ধরে আমি একটা দাগ বয়ে বেরিয়েছি বুকের ভেতর যেটা কখনোই মুছে যায়নি।

তখন আমি সদ্য কলকাতা ভ্রমণ সেরে পাহাড়ে ফিরেছি মাত্র। হঠাৎ করে আমার হেডকোয়ার্টার্স থেকে শত মাইল দূরে বোমাং রাজার এলাকায় লুসাইদের বড়সড় একটা অভিযানের খবর কানে এসে পৌঁছালো। আমার সমস্ত মনোযোগ এবং কর্মযজ্ঞ সেদিকে নিবদ্ধ করতে হলো। ওরা দুটো গ্রাম আক্রমণ করে ১১ জনকে হত্যা করেছে এবং ৩৫ জনকে দাস হিসেবে বন্দি করে নিয়ে গেছে। শত্রুরা সেই আগের মতোই ঝটিকা আক্রমণ করে পালিয়ে গেছে—যেভাবে শেয়ালের দল মুরগির ওপর আক্রমণ করে। আমার কাছে খবর পৌঁছানোর আগেই তারা উধাও হয়ে গেছে অকুস্থল থেকে। আমার কাছে এটার কোনো প্রতিকার ছিল না। আমার অত লোকবলও নেই, সেই কর্তৃত্বও রাখি না। আমি শুধু ওই এলাকায় একটু মজবুত পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করলাম যাতে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ওখান থেকে চন্দ্রঘোনায় ফেরার পর শুনলাম আমার অনুপস্থিতিতে মেজর রবার্ট নামের এক ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল আমার অফিস পরিদর্শনে এসেছিলেন—যিনি সম্প্রতি আমার কাজকর্ম তদারক করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি পরিদর্শন শেষ করে আমার কাজের ওপর রিপোর্ট দেবেন সদর দফতরে। এই অফিসার চন্দ্রঘোনায় আমার বাড়িতে থেকে তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল করে চট্টগ্রামে ফিরে গেছেন আমি ফেরার আগেই।

ভদ্রলোকের নামটা শুনে আমি হাসলাম। আমি আর জন সবসময় এই রবার্ট সাহেবের কিছু অদ্ভুত আচরণ নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুক করতাম। তার একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম, সেটা নিয়েই মজা হতো। কিন্তু আমার কাছে মনে হলো মেজর রবার্টের এই আকস্মিক সফরটা একটু অস্বাভাবিক। কারণ এ ধরনের পরিদর্শনে আসার আগে সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাকে আগাম নোটিস দিতে হয়। ইনি সেটা করেননি।

তবে যাই হোক, আমার ভয় পাওয়ার কিংবা লুকিয়ে রাখার কোনো বিষয় নেই বলে ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দিলাম না। কিন্তু যদি জানতাম মেজর রবার্ট আসার আগে আমার বন্ধুজন আমাকে একটি চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছিল, তা হলে আমি ব্যাপারটা হালকাভাবে নিতাম না। কিন্তু চিঠির কথা আমি যখন

জেনেছি তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। চিঠিটা যখন চন্দ্রঘোনায় আসে তখন আমি দূরের পাহাড়ে দুষ্কৃতকারীদের দমনে ব্যস্ত ছিলাম। জন আমাকে সতর্ক করে লিখেছিল যে মেজর রবার্ট আমার অফিস পরিদর্শনে যাচ্ছে বদ মতলবে। আমার কর্মকাণ্ড নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করাই তার উদ্দেশ্য।

আমার অনুপস্থিতিতে মেজর রবার্ট চন্দ্রঘোনায় আমার অফিসে এসে জনের লেখা চিঠিটা পায় টেবিলের ওপর। তিনি আমার ব্যক্তিগত সেই চিঠি খুলে পড়েন এবং সেটা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ইন্সপেক্টর জেনারেলের বরাবরে পাঠিয়ে দেন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

আমি এসব বিষয়ে কিছুই জানতাম না। এমনকি সেরকম কোনো চিঠি যে আমার কাছে এসেছিল তাও জানা ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে ছোট্ট আরেকটা চিঠি আসে কয়েকদিন পর। সেই চিঠি পাঠিয়েছিল জন। চিঠিতে সে আমাকে আমার দায়িত্বহীনতার জন্য অভিযুক্ত করে এবং বলে যে আমার কারণে তার জীবনে সর্বনাশ নেমে এসেছে। আমার কাছ থেকে সজ্ঞানে চিরবিদায় গ্রহণ করে।

ঠিক পরের দিনই আমি কলকাতা থেকে একটা টেলিগ্রাম মারফত জানতে পারলাম জন আত্মহত্যা করেছে।

সংবাদটা আমাকে ভয়ানক একটা ধাক্কা দিল। এই অসম্ভব ব্যাপারটা চিন্তা করতে গেলে এখনো আমার মাথা ঘুরে যায়। কিভাবে কী ঘটল, কেন আমাকে দায়ী করা হলো, কোথা দিয়ে আমি ওর মর্মান্তিক পরিণতির সাথে যুক্ত হলাম কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

কয়েকদিন পর কলকাতা থেকে নিচের চিঠিটা আসার পর সবকিছু খোলাসা হলো আমার কাছে।

“ইন্সপেক্টর জেনারেল আমাকে বলেছেন আপনাকে মিস্টার জনের আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে কয়েকটা লাইন লিখে জানাতে।

আপনি সম্ভবত মি. জনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। ওই চিঠিতে আপনাকে বলা হয়েছে যে আপনার কাছে লেখা তাঁর একটা চিঠি ইন্সপেক্টর জেনারেলের হাতে পড়েছিল। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে মি. জনকে ইন্সপেক্টর জেনারেলের পারসোনাল এসিসট্যান্ট পদ থেকে বরখাস্ত করা হবে। তিনি সেটা শোনার পর তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিটা পাঠানোর পর থেকে তিনি তার বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। তার আগে তিনি যে ছুটির দরখাস্ত দিয়েছিলেন সেটাও প্রক্রিয়াধীন ছিল। গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় মিস্টার জন তাঁর স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে একটা বলনাচের অনুষ্ঠানে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি ঘণ্টাখানেক পড়াশোনা করে শুতে যান। রাত একটার দিকে মিসেস জন বলনাচের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে দেখেন তাঁর স্বামী কড়া ক্লোরোফর্মের ডোজ নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। পাশে পড়ে আছে একটা স্পঞ্জের ব্যাগ যেটা তিনি নিজের নাকেমুখে

চেপে ধরেছিলেন। মিসেস জনের আর্তনাদ শুনে সবাই ছুটে আসে। তারপর জনকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য নেওয়া হলো। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

তার কয়েকদিন আগ থেকে মিস্টার জন খুব হতাশ জীবনযাপন করছিলেন এবং ক্লোরোফর্মের ডোজ নিয়ে হতাশা দূর করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর অনুনয় এবং অনুরোধে তিনি আর ক্লোরোফর্ম নেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এখন ইন্সপেক্টর জেনারেল সেই চিঠিটা ফেরত দিয়েছেন। যে চিঠির কারণে জনকে মরতে হলো। তিনি জানিয়েছেন চিঠিটা নেহাত দুর্ঘটনাবশত তাঁর কাছে চলে গিয়েছিল।

কী ভয়ানক কথা! এটা একটা দুর্ঘটনা? সবকিছু জেনেও এটাকে স্রেফ দুর্ঘটনা বলে মেনে নেব? আমি তো ভালো করেই জানি বহুদিন ধরে মেজর রবার্ট আমাদের দুজনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ঘুরছিল। এবার সুযোগ পেয়ে মহানন্দে সেটা কাজে লাগিয়েছে। আমার মনটা আঘাতের তীব্রতায় আর তিক্ততায় এতই আহত হয়েছিল যে আমি বাড়িতে এসেও ভুলতে পারছিলাম না। আমি সমস্ত ব্যাপারটা কমান্ডার ইন চিফের কাছে তুলে ধরলাম। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কোর্ট মার্শাল করা গেল না। আর কখনোই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি। তবে তাকে যারা চিনতো সবাই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করেছিল মেজর রবার্টকে।

আমার বন্ধুর মৃত্যুর ঘটনা দিনরাত দুঃস্বপ্নের মতো আমাকে তাড়িয়ে বেরিয়েছে। ঘুমে জাগরণে সবসময় যন্ত্রণা দিয়ে গেছে। আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়েও কাজের মধ্যে ডুবে থেকে ভুলতে চেষ্টা করেছি। বারবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আমার পেটের অন্ত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ভাগ্যবশত চট্টগ্রামের কমিশনার মি. ওয়াই আমার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর নিজের বাড়িতে আমাকে রেখে সুস্থ করে তুলে আবারো কাজে ফিরে যেতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। পাহাড়ে ফিরে যাওয়ার পর আমার বেদনার ভার অনেকটা কমে গেল।

২৬. সরল পার্বত্যবাসীর মধ্যে গরল

পার্বত্যবাসীরা হলো খুব সহজ সরল দয়ালু এবং সত্যবাদী মানুষ। তারা নিজেদের মধ্যে চমৎকার একটা বন্ধনে আবদ্ধ। ন্যায়বিচারকে তারা সবসময় স্বাগত জানায়। আমি দেখেছি এই সহজ সরল মানুষগুলো অজ্ঞ এবং সংকীর্ণ মানসিকতার মোড়লের হাতে নিপীড়িত হয়, মিথ্যাবাদী বাঙালিদের হাতে প্রতারিত হয়। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয় লুসাই এবং সেন্দু আগ্রাসনে।

তাদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিন্তু অধিকাংশই এক ধরনের প্রকৃতির ধর্ম পালন করে। যারা পানি ও বায়ুবাহিত নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির মোকাবেলা করে। তাদের নিত্যদিনের জীবনে সাহায্য করার মতো কোনো গাইড কিংবা ব্যবস্থা নাই। তাদের জন্য স্কুল দরকার, ধর্মীয় শিক্ষা দরকার, দৈনন্দিন জীবনের সাদাসিধে প্রয়োজন মেটায় তেমন কিছু সাহায্য দরকার যাতে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন রক্ষা করতে পারে। এসব বিষয়ে আমি তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এটা করতে গিয়ে যে বাধাটা দেখতে পেলাম, সেটা উপেক্ষা করার মতো নয়।

প্রথমে বলতে হয় এই অঞ্চলে বংশানুক্রমে শাসন করে যাওয়া চিফগণ, যারা সরকারকে রাজস্ব দেয় কিন্তু তারা জনগণ আর আমাদের মধ্যে এক রকমের বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিজেদের ক্ষমতা খর্ব হয় তেমন কিছুর ব্যাপারে সবসময় খুৰ ঈর্ষান্বিত থাকে। আমি অল্প সময়েই বুঝতে পারলাম আমাকে হয় তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে নইলে তাদের পুরোপুরি বাদ দিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে। হয় বাঁশের লাঠি নয়তো আখের লাঠি যে কোনো একটা প্রয়োগ করতে হবে। মিষ্টি কথায় কাজ না হলে শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই। অথবা দুটোর মাধ্যমে আমাকে শাসন করতে হবে।

এদের মধ্যে বোমাং রাজা আমার জেলার দক্ষিণাংশের অর্ধেকটা শাসন করেন। তিনি ধর্মে বৌদ্ধ, ভাষায় বার্মিজ। তিনি নিজের ইচ্ছেমতো প্রজাদের শাসন করেন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি খুন-খারাবি করতেও পিছপা হন না। তিনি এত নিষ্ঠুরতার সাথে কাজ করেন যে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সাহস কারো নেই।

মাঝে মাঝে তার অত্যাচারের কিছু ঘটনা আমার কানে আসে। কিন্তু আমি যখন এসব জানার জন্য সাক্ষীসাবুদ তলব করি, তখন কাউকে পাওয়া যায় না। কেউ সাহস করে এগিয়ে আসে না। পরে আমি শুনতে পাই যে সবাইকে বলা আছে যদি কেউ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় তা হলে রাতারাতি তাকে সমূলে বিনাশ করা হবে। তারপর গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হবে যে লুসাই আক্রমণে সেই পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে।

এসব ঘটনার প্রতিকার করার জন্য আমার হাতে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ নেই, যারা অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পারবে কিংবা শাস্তি দিতে পারবে। আমার অধীনে যে কয়জন লোক আছে তারা সবাই সাধারণ সীমান্ত রক্ষী। সাধারণ বিষয়ে অনুসন্ধান করার যোগ্যতাও তাদের নেই।

প্রথমে আমি এই বেয়াড়া বোমাং রাজাকে বশ করার চেষ্টা চালালাম। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম। নানান বিষয়ে কথাবার্তা বললাম। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। আমি যখন তাঁর বাড়িতে যাওয়ার উদ্যোগ নিতাম তিনি সেটা এড়ানোর নানা কায়দা বের করতেন। আমাকে বিভিন্ন উপহারসামগ্রী পাঠাতেন। আমি সেটা প্রত্যাখ্যান করতাম সরকারের নিষেধাজ্ঞার কথা বলে। যখন তার

দেখা পেতাম তখন তিনি মুচকি হেসে আমার সব কথায় মাথা নেড়ে সায় দিতেন কিন্তু বাস্তবে কিছুই পালন করতেন না। যতটা সম্ভব লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করতেন। যদিও সারা দেশ তার শয়তানির কথা জানত কিন্তু কোনো বাস্তব প্রমাণ পাচ্ছিলাম না। অথচ তার বিরুদ্ধে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য আমাকে প্রমাণ পেতে হবে। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম একদিন এই বুড়ো শেয়ালকে আমি হাতেনাতে ধরব।

বান্দরবানের বোমাং রাজার বাড়ির কাছে আমার একটা ছোট্ট পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। ওই ফাঁড়িটা মূলত দক্ষিণাঞ্চলের সাথে হেডকোয়ার্টারের একটা যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল। ওই ফাঁড়িটা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি ফাঁড়ির কর্তাদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলাম বোমাং রাজার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাকে অবগত করার জন্য। কিন্তু দেখা গেল আমি রাজার সম্পর্কে কোনো তথ্য পেতাম না, উল্টো আমার সকল তথ্য রাজার কাছে পৌঁছে যেত অজ্ঞাত কোনো উপায়ে। আমি কখন কোথায় যাচ্ছি, কী করছি, সবকিছু রাজার কানে পৌঁছে যেত। এমনকি আমি কখন কোন পরিকল্পনা করছি, সেটা পর্যন্ত রাজা জেনে যেত।

পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি যে আমার পুলিশরাই ঘুষ খেয়ে আমার খবরাখবর রাজার কানে পৌঁছে দিত। শুধু তাই নয়, দক্ষিণাঞ্চলে আমার পাঠানো সকল চিঠি বান্দরবানের মধ্য দিয়ে যেত। সেইসব চিঠি বোমাং রাজার হাতে পড়ত। তিনি বিশেষ কায়দায় চিঠিগুলো খুলে পড়ে আবার সিল করে দিতেন। পুলিশের হাবিলদার চিঠির খলে নিয়ে সোজা রাজার কাছে দিয়ে আসত।

সরকারি চিঠি খুলে পড়া মারাত্মক একটা অপরাধ। এটা যদি ধরা যায় তা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আসবে। আমি চিঠিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা হাতে নিলাম।

২৭. বোমাং রাজার জন্য ফাঁদ

আমি একদিন পরিকল্পিতভাবে ডাকপিয়নকে দুপুর পর্যন্ত আটকে রাখলাম একটা জরুরি চিঠি পাঠানোর কথা বলে। দক্ষিণে আমার এক সিনিয়র জমাদারের কাছে একটা চিঠি লিখে খামের ওপর বড় বড় অক্ষরে লিখলাম ‘অতি জরুরি পত্র’। তারপর সেই চিঠিটা পিয়নের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম।

আমার চন্দ্রঘোনার হেডকোয়ার্টার্স থেকে বান্দরবান পুরো এক দিনের পথ। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয়। আমি হিসাব করে এমন সময়ে ডাক ছাড়লাম যাতে রানার বোমাং রাজার গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ রাত হয়ে যায়। পৌঁছানোর পর পুলিশ সেই ব্যাগ নিয়ে বোমাং রাজার কাছে

দিয়ে আসবে। যেহেতু বেশি রাত হয়ে যাবে, সেহেতু খুব সম্ভবত ওই ব্যাগটা রাতের বেলা রাজার কাছেই থেকে যাবে।

আমি সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আমার মতলব নিজের কাছে চেপে রাখলাম। সন্ধ্যার দিকে ফজুল্লাকে ডেকে বললাম- ‘ফজুল্লা তোমার সেরা চারজন পুলিশকে বেছে নাও। তারপর একটা নৌকা নিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য তৈরি হও। আমরা বান্দরবান যাব।’

“আমাদের সাথে কি অস্ত্র নিতে হবে সাহেব?’

‘নিশ্চয়ই। কারবাইনগুলো নাও। আর বিশ রাউন্ড গুলি। এটা হালকা ধরনের অভিযান। কোনো খাবার নেওয়ার দরকার নাই। তবে রওনা দেওয়ার আগে সবাই যেন ভালো করে খেয়ে নেয়। আমাদের সারা রাত হাঁটতে হবে। আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে বলো। আর একটা কথা— সবার মুখ যেন পুরোপুরি বন্ধ থাকে।

ফজুল্লা আমাকে স্যালুট করে চলে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ছোট দলটা নদীর ওপারে নিরাপদে নামল। তারপর সন্ধ্যার মুখে বান্দরবানের দিকে যাত্রা শুরু হলো। পথটা মোটেও সুবিধার না। অন্ধকারে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল। একে ঘন জঙ্গল তার ওপর চাঁদ নেই আকাশে। আমরা জল-কাদা-জঙ্গল-ঝিরি ইত্যাদি পেরিয়ে চলতে লাগলাম। এই পথে ডাকপিয়ন যে গ্রামে যাত্রাবিরতি করে বিশ্রাম নেয় আমরা সেই গ্রাম এড়িয়ে অন্য একটা জায়গায় বিশ্রাম নিলাম যেন খবর জানাজানি না হয়।

রাত তিনটার দিকে আমরা সাঙ্গু নদীর তীরে পৌঁছালাম। নদীর ওপাশে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নীরব নিস্তব্ধ বান্দরবানের গ্রাম।

‘ফজুল্লা, তুমি কী জানো খেয়ানৌকাটা কোথায় গেল? ওটা তো এখানে থাকার কথা।’

‘না সাহেব, রাতের বেলা নৌকা ওই পাড়ে তুলে রাখা হয়। আমি কী মাঝিকে চিৎকার করে জাগাব এখান থেকে?”

‘একদম চুপ থাকো। ফিসফিসানির চেয়ে জোরে কথা বলারও দরকার নাই। আমাদের কাউকে সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে নৌকা নিয়ে আসতে হবে।

আমাদের একজন লোক চটজলদি জামা খুলে অন্ধকার নদীতে সাঁতার দিয়ে ওপারের দিকে চলে গেল।

সবাই উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কেটে গেল। নৌকার দেখা নাই এখনো। পূর্বদিকে শুকতারা দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদেই গ্রামের লোকজন জেগে উঠৰে। অতএব আমাদের সাঁতার দিতে হলো নদী পার হতে। একবারে কাজ হলো না। একাধিকবার সাঁতার দিতে হলো অস্ত্র, গোলাবারুদ মাথার ওপরে রেখে পার করতে। আমরা যখন পারাবারের শেষপর্বে পৌঁছে গেছি তখন আমাদের সেই প্রথম সাঁতারু আবির্ভূত হলো। সে বলল-

‘সাহেব আমি দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও নৌকাটা নিতে পারলাম না। নৌকার বৈঠাগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি ওগুলোর খোঁজ করছিলাম এতক্ষণ ধরে।’

*চুপ থাকো তুমি! আর কোনো কথা নয়। সোজা হাঁটো।’

আমরা নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুতগতিতে কিছুটা এলোমেলো পদক্ষেপে পুলিশ ফাঁড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছালাম। ফিসফিস করে বললাম- ‘ফজুল্লা, তুমি আগে ভেতরে ঢোকো। ভেতরে গিয়ে হাবিলদার ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আসো। ওকে বলবে আমি সব জানি। সে যদি সব স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে তবেই রেহাই পেতে পারে। ঘরের বাকি সবাইকে চুপ থাকতে হুকুম দাও।’

দ্রুত এবং সংক্ষেপে কাজ সারা জরুরি ছিল। প্রথমত, হাবিলদার হলো পার্বত্য জাতির মানুষ। সে এবং তার আত্মীয় পরিজন সবাই বোমাং রাজার প্রজা। দ্বিতীয়ত, আমি যদি কাজ সারতে একটু দেরি করি, তা হলে বোমাং চিফ আমার সকল সাক্ষীকে গায়েব করে দেবে।

ফজুল্লা অল্প সময়ের মধ্যে হাবিলদারকে ধরে আনলো। সে ব্যাটা খুব তড়পাচ্ছে। আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে ফজুল্লাকে ইঙ্গিত করলাম পাশের জঙ্গলে নিয়ে যেতে। পাশের একটা ঝোপের মতো জায়গায় নিয়ে রিভলবার বের করে কঠিন চোখে তার দিকে তাকিয়ে নলটা মাথা বরাবর তাক করলাম।

এবার ব্যাটা মাটিতে বসে পড়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চাইতে শুরু করল। তারপর সে সব স্বীকার করল। বলল চিঠির থলেটা বোমাং রাজার বিছানার পাশে আছে। সে চলে আসার সময় দেখেছিল ‘অতি জরুরি’ লেখা একটা চিঠির সিল ভেঙে ফেলা হয়েছে।

ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট ছিল আমার জন্য। আমি ফজুল্লাকে হুকুম দিলাম জলদি সবাইকে নিয়ে বোমাং রাজার বাড়ির দিকে মার্চ করো! কুইক মার্চ!’

আমরা যখন নীরব নির্জন সেই গ্রাম্য পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। গ্রামের নানান ঘর থেকে এখানে ওখানে দুয়েকটা মাথা দেখা যাচ্ছে। ওরা উঁকি দিয়ে দেখছে আমরা কারা, কী চাই এখানে?

আমরা সোজা বোমাং রাজার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আমার লোকদের নিচে রেখে আমি দ্রুত আর নিঃশব্দে মই বেয়ে বাড়ির ওপরে উঠলাম। তারপর সামনের বারান্দা পেরিয়ে তার শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। চিঠির থলেটা সত্যিই তার শিয়রের কাছে রাখা। মুহূর্তের মধ্যে আমি তাকে সেই ব্যাগসহ আটক করে বাইরে নিয়ে এলাম। আমার লোকেরা এসে ঘিরে দাঁড়ালো।

এটা খুব অদ্ভুত একটা দৃশ্য। ভোরের প্রথম সূর্য তখন আলো ছড়াতে শুরু করেছিল। বাড়ির মাচার ওপর পাঁচজন পুলিশের তাক করা বেয়নেটের সামনে হতভম্ব বোমাং চিফ দাঁড়ানো। তার পাশে খালি পায়ে রিভলবার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে

আছি আমি। আমার সারা শরীর ভেজা। সারা রাত ধরে হেঁটেছি। তারপর সাঁতরে নদী পার হয়েছি। জামাকাপড় কাদাপানিতে জবজবে হয়ে আছে, টপটপ করে পানি পড়ছিল গা থেকে। নিচে বাড়ির চত্বরে গ্রামের লোকজনের ভিড় বাড়ছিল। ব্যাপার বুঝতে না পেরে তারা সবাই মৃদু গুঞ্জন করছিল। কারো কারো হাতে বর্শাও আছে। আমাদের পেছন দিকে বাড়ির দেওয়াল ছিল। তাই আমাদের ঘেরাও করতে পারবে না চারপাশ থেকে।

কিছুক্ষণ পর একটা উত্তেজনা দেখা গেল উপস্থিত জনতার মধ্যে। জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন বোমাং চিফের ভাই। তিনি গলা খাকারি দিয়ে একটু অস্বাভাবিক তড়িঘড়ি করে এগিয়ে এলেন। মাথার ওপর একটা বড় ছাতা ধরে আছেন। আমি সংক্ষেপে মৃদুস্বরে তাকে ঘটনাটা খুলে বললাম। তারপর জানালাম যে বোমাং রাজাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। এই কাজে যদি লোকজন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কিংবা কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটানো হয়, তা হলে তার মরণ ডেকে আনা হবে।

জনতা বিড়বিড় করতে করতে পিছু হটে গেল। আমি আসামিকে নিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে চলে গেলাম। তারপর সেখানে সবার উপস্থিতিতে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের মতো সরকারি বিধি মাফিক সব সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করে বোমাং চিফকে বললাম তার বক্তব্য জানাবার জন্য।

সেখানেই তাদের পারিবারিক বৈঠকের মাধ্যমে বোমাং রাজা বিনীতভাবে নত হয়ে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। তারপর প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যদি আমি এই অপরাধটা ক্ষমা করে দেই তা হলে তিনি ভবিষ্যতে আমার গাইড হিসেবে আমাকে সব ধরনের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এসব শুকনো কথায় চিড়ে ভিজবে না। আমি কড়া ভাষায় বললাম যে আইনের প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প হাতে নেই।

তখন বদমাশটা বলল যে সে সিল ভাঙেনি। সিল ভেঙেছে তার দেওয়ান। সে-ই সিল ভেঙে সরকারি চিঠি খুলে পড়েছে। আমি তার বক্তব্য রেকর্ড করলাম এবং তার ভাইকে সাক্ষী রাখা হলো।

“ফজুল্লা। দেওয়ানকে গ্রেফতার করো।’

এই দেওয়ান বোমাং চিফের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাকে তখনই গ্রেফতার করা হলো। পনেরো মিনিটের মধ্যে তাকে পুলিশ প্রহরায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে পৌঁছে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বললাম ফজুল্লাকে।

এবার আমি একটু স্বস্তি পেলাম। তারপর বোমাং চিফের সাথে একটা চুক্তিতে আসলাম। দেওয়ানকে বলির পাঁঠা বানিয়ে বোমাং রাজা বললেন যে তিনি দেওয়ানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত যদি আমি তাকে উপস্থিত লোকদের সামনে কোনো সাজা না দেই। তিনি বললেন যে তিনি বুড়ো হয়েছেন। এখানকার শাসনভার তিনি তার ভাইয়ের হাতে অর্পণ করবেন। বাকি জীবন তিনি ধর্মকর্ম করে কাটাতে চান।

আমি তাকে মাফ করব কি না সে সিদ্ধান্ত মুলতুবি রেখে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে নৌকায় চড়ে বসলাম। সেখানে গিয়ে দেওয়ানের সাথে কথা বললাম। দেওয়ান জানালো যে তার প্রভু নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য তাকে বলির পাঁঠা বানিয়েছে। আমি যদি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করি তা হলে তিনি যা জানেন সব খুলে বলবেন আমাকে।

এভাবেই আমি আমার শত্রু নিধন পরিকল্পনার ষোলকলা পূর্ণ করলাম এবং বোমা এলাকাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিলাম।

তবে একেবারে বিনামূল্যে নয়। এই অভিযানের জন্য সারারাত ধরে পথ চলে সাঁতরে নদী পার হতে গিয়ে যেসব ঝক্কি ঝামেলা অতিক্রম করেছি তার জন্য আমার শরীর মারাত্মকভাবে জ্বরজারিতে আক্রান্ত হলো পরবর্তী কয়েকটা দিন। তা সত্ত্বেও আমি সবচেয়ে সফল হয়েছি নতুন বোমাং রাজাকে কব্জা করতে পেরে। তিনি ভাইয়ের পরিণতি বরণ করতে চান না। তাই তিনি আমার প্রতি অনুগত থাকার শপথ নিয়েছেন। দক্ষিণের ঝামেলা মিটে গিয়েছিল সেই যাত্রায়।

২৮. কালিন্দী রানির সাথে দ্বন্দ্ব

আমার পরের ঝামেলাটা রয়ে গেছে কালিন্দী রানির সাথে। তিনি পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যভাগ শাসন করেন। মং রাজা শাসন করেন উত্তর ভাগ। মং রাজার সাথে আমার কোনো সমস্যা নেই। শুরু থেকেই তিনি বন্ধুসুলভ আচরণ করেছেন। কিন্তু কালিন্দী রানি বয়স্ক এক বিধবা নারী। তিনি তাঁর মতলবাজ পরামর্শকদের কথার বাইরে পা দেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমার বসবাসের সময় জুড়ে তিনি বৈরী মনোভাব নিয়ে ছিলেন।

তিনি প্রথম ঝামেলা শুরু করেন আদালতে আমার নেওয়া কিছু কিছু সিদ্ধান্তের বিষয়ে। পরীক্ষামূলকভাবে তিনি কিছু রায়ের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের কাচারিতে আপিল করেন। তারপর সেটা কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যান।

আমি খুব সতর্ক ছিলাম। যে কোনো সন্দেহজনক রায়ের ব্যাপারে আমি আমার বন্ধু চট্টগ্রামের কমিশনারের সাথে পরামর্শ করতাম। ফলে তিনি আমার অফিসিয়াল কাজের মধ্যে কখনো বাগড়া দিতে পারেননি।

এরপর বেছে নেওয়া হলো আরো আগ্রাসী পদ্ধতি, প্রাচ্য দেশে যেটা জনপ্রিয়। আমার বিরুদ্ধে বেনামিতে পিটিশন পাঠানো শুরু হলো কলকাতাতে। আমার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছিল। বাংলার সরকার সেইসব বিষয়ে আমার মন্তব্যের জন্য নোট পাঠাত। বিষয়টা বিরক্তিকর হলেও জবাব দিতে আমার সমস্যা হতো না। কারণ অভিযোগগুলো ছিল একেবারে ভিত্তিহীন।

কিন্তু এই উৎপাত ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছালো যে একসময় সরকারের মনে হলো হয়তো সত্যি সত্যি কোনো ঝামেলা আছে

এখানে। বেনামি পত্রগুলো সরকার উপেক্ষা করে গেছে। কিন্তু একবার পার্বত্য এলাকার কয়েকজন নেতার স্বাক্ষর নিয়ে কলকাতায় লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে একটা পিটিশন পাঠানো হলো। পার্বত্যবাসীর প্রতি আমার অত্যাচার-নির্যাতনের বিষয়ে অভিযোগ। সেই অভিযোগ সরকার ফেলে দিতে পারল না।

এই পিটিশন দেখে লেফটেন্যান্ট গভর্নর চট্টগ্রামের কমিশনারের কাছে পত্র মারফত নির্দেশ জারি করলেন তিনি যেন স্বশরীরে আমার দফতরে এসে সব অভিযোগের তদন্ত।

আমাকে স্বীকার করতে হবে যে ব্যাপারটাকে এতদূর গড়াতে দেখে আমি খুব গভীরভাবে আহত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। আমি নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে ওখান থেকে নিজেকে চট্টগ্রামে সরিয়ে নিয়ে এলাম। কেউ চাইলে আমার অনুপস্থিতিতে আমার বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে।

কমিশনার চন্দ্রঘোনায় আমার হেডকোয়ার্টার্সে বসে সেসব লোককে তলব করলেন তাদের নাম ওই পিটিশনে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা এসে সাক্ষ্য দিল যে ওরকম কোনো পিটিশন তারা দেয়নি, কোথাও তাদের স্বাক্ষর ছিল না। কেউ বদমায়েশি করে জাল পিটিশন দাখিল করেছে। বরং তার উল্টো কিছু পিটিশন কমিশনারের কাছে দাখিল করা হলো পুরো পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের পক্ষ থেকে। যাদের মধ্যে আছে বোমাং রাজা মংপ্রু। যিনি ভাইয়ের হাতে ক্ষমতা দিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। উত্তর দিক থেকে মং রাজা কেও-জা-সিয়েন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে কমিশনারকে অনুরোধ করলেন আমাকে যেন পার্বত্য অঞ্চলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া না হয়।

এরকম উল্টো ফলাফল পেয়ে কমিশনার আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিলেন। বললেন, তিনি আমার এত জনপ্রিয়তা দেখে খুব আনন্দিত। তিনি সরকারের কাছে আমার কাজের প্রশংসা জানিয়ে রিপোর্ট করবেন।

এই ঘটনার সময় আমার কাছে আরেকটা অদ্ভুত প্রস্তাবও এসেছিল। প্রস্তাবটা পাঠিয়েছিল লুসাই চিফ রতন পুইয়া।

সে লিখেছে 'আমরা শুনেছি আপনার সাথে কলকাতার বড়লাটের শত্রুতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আপনাকে আমাদের কাছে চলে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মোড়লদের পক্ষ থেকে প্রতিটা গ্রামে আপনার জন্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। আপনার নিরাপত্তার জন্য পার্বত্যবাসীর জন্য বুলেট নিরোধক নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করা হবে। আমাদের কাছে চলে আসেন। আপনি এখানে অনেক বড় নেতা হতে পারবেন।'

অফারটা খুব লোভনীয় ছিল কোনো সন্দেহ নেই। এই তদন্তের ফলাফল যদি অন্য কোনো রকম হতো তা হলে এইসব তথাকথিত সভ্য দুনিয়াকে গুল্লি মেরে আমি তাদের প্রস্তাবটা লুফে নিতাম।

তবে যাই হোক, আমি পাহাড়ি চিফদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে আসলে লাট সাহেবের সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। বরং তিনি আমার

কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমার হাত শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করেছেন। তবু আমার প্রতি তাদের এই সহৃদয়তার কথা কখনো ভুলব না।

২৯. মধ্যরাতের আততায়ী

আমার বিরুদ্ধে এই তদন্ত এবং অনুসন্ধানের ফলাফলটা একটা পুরস্কার বয়ে নিয়ে এলো। আমার পদোন্নতি হলো। আমি নিজেকে সাধুবাদ জানালাম কালিন্দী রানির বিরুদ্ধে আইনত জিতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো আমি নিজের সম্মান রক্ষার্থে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেইনি বলে তিনি সেটাকে আমার দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর পরবর্তী আক্রমণে আমার জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল প্রায়।

সে বছর আমি পার্বত্য এলাকার বিখ্যাত ধর্মীয় সমাবেশ মহামুনি মেলায় অংশ নিয়েছিলাম। পার্বত্যবাসীরা প্রতি বছর জাঁকজমকের সাথে পালন করে এই উৎসব। মেলা থেকে ফেরার পর আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবু বিছানায় যাওয়ার পর চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর বিছানা ছেড়ে উঠে একটা পাইপ ধরানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু দিয়াশলাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমার চাকরবাকরেরা সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে গেছে পাহাড়ের নিচের দিকে। কাচারি ঘরের মধ্যে ট্রেজারির কাগজপত্র থাকে। ওটা পাহারা দেওয়ার জন্য একজন সেন্ট্রি ডিউটি করে। ওটা প্রায় দুশ গজের মতো দূরে। আমার ঘরটা একেবারেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে। নির্ঘুম বিরক্তিকর সময় কিছুতেই কাটছিল না। জোর করে ঘুমিয়ে পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। শুয়ে শুয়ে আমি খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। পরিষ্কার আবহাওয়ায় দূরের জঙ্গলের ওপর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। আমার দরজার চারকোনাকৃতির ফ্রেমের মধ্যে যেটুকু জায়গা দেখা যাচ্ছিল সেটুকু অংশ কেমন রহস্যময় ধূসরতায় আচ্ছন্ন। মেঘের ফাঁক দিয়ে হালকা ঘোলাটে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিল।

আমি শুয়ে শুয়ে আধো আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দরজার ফ্রেমের ধূসর চতুর্ভুজের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম ওদিকে দরজার কালো একটা গোলাকার নব দেখা যাচ্ছে, ওটা আসলে কী। খানিক পর আরেকটা নব দেখা গেলে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। ওটা দরজার নব নয়, ওটা দুটো মানুষের মাথা, যারা নিঃশব্দে আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে।

চূড়ান্ত কোনো বিপদের সময় মানুষের চিন্তাশক্তির গতি বহুগুণ বেড়ে যায়। আমি দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম কী করতে হবে। ভাগ্যক্রমে আমার ঘরটা একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা ছিল। তারা কেউ আমাকে দেখতে

পায়নি। আমার বালিশের নিচে সবসময় একটা গুলিভরা রিভলভার থাকে। অন্ধকারে হাতড়ে এটা ভুলে নিলাম। তারপর একদম নিঃশব্দে জানালার পাশ থেকে একটু দূরে গিয়ে সতর্কতার সাথে চোখ রাখলাম অনুপ্রবেশকারীদের দিকে।

দরজার দিকে ফিসফাস শব্দ শোনা গেল। দরজার ফ্রেমের মধ্যে এখন চারটি ছায়ামূর্তি দেখা গেল। তাদের হাতের বর্শা চাঁদের আলোয় চিকচিক করে উঠল। ওরা সম্ভবত আলোচনা করছিল কে প্রথমে ঢুকবে। অবশেষে একজন হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। আমি ধুপ করে একটা শব্দ শুনলাম, আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম বিছানার সেই বরাবর ছুরি দিয়ে গেঁথে ফেলল। আমার আর সহ্য হলো না। সাথে সাথে আমি বিকট হুঙ্কার দিয়ে পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম অজ্ঞাত আততায়ীর ওপর। তারপরেই একটা হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল। পালাচ্ছে ঘাতকের দল। আমি পলায়নকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম অন্ধকারে। গুলির শব্দ আর আমার হাঁকডাকে চাকরবাকরেরা ছুটে এলো সবাই।

একটা হুলস্থুল শুরু হলো চারদিকে। আততায়ীদের মধ্যে কেউ একজন আহত হয়েছিল। আমার ঘর থেকে রক্তের ধারা অনুসরণ করে একটা ঝোপের পাশে দুটো বর্শা, পাওয়া গেল। পালিয়ে যাওয়ার সময় ফেলে গেছে ওরা। কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না ওখানে। বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে।

আমি কখনোই খুঁজে বের করতে পারিনি সেদিন কে আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু আমি যতটা বুঝেছি এটা কালিন্দী রানির কাজ হতে পারে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মতো যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে কিছু করা গেল না।

এর পর থেকে কিছুদিনের জন্য আমার বারান্দায় একজন সেন্ট্রিকে পাহারায় রাখা হয় রাতে আমার ঘুমের সময়। পরবর্তী সময়ে আমার বন্ধু মং রাজার পরামর্শে আমার শোবার ঘরটিকে ধর্মীয় পবিত্রতায় সুরক্ষিত রাখার জন্য মহান বুদ্ধের একটি প্রতিকৃতি রাখি। যেটা উপহার দিয়েছিলেন রাজা নিজেই। বুদ্ধের ছবি ঘরে থাকলে সেখানে খুনখারাবি নিষিদ্ধ বলে ধরা হয়। ওটাকে একটা স্ট্যান্ডের ওপর রাখলাম। ওটার নিরাপত্তার ছায়াতেই আমি পরবর্তী সময়গুলোতে ঘুমিয়েছি।

৩০. আনন্দ উচ্ছ্বাসের মহামুনি মেলা

বং রাজার নিমন্ত্রণেই আমি মহামুনি মেলাতে গিয়েছিলাম। এই মেলাটি ধর্মীয় এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গৌতম বুদ্ধের একটা মূর্তি আছে পাহাড় ও সমভূমির মাঝামাঝি একটা জায়গায়। বার্ষিক এই উৎসবে পার্বত্যবাসীরা পুণ্য অর্জনের

তাগিদে দলে দলে যোগ দেয়। আর বাঙালি ব্যবসায়ীরা মেলায় দোকান দিয়ে সরলমনা পাহাড়িদের মন ভোলানো চটকদার জিনিসপত্র বিক্রি করে।

আমি মেলার আগের দিন ওখানে পৌঁছে একটা আমবাগানে তাঁবু খাটালাম। মন্দিরটা চৌকোনা সাদা রং করা একটা দালান। চারদিকে প্রবেশ করার জন্য চারটা দরজা রয়েছে। দরজার সামনে একটা করিডর। সেই করিডর দিয়ে দালানের চারদিকে প্রদক্ষিণ করা যায়। মাঝখানে গৌতম বুদ্ধের বিশাল একটা প্রতিকৃতি রাখা। উচ্চতায় প্রায় চল্লিশ ফুট হবে। তার সামনে জ্বলছে অসংখ্য ছোট ছোট প্রদীপ। প্রদীপের পাশেই ঘণ্টা ঝোলানো আছে। কোনো উপাসক এলে ঘণ্টা বাজিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়।

বাঙালি ব্যবসায়ীরা মেলার আগের রাতে এসে তাড়াহুড়ো করে বাঁশের বেড়া দিয়ে দোকান তৈরি করে। পরদিন ভোরবেলা থেকে তাদের জিনিসপত্র সাজিয়ে বসে। মিষ্টির চাহিদা খুব বেশি বলে মিঠাইওয়ালারাও আসে। এ ছাড়া সুতি, সিল্কসহ নানান ধরনের কাপড়, অলংকারপাতি, পান-সুপারি তামাক ইত্যাদি পণ্য বিক্রি হয়। মোটকথা পাহাড়িরা যেসব জিনিস পছন্দ করে, সেসব জিনিসের একটা বিশাল পসরা বসে পুরো মেলা চত্বরে।

তীর্থযাত্রীরা একেকটা দল নিয়ে আসে একেক গ্রাম থেকে। প্রত্যেকের সাথে থাকে বাদক দল। সবাই উৎসবের সাজে সজ্জিত থাকে। মেয়েরা গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট পরে, উপরের অংশে সাদার ওপর ফুল তোলা সুতির কাপড়। তারা সাধারণত রুপা কিংবা প্রবালের তৈরি মালা পরে। কানে থাকে দুল। কারো খোঁপায় অর্কিড গোঁজা। মেয়েরা ফুল পছন্দ করে বলে পুরুষরা খুব ভোরে জঙ্গলে গিয়ে সুন্দর সুন্দর ফুল তুলে নিয়ে আসে তাদের প্রিয়তমার গলায় পরানোর জন্য।

প্রত্যেকটা দলে দুয়েকজন বয়োবৃদ্ধ থাকে যারা নেতৃত্ব দেয়। তবে নিঃসন্দেহে তরুণদের সংখ্যা অনেক বেশি। মেয়েরা দল বেঁধে হাসির ফোয়ারা ছড়াতে ছড়াতে মেলায় প্রবেশ করছে। তাদের উপস্থিতি মেলার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতিটা দল এসে পৌঁছানোর পর সুবিধাজনক একটা গাছের নিচে নিজেদের জিনিসপত্রগুলো রাখল যেখানে তারা অস্থায়ী ডেরা বাঁধবে। ওখান থেকে তারা মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের প্রতিকৃতির সামনে গিয়ে নিজেদের অর্ঘ্য প্রদান করবে।

সবশেষে এলো চমক জাগানিয়া কিছু দোকান। ওখানে পাহাড়িদের কোনো দোকানপাট নেই। বাঙালিদের একচেটিয়া রাজত্ব। পটকাবাজি আর হলুদ মোমবাতির খুব চাহিদা ছিল রাতের জন্য। যখন আমোদপ্রমোদ তুঙ্গে ওঠে। লাল সুতোয় গাঁথা পুতির মালা, সস্তা বাঁশি, তুষারশুভ্র মসলিন, চটকদার রুমাল, সবকিছুই বিক্রির জন্য তৈরি। দিল্লি কলকাতার বিখ্যাত জায়গার চিত্র নিয়ে একটা বায়োস্কোপ প্রদর্শনী ছিল খুব আকর্ষণীয়। জঙ্গল থেকে ধরে আনা

একটা ওরাংওটাংকে বনমানুষ হিসেবে দেখানো হলো। ওটাই ছিল সবচেয়ে ব্যবসাসফল প্রদর্শনী।

মেলার মধ্যে তরুণ-তরুণীদের ব্যাপক স্বাধীনতা দেখা গেছে। কিন্তু মনি পরিশীলিত একটা নিয়মনীতির মধ্যে। প্রেমিক-প্রেমিকারা হাত ধরাধরি করে ঘোরাঘুরি মিঠাই মণ্ডার দোকানে থামছে, তারপর এগিয়ে যাচ্ছে পান-সুপারির দোকানের

পান-সুপারির দোকানে যাওয়ার ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড়িদের মধ্যে পান বিনিময়ে প্রেম নিবেদন ও তার ফলাফল লুকিয়ে থাকে। ছেলেটা যদি প্রেমিকাকে সবুজ সতেজ পান এবং সুপারি কিনে তার সাথে একটা বিশেষ ফুল দেয় তা হলে সেটা হবে প্রেমের প্রস্তাব। যদি পানের এক কোনায় একটা মসলা দিয়ে পানটা বিশেষ কায়দায় মোচড় দেওয়া হয় তার অর্থ হলো 'আমার সঙ্গে যাবে চলো'। যদি মেয়েটা সেই পানের ওপর হলুদ লাগিয়ে দেয়, তা হলে বুঝতে হবে সে প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু যদি পানের ভেতরে একটা কয়লার টুকরো ভরে দেয় তা হলে বুঝতে হবে সে বিরক্তির সাথে প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে।

এভাবে প্রাথমিক পর্বে নিঃশব্দ প্রেম নিবেদনের পালা শেষ হওয়ার পর গান ও বাঁশি বাজিয়ে প্রেমের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। পাহাড়িদের নিজস্ব কথা ও সুরে গানের অনুষ্ঠান চলে। ছেলেরা ও মেয়েরা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে গান গাইতে থাকে। মেয়েরা একটা গান গাইবে সেটার উত্তরে ছেলেরা আরেকটা গাইবে। এভাবেই চলতে চলতে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার পর সবাই মন্দিরের চারদিকে ঘুরতে শুরু করল হাতে হাতে প্রদীপ নিয়ে। গরম আর হৈচৈয়ের মধ্যে সারারাত ধরে তারা বাজি ফুটিয়ে, একে অপরের মোম নিভিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকল ভোরের সূর্যোদয় পর্যন্ত।

তিনদিন ধরে এই হৈ হুল্লোড় উৎসব চলল কোনো বিরতি ছাড়াই। চতুর্থ দিনের ভোরে গিয়ে তার অবসান ঘটল। মেলা গুটিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য সবাই তৈরি হতে লাগল। একের পর এক দোকানগুলো বন্ধ হতে থাকল। ভাগ্যবান ব্যবসায়ীরা তাদের সব পণ্য বিক্রি করতে পেরেছে। এখন তারাও হিসবে গুটিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত।

মন্দিরের বাইরের চত্বরে হলুদ জোব্বা পরিহিত কয়েকজন ধর্মগুরু বিশাল ছাতা মাথায় দিয়ে মাটিতে বসে বসে জপমালা গুনতে গুনতে ধর্মীয় বাণী পাঠ করছিলেন গ্রামবাসীরা তাঁদের কাছে গিয়ে বিদায়ী আশীর্বাদ গ্রহণ করে নিজ নিজ পথে হাঁটতে শুরু করছিল।

প্রত্যেক ধর্মগুরুর পাশে মাটিতে ছোট একটা গর্ত করা আছে। সেই গর্তে পূজারিগণ তামা বা রুপার পয়সা ফেলছে। সেই গর্তটার ওপরে একটা বাশের তৈরি তেপায়া সাজানো হয়েছে লতাপাতা ফুল দিয়ে। সেখান থেকে একটা সাদা সুতো উপস্থিত সকল পূজারির কাঁধের ওপর ঘুরে গুরুর হাতে গিয়ে শেষ হয়েছে যিনি এদের সবার কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।

সেই পবিত্র পুরুষ ধীরে ধীরে মন্ত্রপুত পানি ঢালছেন তেপায়ার ওপর থাকা পাত্রের ওপর। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছেন আর হাতের ইশারায় খুব ধীরগতিতে আশীর্বাদ বাণী প্রদান করে যাচ্ছেন গ্রামবাসীদের মধ্যে।

আশীর্বাদপ্রার্থীদের মধ্যে বেয়াড়া ধরনের এক তরুণী অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন গুরু, নৌকা তো ছেড়ে দেবে মনে হচ্ছে।'

এরকম কথা বেয়াদবির শামিল বলে তার মুরব্বি গোছের কেউ কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল। এভাবেই চমত্কার ওই মেলা উৎসবের সমাপ্তি ঘটল।

৩১. বাঙালি মোক্তারের অপকীর্তি

নিজের কোয়ার্টারে ফিরে আসার পর আমি ভাবছিলাম যে পার্বত্য এলাকার এই চমৎকার মেলাটি একটা অতুলনীয় সৌন্দর্যে ভরপুর। এতগুলো তরুণ নারী-পুরুষ অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের কারো মধ্যে আমি একটিও মাতাল দেখিনি। কোনো নারীর সম্মানহানি হতে শুনিনি। সবাই নিজের মতো করে আনন্দ-উৎসব করেছে পরিমিতিবোধ নিয়ে। আফ্রিকা, নিউগিনি কিংবা অন্য কোনো দেশের আদিবাসীদের সাথে এদের তুলনা হয় না। তাদের নিজের জীবন নিয়ে তাদের কোনো গ্লানি নেই। এরা নিজের সরল ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে সুখী সুন্দর জীবনযাপন করছে। ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে এদের শিক্ষা নেওয়ার কিছু নেই। লুসাই বা সেন্দুদের সাথে এদের কোনো মিল নেই। ওরা বর্বর ধরনের জাতি। কিন্তু চট্টগ্রামের এই জাতিগোষ্ঠীগুলো অতি ভদ্র, সুশৃঙ্খল এবং রুচিশীল ধরনের মানুষ।

তবে বাঙালিদের কথা আলাদা। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি উকিল-মোক্তারগুলো একটা মূর্তিমান উপদ্রব। তাদের অপকর্মে আমি এত বিরক্ত ছিলাম যে আমি ওদের এখান থেকে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকে কখনো বিরত থাকিনি। মেলা শেষ হওয়ার পর শেষ তিনজনকে আমার জেলা থেকে তাড়ালাম।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের কমিশনারের কাছে, তারপর বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছে পিটিশন দেওয়া হলো। তাতেও আমি ছেড়ে কথা বলিনি। আমি সরকারকে বলেছি কীভাবে তারা পাহাড়িদের অজ্ঞতা ও সারল্যকে পুঁজি করে এখানে বাণিজ্য করে যাচ্ছে। আমার আদেশকে অমান্য করে সরকারের কাজের ক্ষতি করছে। আইনের ভুলভাল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আমার কোনো আদেশ যদি পাহাড়িদের কাছে অন্যায্য মনে হয় তা হলে সেটা নিয়ে তারা কমিশনারের কাছে দরবার করতে পারে। কিন্তু এসব উকিল প্রতারণার মাধ্যমে আমার আদেশকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে যেটা রীতিমতো অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

আমি যতদূর দেখেছি পাহাড়ের সরল লোকদের সমস্যাগুলো ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে সমাধান করা সম্ভব। সরকারি আইনের লম্বা-চওড়া ধারা-উপধারাগুলো তাদের মাথায়

ঢোকে না। সেগুলো তাদের কাছ থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। তারা সচক্ষে যে মানুষকে দেখতে পায় এবং শুনতে পায় তার বিচারের ওপর নির্ভর করে। তাতে খুশি বা অখুশি যাই হোক না কেন। সাধারণত পাড়ার মাতব্বর কিংবা চিফ যেই হোক না কেন তাদের কথার ওপর ভরসা করে চলে ওরা। ধূর্ত বাঙালিরা আমাদের আইনগুলোর অপব্যবহারের মাধ্যমে পাহাড়িদের সর্বনাশ করে থাকে।

সেরকম একটা ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যাক।

কোনো এক পাহাড়ি ভালো ফসল না হওয়ার কারণে তার মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জোগাড় করতে পারেনি। তাই তাকে এক বাঙালি মহাজনের কাছ থেকে বিশ বা ত্রিশ রুপি ধার করতে হয়েছিল। মাসে ৫% সুদ। বছরে ৬০%। যতদিন পর্যন্ত আসল টাকা দিতে না পারবে ততদিন এই সুদ তাকে দিয়ে যেতে হবে। সরলমনা পাহাড়ি টাকার জোগাড় না হওয়া অবধি মোটা অংকের সুদ দিয়ে যায়। তারপর একদিন আসল টাকা জোগাড় হওয়ার পর সেটা ফেরত দেওয়ার জন্য তৈরি হয়।

তারপরেই আসল ঘটনাটি ঘটে।

পাহাড়ি লোকটা যখন মহাজনের কাছে টাকা ফেরত দিতে যায়, তখন মহাজন বলে 'টাকা নিয়ে আসছো? খুব ভালো করেছো দোস্ত। দেখো আমি তোমার বন্ড ছিঁড়ে ফেলছি।

বলতে বলতে সে তার চোখের সামনেই একটা বন্ড ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। পাহাড়ি লোকটা লিখতে পড়তে জানে না। সে খুব খুশি ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্তি মিললো তার। মুক্ত মানুষ হিসেবে খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল সে।

কিন্তু ওই ব্যাটা মহাজন আসল বন্ড লুকিয়ে রেখেছিল সময়মতো কাজে লাগানোর জন্য। কিছুদিন পর লুকিয়ে রাখা আসল বন্ডটা বের করে নিয়ে আদালতে হাজির হলো। তারপর পাহাড়ি লোকটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল ঋণ আদায়ের জন্য। ধরা যাক পাহাড়ি লোকটার নাম নীলচন্দর। সুদে-আসলে নীলচন্দরের কাছে বিরাট অংকের পাওনা দাবি করে মামলা করা হলো। নীলচন্দরকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হলো।

মামলার শুনানির তারিখে মহাজন তার নৌকা নিয়ে নীলচন্দরের জন্য ঘাটে অপেক্ষা করছিল। সে উপস্থিত হওয়ামাত্র মহাজন তাকে সাদরে কাছে ডেকে নিল।

তারপর মেকি সহানুভূতির সুরে বলল- 'দোস্ত আমার একটা ভুলের জন্য তোমাকে কী একটা মুসিবতে পড়তে হলো। কত কষ্ট করে এতদূরে আসতে

হলো। তবে তোমার না আসলেও চলতো। আমি তো আছি এদিকে। দাও তোমার সমনটা আমার কাছে দাও। তোমার আর কোর্টে গিয়ে ঝামেলায় পড়ার দরকার নাই। আমি সাহেবের সাথে সরাসরি কথা বলে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলব। তুমি ততক্ষণে আমার বাড়িতে গিয়ে নাশতা পানি খাও, আরাম করো।

বেচারা নীলচন্দর মহাজনের চক্করে পড়ে তার বাড়িতে গিয়ে জলপানি খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। আর ওদিকে ধূর্ত মাকড়সা কোর্টে গিয়ে হাজির হলো। নীলচন্দরের অনুপস্থিতিতে একতরফা রায় পেয়ে গেল মহাজন। নীলচন্দরের ওপর ডিক্রি জারি করা হলো সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য।

ধূর্ত মহাজন নীলচন্দনকে খাইয়ে দাইয়ে দ্রুত বাড়িতে ফেরত পাঠালো। তাকে এই রায়ের ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানতে দিল না। এর মধ্যে আপিল করার সময়ও চলে গেছে। অতএব ডিক্রিটা বহাল হয়ে গেছে।

নীলচন্দরের কাছে যখন খবরটা পৌঁছালো তখন আর কিছু করার নেই; যা হওয়ার হয়ে গেছে। দুর্ভাগা নীলচন্দরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যখন সে শুনলো তার ওপর এত বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর সে আক্ষরিক অর্থেই মহাজনের দাসে পরিণত হলো।

এটা কোনো কল্পচিত্র নয়। বাস্তবে এরচেয়েও খারাপ কেস দেখেছি আমি। এসব অপকর্ম রোধ করার জন্য পরবর্তী সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে নতুন আইন জারি করা হয় পার্বত্যবাসীদের জন্য। আইনগুলোর সারাংশ এরকম-

১. পার্বত্যবাসীদের জন্য কোনো উকিল লাগবে না।

২. কিছু ক্ষেত্রে স্ট্যাম্পের প্রয়োজনীতা বাতিল করা হলো।

৩. সর্বোচ্চ সুদ বার্ষিক ১২% হারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হলো এবং একটা নির্ধারিত সময়ের পরে ঋণ আদায় করা যাবে না বলে আইন জারি করা হলো।

এই আইনগুলো জারি করার পর পার্বত্যবাসীরা অনেকটা স্বস্তি পেল। তাদের আইনের বেড়াজালে ফেলে আর কব্জা করতে পারবে না অসৎ লোকেরা।

৩২. খিয়ং-থা বনাম তাউং-থা

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগোষ্ঠীগুলো সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হলো খিয়ং-থা বা নদীর সন্তান। অন্য ভাগ হলো তাউং-থা বা পাহাড়ের সন্তান।

খিয়ং-থা জাতিগোষ্ঠীগুলো নদীর কাছাকাছি বাস করে। তারা নৌচালনায় পারদর্শী। এরা আরাকানি বংশোদ্ভূত এবং তাদের ভাষায় কথা বলে। বার্মিজ ভাষায়ও কথা বলে কিছু অংশ। তারা বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন করে।

তাউং-থা জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা পাহাড়ের উপরের অংশে বাস করে। নদীকে খুব ভয় পায়। তারাও সেন্দুদের মতো নৌকা চালাতে জানে না। এদের আমার এখানকার আদিবাসী মনে হয় যারা বাইরে থেকে আসেনি এবং তারা সম্ভবত বার্মার প্রাচীন সিংশো গোত্র থেকে উদ্ভূত। এরা সিংপো ভাষায় কথাবার্তা বলে। সংখ্যার দিক থেকে এরা খিয়ং-থা গোত্রের চেয়ে অনেক কম। তাদের সংখ্যা আনুমানিক ১৩ হাজার জন, যাদের মধ্যে বনযোগী, পাংখো এবং ম্রো জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হয় হাজার জন। যারা বোমাং রাজার অধীন। চার হাজার জন মং রাজার অধীন।

খিয়ং-থা গোত্রের মধ্যে ৩৬ হাজার জন মগ বোমাং রাজার অধীনে, ২৮ হাজার জন চাকমা কালিন্দী রানির অধীনস্থ। মং রাজার অধীনে আছে তিন হাজারের মতো।

প্রতিটি পরিবার মাথাপিছু হিসাবে চার থেকে আট রুপি কর দেয় রাজাকে। তবে অবিবাহিত লোক, পুরোহিত এবং বিধবাদের কোনো কর দিতে হয় না। আরেকটি নিয়ম হলো প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষকে বছরে তিনদিন স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হয় রাজার জন্য। তাছাড়া পরিবার প্রধানের প্রথম উপার্জনের অংশও দিতে হয়।

প্রত্যেক গ্রামে একজন করে রোয়াজা আছেন। গ্রামের লোকেরা তাঁকে নির্বাচিত করে। রোয়াজা সব ধরনের খাজনা সংগ্রহ করে রাজার কাছে পৌঁছে দেন। তবে তিনি নিজে কোনো কর দেন না। রোয়াজা শব্দের অর্থ হলো রোয়াগ্রাম, জা=খাওয়া। সরাসরি অনুবাদ করলে মনে হবে রোয়াজা মানে যে গ্রাম খায়। আসল অর্থ হলো যে গ্রামের আয়ের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে।

যদিও খিয়ং-থা গোত্রের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তবে আমি তাদের প্রকৃতি পূজাও করতে দেখেছি। যেটা মূলত তাউং-থা গোত্রের ধর্ম। যারা নদী আর জঙ্গলের দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে থাকে। তবে প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে একটা করে বৌদ্ধ মন্দির বা কেয়াং আছে। ছোট পাড়া হলে বাঁশ বেতের তৈরি, বড় গ্রাম হলে কাঠের তৈরি মন্দির। মন্দিরের ভেতরে গৌতম বুদ্ধের প্রতিকৃতি রাখা থাকে। যার সামনে প্রতিদিন ফুল এবং খাবারদাবার রাখা হয় পূজার উদ্দেশ্যে। পূজারিরা সেই মূর্তির সামনে মাথা ঠেকিয়ে তাদের প্রার্থনা করে।

মন্দিরের দেওয়ালে ঝোলানো ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যে গ্রামের বাচ্চারা লিখতে এবং পড়তে শেখে। মন্দিরের ধর্মগুরু তাদের দীক্ষা দেন। এখানে যে কেউ চাইলে ধর্মগুরু হতে পারে। কিন্তু আমি কাউকে এটাকে পেশা হিসেবে নিতে দেখিনি। অনেকে জীবনে একবার মাথা মুড়িয়ে হলুদ কাপড় গায়ে জড়িয়ে দীক্ষা নেয়। কিন্তু কেউ সে কাজটাকে চিরস্থায়ীভাবে নেয় না। অন্যের দয়াভিক্ষা করে জীবনধারণ করাকে এরা সম্মানজনক মনে করে না। বৌদ্ধধর্মগুরুরা ধর্মকে খুব আন্তরিকতার সাথে পালন করে।

কিয়াং চত্বরের উঁচু প্ল্যাটফর্মটা বুড়োদের বৈকালিক আড্ডা ও বাচ্চাদের খেলাধুলা করার প্রিয় জায়গা। সবাই মিলে হৈ-হুল্লোড় করে এখানে আনন্দে সময় কাটায়।

৩৩. পাহাড়ের বিয়ে, সম্পর্ক

পার্বত্যবাসীরা একটু অল্পবয়সে বিয়ে করে, তবে কখনোই সতেরো বছরের আগে নয়। কোনো তরুণ যদি কোনো মেয়েকে পছন্দ করে এবং তাতে তার বাবা-মায়ের সম্মতি থাকে তা হলে মেয়েটির বাড়িতে দূত পাঠানো হয়। সেই দূত নৌকা নিয়ে মেয়ের বাড়ির কাছে উপস্থিত হয়ে রীতিমাফিক সম্বোধন করে হাঁক দিয়ে বলে ওঠে- 'ওগাৎসা, আপনাদের বাড়ির ঘাটে একটা নৌকা এসেছে। নৌকাটা কী এখানে বাঁধা যাবে?"

মেয়ের বাবা-মা আগেভাগে খানিকটা অনুমান করতে পারে কোথা থেকে প্রস্তাব এসেছে। তাদের যদি সেই প্রস্তাবে সম্মতি থাকে তা হলে দূতকে তার নৌকাটা বেঁধে ঘরে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করবে।

দূত ঘরের ভেতর যেতে যেতে জানতে চাইবে — ঘরের ভিত মজবুত আছে কি না। যদি উত্তর এমন হয় যে ঘরটা পুরনো হয়েছে, এটার ভিত নড়বড়ে দুর্বল। তা হলে সে বুঝে নেবে এখানে কিছু সমস্যা আছে যেটার সমাধান করতে হবে।

তারপর একটা মুরগি ধরে পরীক্ষা করা হবে। পরের ধাপে অশুভ শক্তি দূর করার জন্য কিছু ডিম ভাঙা হবে। দুই পক্ষের আত্মীয়েরা বিধি মেনে স্বপ্নের মাধ্যমেও শুভাশুভ পরীক্ষা করবে। সবশেষে জ্যোতিষী ডেকে চন্দ্রসূর্যের অবস্থান বিবেচনা করে বিয়ের জন্য একটা শুভদিন নির্ধারণ করা হবে।

এখানকার রীতি অনুসারে নিমন্ত্রণপত্রের সাথে ছোট্ট একটা উপহার পাঠাতে হয়। উপহার ছাড়া বিয়ের জন্য নেমন্তন্ন করাটা অভদ্রতা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। নিমন্ত্রণ ভোজের জন্য শুয়োর আর মুরগি জবাই করা হয়। নানান পদ্ধতিতে সবজি ভাত ইত্যাদি রান্না করা হয়। ডজনে ডজনে বোতল ভরতি মদ প্রস্তুত হয়। এই মদগুলো ভাত থেকে তৈরি করা হয়।

বিয়ের দিন বরযাত্রী নিয়ে কনের গ্রামে উপস্থিত হয় বর। গ্রামে প্রবেশ করার সময় কনেপক্ষের ছেলেমেয়েরা বাঁশের তৈরি একটা ব্যারিকেড দিয়ে রাখে বরযাত্রীদের সামনে। ভেতরে প্রবেশ করতে হলে উপঢৌকন দিতে হবে।

এটি এই অঞ্চলের প্রাচীন রীতি। ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে এক কাপ মদ গিলে কনে পক্ষের ছেলেমেয়েদের কিছু উপঢৌকন দিলে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি মেলে। কনের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত কয়েকবার এই ধরনের বাধা অতিক্রম করতে হয়। তারপর বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হয় বর ও তার সঙ্গীরা।

বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করার পর মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। একটা নতুন বোনা সুতা দিয়ে বর কনেকে জড়িয়ে ফেলা হয়। একজন ধর্মগুরু দুই হাতে দুই মুঠো ভাত নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করে বর কনেকে খাইয়ে দেন। আত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে তারা দুজন পরস্পরের ভালোমন্দের দায়িত্ব নেওয়ার শপথ নেয়। তারপর বর ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে কনের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল আঁকড়ে ধরে এবং উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে উপস্থিত হয়ে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। পাশাপাশি বসার পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা তাদের পোশাকের মধ্যে গিট্টু দিয়ে বন্ধন তৈরি করে। তারপর নিমন্ত্রিতদের আনা উপহারসামগ্রী তাদের সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয়।

এখানকার লোকদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপারটা খুব বিরল ঘটনা। কোনো ধরনের অসদাচরণের ঘটনা ঘটলে রাজার ক্ষমতাবলে সে বিয়েকে বাতিল করা হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদের একটি ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। তখন আমি মং রাজার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম যার সাথে আমার চমৎকার একটা বক্তৃতা গড়ে উঠেছিল।

আমরা রাজার বাড়ির সামনের একটা মাচার ওপর বসে শীতল আবহাওয়ায় সান্ধ্যকালীন চা পান করতে করতে নিরিবিলি গল্প করছিলাম। আমাদের আড্ডার শান্তি হঠাৎ করে বিঘ্নিত হলো যখন চুলের মধ্যে ফুল গোঁজা এক তরুণী ছুটে এলো। মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে রাজার পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মেয়েটার পিছু পিছু কয়েকজন গ্রামবাসীও উঠে এলো। তাদের পরনে ঘরে বোনা তাঁতের কাপড়। সবাই রাজার দুপাশে চুপচাপ উঠে বসল। রাজা নিঃশব্দে ধূমপান করে যাচ্ছিলেন। মেয়েটা তখনো কান্না করে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর কান্নার শব্দ একটু খিতিয়ে এলে রাজা একটু গলা খাকারি দিয়ে আস্তে করে বললেন, ‘কান্নাকাটি করা মেয়েদের জন্য ভালো।’

সুগন্ধী তামাকে বেশ কয়েকটা টান দিলেন রাজা। মেয়েটা তখনো কেঁদে যাচ্ছিল। তখন রাজা গাম্ভীর্যের সাথে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন— ‘তবে তিনটা পরিস্থিতি এড়াতে পারলে ভালো। প্রথমত, কান্না করতে ব্যর্থ হওয়া। দ্বিতীয়ত, কেন কাঁদছে সেটা না জানা। তৃতীয়ত, খুব বেশি কান্নাকাটি করা।’

শেষ অবস্থাটা একটু জোর দিয়ে উচ্চারিত হলো। ফলে উপস্থিত জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হলো। তখন মেয়েটা মাথা তুলে তাকাল।

‘আমি তংগেইর সাথে থাকতে পারব না বাবা। আমি তাকে ঘেন্না করি ‘কেন সে কী করেছে? সে কি তোমাকে মেরেছে?”

‘না মারে নাই। মারলে আমি কষ্ট পেতাম না। কিন্তু সে আমাকে সন্দেহ করে। আমার ওপর নজরদারি করে। আমি ওটা সহ্য করব না। আমি তার কাছ থেকে

তালাক চাই। আমি আপনার পায়ে পড়ি বাবা। আমাকে মুক্তি দেন ওর কাছ থেকে।

রাজা হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন ‘ওই তংগেই, ব্যাটা গাধার বাচ্চা গাধা এদিকে আয়। এসব কী শুনছি আমি?’

তংগেই খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে রাজার সামনে এসে বসল। তারপর বলল-- ‘মহান প্রভু, আমি ওকে নষ্টামি করতে দেখছি।’

মেয়েটা তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগল—’এই সবই মিথ্যা কথা। কিছুই সত্য নয়। আমি কয়েকদিন আগে পাড়ার মেয়েদের সাথে ঝরনা থেকে পানি আনতে গিয়েছিলাম। সেখানে আদুইর প্রেমিক পাওথী এসে হাজির হয়। সে আমাদের দেখে হাসতে থাকলে আমরা সবাই তার দিকে পানি ছিটাতে শুরু করি। তখন এই ব্যাটা (কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকা তংগেইর দিকে আঙুল তুলে) গাছের আড়ালে লুকিয়ে আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছিল। সে এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। তারপর সবার সামনে আমাকে গালিগালাজ করে। আমি জীবনে এতটা অপমানিত হইনি কোনোদিন। আমি আর থাকব না তার সাথে। আমি মুক্তি চাই বাবা, আমাকে মুক্ত করে দেন।

মেয়েটা আবারো রাজার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। চারপাশে সবাই চুপ করে বসে আছে। মেয়েটার ফোঁপানি ছাড়া কারো মুখে কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তংগেইকে দেখে মনে হচ্ছে যদি মাটি দু ফাঁক করে তার ভেতরে ঢুকে যেতে পারত তা হলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হলো না।

তখন রাজা হঠাৎ করে নীরবতা ভেঙে বয়স্ক কয়েকজনকে সম্বোধন করে বললেন —ওই মিয়ারা শোনো, এই দুই বদমাশকে ধরে দেউড়ি ঘরে আটকে রাখো। এরা আমাদের পবিত্র আইন ভঙ্গ করছে। তার আগে তাদের জামাকাপড় খুলে নাও। শুধু মেয়েটার পরনে একটা কাপড় থাকবে। কাল সকালে আমি ওদের কথা শুনবো আবার। আজকে যথেষ্ট হলো, আর না।’

অতঃপর সেই তরুণ দম্পতিকে শুধু এক কাপড়ে ওই খালি দেউড়ি ঘরটাতে আটকে রাখা হলো।

সে রাতটা কেমন ঠান্ডা ছিল আমি হাড়ে হাড়ে জানি। আমি মোটা কম্বল আগাগোড়া মুড়ি দিয়েও শীতে কাঁপছিলাম। রাজার কুটবুদ্ধির বিচারে আমি রীতিমতো মুগ্ধ।

পরদিন সকালবেলা যখন দরজা খুলে তাদের জামাকাপড় ফেরত দেওয়া হলো। তারপর তাদের যখন রাজার সামনে হাজির হতে বলা হলো, তখন তারা লজ্জায় রাজার সামনে না এসে দুজন দুজনের হাত ধরাধরি করে চুপচাপ নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেল।

তবে সব প্রেমের গল্প এত সুন্দর পরিণতি বহন করে না। আমার কাছে প্রেমঘটিত একটা মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মামলাও এসেছিল।

ভুপিয়া নামের এক চাকমা তরুণ তার গ্রামের একটা মেয়েকে ভালোবাসত। মেয়েটার নাম ছিল সোনিয়ামালা। মেয়েটার মা ছিল না। বাবা আর ভাইয়ের সাথে থাকত। তার ভাইয়ের নাম হীরাধন। ভুপিয়া ছেলেবেলা থেকে মেয়েটাকে পছন্দ করত। মেয়েটাও তাকে পছন্দ করত। দুজন একসাথে ঘোরাফেরা করে। সে মেয়েটার জন্য হেন কিছু নাই করে না। যে কোনো প্রেমিকই সেটা করে। মেয়েটাকে ঝরনা থেকে পানি তুলে দেওয়া, গাছ থেকে লাকড়ি পেড়ে দেওয়া, মেয়েটাকে গাছ থেকে নামতে সাহায্য করা। সবকিছুই করে। কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত দরিদ্র সোনিয়ামালাকে বিয়ে করার জন্য পণ বাবদ ৪০ রুপি জোগাড় করা সম্ভব না হওয়ায় তার আশা পূরণ হয় না। ওই টাকা ছাড়া সোনিয়ার বাবা মেয়ে বিয়ে দেবে না।

দুবছর ধরে টাকা জোগাড় করার ব্যর্থ চেষ্টার পর সে একদিন সোনিয়াকে বলল তার সাথে পালিয়ে যেতে। সেটাই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। ঘটনাটা সম্পর্কে তার ভাই হীরাধন যে জবানবন্দি দিয়েছিল সেটা এরকম-

গত শুক্রবার আমি কাজ থেকে ফেরার পর আমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোর বোন কোথায়? সে যে পানি আনতে গেল ঝরনা থেকে এখনো ফিরে আসে নাই। দেখ তো ভুপিয়া ব্যাটা কোথায়, তার সাথেই তো ঘোরাঘুরি করে সবসময়। সে হয়তো জানবে কোথায় আছে। যদি তাকেও পাওয়া না যায় তা হলে বুঝতে হবে তার সাথে ভেগে গেছে।’

আমি তাকে খোঁজার জন্য ঝরনার কাছে গেলাম। কিন্তু ওখানে সে নেই। তারপর আমি কিছু জোয়ান মর্দকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজতে বের হলাম। আমরা নিঃশব্দে দ্রুত পথ চলতে চলতে একসময় উপত্যকার দিকে তাদের দুজনকে দেখতে পেলাম। ভুপিয়া আগে আগে চলছে, তার হাত ধরে আমার বোন ছুটছে। দুজনই খুব ফুর্তিতে আছে বোঝা যায়। সে কারণে আমাদের পদশব্দ টের পেল না। আমি রাগের চোটে ছুটে গিয়ে দায়ের কোপে ভুপিয়াকে শুইয়ে ফেললাম। তার পাশে শুইয়ে আমার বোনকেও কেটে ফেললাম। মারা যাওয়ার আগে বোনটা বলে উঠছিল—’ওহ ভাইয়া!’ দুজনই সাথে সাথে মারা গেল। তারপর আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে চলে এলাম।

এখানকার রীতি হলো কোনো তরুণ যুগল পালিয়ে যাওয়ার পর যদি ধরা পড়ে তা হলে তাদের বিচারের সম্মুখীন করা হয়। মেয়েটার কাছে জানতে চাওয়া হয় সে কী স্বেচ্ছায় গেছে কি না। যদি আপসে পালিয়ে থাকে তা হলে ব্যাপারটা টাকাপয়সা দিয়ে মিটমাট করে ফেলা হয়। যদি দেখা যায় ছেলেটার কোনো টাকাপয়সা নেই কিংবা সে সদাচরণ করেনি, তা হলে তাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করা হয়। কিন্তু খুন করার মতো ঘটনা ঘটে না। হীরাধন যেটা করেছে সেটা প্রচলিত রীতির একদম বাইরে। নিজের রাগ দমন করতে না পেরে সে খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে। বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের নতুন শাসন জারির পর থেকে লোকজন ক্রমবর্ধমান হারে বিচারের জন্য আমার কোর্টে আসতে থাকে। ছোটখাটো সামাজিক ঘটনা, বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা পারিবারিক কলহ ইত্যাদি আমি গ্রামের স্থানীয় মোড়লের কাছে পাঠিয়ে দেই। যদি বড় কোনো ঘটনা ঘটে তখন আমার কোর্টে বিচার করি

৩৪. জুম চাষের অভিজ্ঞতা

জুম চাষ নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা লাগে। এক গ্রাম অন্য গ্রামের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে—যদি দুই গায়ের লোক একই জায়গা নির্বাচন করে জুম চাষের জন্য। জুমের কাজের প্রস্তুতি শুরু হয় মে মাস থেকে। সেই সময়ে বেশুমার জঙ্গল পোড়ানোর ফলে আকাশ প্রায়শই কালো হয়ে থাকে।

জুম চাষের এই সংস্কৃতি হিমালয় থেকে শ্যামদেশ পর্যন্ত সকল পার্বত্য উপজাতির মধ্যে বিদ্যমান। পাহাড়ের মধ্যে আলো হাওয়া খেলে তেমন একটা জায়গা বেছে নেওয়া হয় আবাদের জন্য। প্রথমে ছোটখাটো গাছগুলো কেটে ফেলা হয়। বড় বড় গাছগুলো শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। সেগুলো কাটার জন্য আলাদা লোকবল লাগে। সাধারণত বাঁশঝাড়ে পরিপূর্ণ এলাকা জুম চাষের জন্য বাছাই করা হয়। কারণ বাঁশের ছাই দিয়ে ভালো সার উৎপন্ন হয়। পরিষ্কার করতেও সুবিধা।

সব ঝোপজঙ্গল কাটার পর খোলা আকাশের নিচে জমিয়ে রেখে শুকানো হয়। তারপর সেখানে আগুন দেওয়া হয়। জুমখেত ঘিরে গ্রামবাসীরা লম্বা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আগুন সীমানার বাইরে যেতে চাইলে পিটিয়ে নিভিয়ে দেয় যেন বাইরের জঙ্গলে ছড়াতে না পারে। কিন্তু যদি জোরালো হাওয়া বয়, তা হলে মহা বিপদের আশঙ্কা থাকে। দাবানলে পরিণত হতে পারে সে আগুন।

আগুন লাগানোর পর সবকিছু পরিষ্কার করা হয়ে গেলে লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়ি দিয়ে চারদিকে বেড়ার মতো তৈরি করা হয় যেন বন্য জন্তুরা খেতের মধ্যে আগ্রাসন চালাতে না পারে। এরপর আর কোনো কাজ নেই। শুধু বৃষ্টি আসার অপেক্ষা। আকাশে কালো মেঘ দেখলে প্রত্যেক গ্রাম খালি হয়ে যায়। জোয়ান বুড়ো নারী-পুরুষ সবাই জুম চাষের জন্য পাহাড়ে উঠে যায়। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটা দা আর বাঁশের ঝুড়ি ঝুড়ির মধ্যে ধান, তুলা, ভুট্টা, শসা ইত্যাদির বীজ থাকে।

তারপর যখন বজ্রপাতের গর্জনের সাথে আকাশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নেমে আসে, ঠান্ডা শীতল ভিজে হাওয়া এসে গায়ে লাগে। জামাকাপড় ভেদ করে শরীরের ভেতরে স্পর্শ করে। তখন সবাই হোইয়া হোইয়া বলে চিৎকার করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রবল উৎসাহে।

কাজ কাজ কাজ! ভিজতে ভিজতেই সব কাজ করতে হবে। এখানে একটা কুসংস্কার আছে। এই দিন যে লোক ভালোমতন বৃষ্টিতে ভিজবে না, সে ভালোভাবে বীজ ৰপন করতে পারবে না, সে হলো দুর্ভাগা। বীজ বপন করা সহজ কাজ। প্রথমে দায়ের কোনা দিয়ে একটা গর্ত করা, তারপর সেই গর্তে বীজ ছড়িয়ে মাটি চাপা দেওয়া। এটুকুই কাজ মাত্র।

বীজ বোনা শেষ হলে সেখানে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করা হয়। যখন ফসলের কচি কচি চারাগুলো বেড়ে উঠতে থাকে, তখন বনের জীবজন্তুদের কচি চারা খেয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে। সে জন্যই এই পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রাতের বেলা সেই ঘরে থেকে পাহারা দেওয়ার কাজটা চালানো হয়। ওটা হলো জুমঘর।

পাহাড়িদের কাছে দা জিনিসটা সব কাজের কাজি। এটা ঘরেবাইরে সব ধরনের কাজে সাহায্য করে। ফলমূল কাটা, বাড়িঘর তৈরি করা, খেতখামার তৈরি করা সব ক্ষেত্রে দায়ের ব্যবহার অতুলনীয়। এটা সাধারণ প্রশস্ত ভোঁতা একটা ছুরির মতো। লম্বা দেড় ফুটের মতো, প্রস্থ দুই ইঞ্চি। আকারে চৌকোনা। হাতলের দিকটা সরু। হাতলটা ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের কাঠের তৈরি। এটার কোনো খাপ থাকে না, খোলা অবস্থাতেই বহন করা হয়।

যুদ্ধের কাজে লাগানো হয় সেরকম এক জাতের পা আছে, সেও একই রকম দেখতে। তবে দীর্ঘতর এবং ওটার খাপ থাকে। চাষাবাদের যন্ত্রপাতির মতো ওটা একটু অদ্ভুত রকমের বাঁকানো। ওটা দিয়ে দুই রকমের কোপ দেওয়া সম্ভব। ডান কাঁধের ওপর হাত তুলে প্রতিপক্ষের বাম পায়ে একবার, আবার বাম কাঁধ থেকে ডান পায়ে আরেকবার। এভাবেই লড়াই করে ওরা। তবে কোনো ইউরোপিয়ানের অদক্ষ হাতে ওটার ব্যবহার বিপজ্জনক। তারা নিজেরা নিজেকে আহত করে ফেলতে পারে। পাহাড়িদের কাছে ওই অস্ত্র সাবলীলভাবে ব্যবহৃত হয়। ওটাই তাদের শক্তির উৎস।

জুমঘর পুরোপুরি বাঁশের তৈরি হয়। চারদিকে চারটা গাছের কাণ্ড দিয়ে বর্গাকৃতি মেঝে প্রস্তুত করা হয়। মেঝের ওপর মাটি ভরিয়ে তার ওপর কাদামাটি লেপে মসৃণ করা হয়। তার ওপর আগুন জ্বেলে পূজা দেওয়া হয় প্রকৃতিদেবীর উদ্দেশ্যে যিনি তাদের ফসলকে সুরক্ষা দেবেন, যে কোনো অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন।

৩৫. আরাকানি জাদুকর

‘খিয়ংথা গোত্রের লোকেরা মেয়েদের মতো চুল বাঁধে কেন? কেমন অদ্ভুত বেণি করে ঘাড়ে পেঁচিয়ে রাখে।’

জানতে চাইলাম বোমাং রাজার কাছে। আমি নতুন বোমাং রাজা মোমপ্রুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যার ভাই তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে

দাঁড়িয়েছিল। তার সাথে আমার বেশ ভালো বন্ধুতা তৈরি হয়েছে।

বেণির রহস্যটা খোলাসা করার জন্য তিনি আমার কাছে একটা কিংবদন্তির গল্প শোনালেন-

আমাদের গোত্র এসেছে আরাকান থেকে, বহুকাল আগে। ইংরেজ সাহেবদের আগমনেরও অনেক আগে। যখন মোগলরা চট্টগ্রাম শাসন করত। আমার পূর্বপুরুষেরা কালাদান নদীর তীরে বসবাস করত আরাকান রাজের অধীনে। একবার বার্মার রাজার সাথে আরাকানের রাজার গোলমাল বাধে। তখন বার্মার রাজা আরাকানের রাজাকে কাবু করার জন্য উপায় খুঁজতে থাকেন। দেশের জ্ঞানী-গুণীদের ডেকে বলেন আরাকানের রাজাকে ধরাশায়ী করার একটা পথ খুঁজে বের করার জন্য।

তখন এক বার্মিজ জাদুকর বলল, সে আরাকানের রাজাকে কাবু করার ব্যবস্থা করবে যদি বার্মার রাজা তাকে অনুমতি দেন। রাজা অনুমতি দিলেন। সেই জাদুকর আরাকানে গিয়ে উপস্থিত হলো রাজার সামনে। বলল, সে বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে রাজার অত্যাচারে। রাজা তাকে বলেছে পুরো শহরটাকে জাদুবলে সোনায় মুড়িয়ে দিতে। তার সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু বার্মার রাজা দুষ্টুলোক। সে কারণে সে রাজি হয়নি। পালিয়ে চলে এসেছে। যদি আরাকানের রাজা তাকে আশ্রয় দেয় তা হলে সে বাঁচতে পারবে। তার দুরবস্থা শুনে আরাকানের রাজার দয়া হলো। তিনি তাকে একটা বাড়ি দিয়ে বললেন ওখানে বসবাস করার জন্য।

কিছুদিন পর সেই উদ্ভট জাদুকরকে আরাকানের রাজা বললেন, সে তার জাদু দিয়ে আরাকানের রাজধানীকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে পারবে কি না। জাদুকর বলল নিশ্চয়ই পারব। সে পরামর্শ দিল, রাজবাড়িকে মজবুত করার জন্য প্রথমে ওটা ভেঙে ফেলতে হবে। তারপর ওই জায়গায় মন্ত্রপূত ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। রাজা তাতে সম্মত হয়ে তাঁর অতি মজবুত রাজপ্রসাদ ভেঙে ধুলায় মিশিয়ে দিলেন।

তারপর সে অদ্ভুত কিছু রীতিনীতি চালু করল। রাজার দাঁতকে মসৃণ করল, সবার চামচের আকৃতি বদলে দিল, সবাইকে চুল বেণি করে ঘাড়ের মধ্যে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিল। এসব করার পর সে ঘোষণা করল এবার সে রাজার বাড়ির জন্য মন্ত্রপূত ভিত্তি স্থাপনের কাজ করবে। সেজন্য তাকে কয়েকদিন একা থাকতে হবে। তার কাজ শেষ না হওয়া অবধি তাকে বিরক্ত করা চলবে না। সে কিছু চাল আর পানি নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। চালগুলো একটা পাত্রে রেখে তার ওপর মন্ত্রপূত পানি ছিটিয়ে দিল।

তারপর সে রাতেই চুপিচুপি ঘর থেকে বের হয়ে পালিয়ে বার্মা চলে গেল।

ওদিকে আরাকানের রাজা কয়েকদিন পর তার সঙ্গীদের বললেন জাদুকরের খবর নিতে। সে এতদিন চুপচাপ ঘরের ভেতর বসে কী করছে?

রাজকর্মচারীরা তখন ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল সেখানে কেউ নেই। সেই চাল আর পানি তেমনিই পড়ে আছে। ওগুলো কেউ ছোঁয়নি।

রাজার কাছে এ খবর যেতেই তিনি বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেন। সেই সময়েই একটা হৈ চৈ শোনা গেল। বার্মার রাজা আরাকান আক্রমণ করেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাজাকে হত্যা করে তার পরিবারকে বন্দি করে দেশটা দখল করে নিল।

সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষ পালিয়ে এদিকের পাহাড়ে চলে আসে। এখানেই আমাদের বসতি গড়ে ওঠে। পালিয়ে আসা পূর্বপুরুষেরা ছিল কাপুরুষ। তারা সেই জাদুকরের প্রভাবে চুলকে ঘাড়ের ওপর বেণি করে বেঁধে রাখার রীতি চালু রাখে: যা এখনো বহাল আছে।

বোমাং চিফের কথা শুনে আমি বললাম, ‘কিন্তু এভাবে চুল বেঁধে রাখাটা কেমন অদ্ভুত লাগে। আমার মতো কেটে ছোট করে ফেলেন না কেন? চুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও মুশকিল।

বোমাং চিফ বললেন, ‘আমার গোত্রের লোকেরা কখনো চুল কাটে না। যার ফলে চুল পরিষ্কার করা যায় না, তার ওপর চুলের মধ্যে উকুনের উৎপাত আছে। সেটাও হয়েছে অভিশপ্ত জাদুকরের কারণে। আরাকানে আসার কিছুদিন পর একদিন বার্মার রাজার মাথা চুলকাচ্ছিল। তিনি তার বড় বউকে ডেকে বললেন, দেখো তো আমার মাথায় কী হয়েছে। এমন করে চুলকাচ্ছে যেন একপাল শেয়াল ওখানে খামচাখামচি করছে। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানোর পর দেখা গেল ছোট ছোট কতগুলো পোকা। যেগুলো আগে কখনো দেখা যায়নি এ অঞ্চলে। রাজা তার প্রধান উজিরকে ডেকে খবর নিতে বললেন এই পোকা কোথা থেকে এলো। দেশের সকল বৈদ্য আর জ্যোতিষী গণনা করেও কোনো সুরাহা করতে পারল না। তখন রাজা একটা সোনার বাক্সের মধ্যে সেই পোকাকে ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। তারপর সেই বাক্সটা রাজবাড়ির সিঁড়ির ওপর ঝুলিয়ে রেখে ঘোষণা করলেন কেউ যদি এই পোকা কোথা থেকে এলো তার রহস্য ভেদ করতে পারে তা হলে তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং নিজের কন্যার সাথে বিয়ে দেবেন।

এই ঘোষণার পর সেই জাদুকর বলল, আমি একজনকে ডেকে আনতে পারি, যার কাছে এই রহস্যের সমাধান আছে। সে তখন ওখানকার এক রাক্ষসকে খবর দিল। সে রাক্ষস ভয়ানক এক জিনিস। দুনিয়ার অন্য প্রান্তে তার বসবাস। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তার মৃত্যু নেই। সে মানুষের ছদ্মবেশে রাজার কাছে এসে হাজির হলো। এসে বলল, ‘এই পোকার নাম থিন। এটা বার্মা থেকে এসেছে। বার্মা আর চট্টগ্রামের মধ্যে যারা ব্যবসা করে সেই বণিকদের মাধ্যমে এটা ছড়িয়েছে। রাজা খবর নিয়ে জানলেন বার্মা থেকে এক বাঙালি ব্যবসায়ী এসেছিল জাদুকরের সাথে। রাজা তাকে আটক করার হুকুম

দিলেন। তার মাথা পরীক্ষা করে এরকম পোকার সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে বন্দি করে রাখা হলো।

তারপর মানুষরূপী রাক্ষস পুরস্কার হিসেবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করল। কিছুদিন পর সে নিজ দেশে ফেরার অনুমতি চাইল। তখন রাজকন্যাকে অনেক সোনারুপার অলংকারে সাজিয়ে বিদায় দেওয়া হলো। সোনারুপার প্রতি রাক্ষসের মন নেই। সে এখন মানুষের মাংস খেতে চায়। অনেকদিন মানুষের মাংস খায়নি। রাজার পক্ষ থেকে তাদের সাথে বেশ কিছু প্রহরী দেওয়া হয়েছিল। প্রতিদিন তারা যখন যাত্রাবিরতি করে তখন রাক্ষস দুজন করে প্রহরীকে সাথে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে যায়। কিন্তু ফিরে আসে একা। রাজকন্যাকে বলে ওই দুজন হারিয়ে গেছে কিংবা বন্য-জন্তুর পেটে গেছে। প্রতিদিন এভাবে প্রহরীর সংখ্যা কমতে কমতে শেষ দুজন অবশিষ্ট থাকে। রাজকন্যা এবার একটু আতঙ্কিত হয়। পরদিন রাক্ষস যখন শেষ দুই প্রহরীকে নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে তখন রাজকন্যা তাদের পিছু নেয়। পিছু পিছু গিয়ে দেখতে পেল রাক্ষসের কাণ্ড। তখন সে বুঝে যায় এরপর তার পালা আসবে। সে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে আসে তাঁবুর মধ্যে।

তাঁবুতে ফিরে এসে তাঁর মায়ের দেওয়া বুদ্ধের একটা ছবি হাতে নিয়ে প্রার্থনা করতে থাকে—প্রভু আমি যদি জীবনে তোমার নির্দেশের একটাও পালন করতে পারি, তুমি আমাকে রক্ষা করো। আমাকে আমার বাবার দেওয়া প্রদীপের ভেতর ঢুকিয়ে দাও ছোট করে রাক্ষস যখন তাঁবুর ভেতরে ঢুকছিল তখনই রাজকন্যা একদম ছোট হয়ে প্রদীপের ভেতরে লুকিয়ে গেল। রাক্ষস এসে রক্তাক্ত হাতে প্রদীপটা নিয়ে আছাড় দিয়ে ফেলে রাজকন্যাকে ধরতে চাইল। কিন্তু লাভ হলো না। পরে রেগে গিয়ে প্রদীপটাকে ছাড়ে ফেলে দিল খরস্রোতা নদীতে। সেই নদীর অন্য প্রান্তে মাছ ধরছিল এক রাজপুত্র। তার জালে আটকা পড়ে প্রদীপটা। দেখে সুন্দর লাগছিল বলে প্রদীপটা বাড়িতে নিয়ে যায়। নিজের ঘরে ঝুলিয়ে রাখে।

প্রত্যেক রাতে রাজপুত্র ঘুমিয়ে পড়লে রাজকন্যা প্রদীপ থেকে বের হয়ে আসে। রাজপুত্রের ঘরদোর সুন্দর করে গুছিয়ে দেয়। তারপর সকাল হওয়ার আগে প্রদীপের ভেতর ঢুকে পড়ে। রাজপুত্র প্রতিদিন অবাক হয়। কে তার ঘর এমন সুন্দর করে গুছিয়ে দেয় প্রতি রাতে? একদিন রাজপুত্র ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকল। তারপর যেই রাজকন্যা বেরিয়ে এসে কাজ করতে শুরু করেছে, তখন রাজপুত্র তার হাত ধরে ফেলল। রাজকন্যাকে আর ফিরতে দিল না প্রদীপের মধ্যে।

তারপর দুজনে বিয়ে করে সুখে জীবনযাপন করতে থাকল। কিন্তু সেই দুষ্টু জাদুকরের অনুসারীরা উকুনগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে সর্বত্র। এমনকি অপদার্থ বাঙালিরা চলে যাওয়ার পরও এই ছড়ানো থামেনি।’

৩৬. মং রাজার আতিথ্যে

বান্দরবানে বোমাং রাজার বাড়িতে আমার আনন্দময় ভ্রমণ শেষে আমি ভাবলাম মং রাজার বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার যিনি আমার শোবার ঘরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন বুদ্ধের পবিত্র প্রতিকৃতির মাধ্যমে। তিনি আমাকে তাঁর পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি সারাদিন ধরে খালি পায়ে হেঁটে পাহাড়িদের পোশাক পরে ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছালাম।

মানিকছড়িতে রাজার বাড়িতে পৌছানোর পর আমাকে রাজার বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটিতে থাকতে দেওয়া হলো। এই ঘরটি সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কাজ কিংবা কোনো বিশেষ সম্মেলনের জন্য ব্যবহার করা হয়। রাজবাড়ির মধ্যে এরকম একটা ঘরে থাকার সুযোগ পাওয়া বিরল একটা সম্মান। বিশেষ করে একজন ইংরেজের জন্য। আর কোনো ইংরেজ পার্বত্য রাজপরিবারে এতটা আনুকূল্য পায়নি। আমার আগের ভ্রমণে এখানে এসে আমি ছোট্ট একটা তাঁবুতে রাত কাটিয়েছিলাম।

সান্ধ্যকালীন আসরে আমি দেশীয় পোশাক পরে পা দুটো ভাঁজ করে মাদুরের ওপর বসলাম। আমি যতদূর পারি এদের পোশাক-আশাক বা রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু কিছু রীতি মোটেও সুখকর ছিল না। কিছু বিষয় আমার কাছে খুব বিরক্তিকর মনে হতো। যেমন রাতের খাবার সময় হলে রানি আমার সম্মানে নিজের হাতে রান্না করা খাবার নিয়ে এলেন। খাবার পরিবেশনের পর তিনি আমাকে এটা ওটা খাবার জন্য জোরাজুরি করতে লাগলেন। তাঁর সরু হাত দিয়ে তিনি বিশেষভাবে প্রস্তুত কিছু খাবার আমার পাতে তুলে দিচ্ছিলেন।

আমি সাহসিকতার সাথে বিচিত্র উপায়ে রান্না করা আখের উপরিভাগ, কচি বাঁশের মূল ইত্যাদি খাবার গলধঃকরণ করার পর সহৃদয়া রাজ গৃহিণী মুখে বিগলিত হাসি ছড়িয়ে ছোট একটা পেতলের পাত্র হাতে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

পাত্রটি আমার সামনে রাখার পর দেখলাম ওটার মধ্যে চারটা বড় বড় সাদা রঙের ওয়াপোকা উত্তমরূপে ভেজে আনা হয়েছে। গৃহিণী একটা পোকা দু আঙুলে ধরে আমার মুখে তুলে খাইয়ে দিলেন। আমি জোর করে মুখে হাসি ধরে রেখে পোকাটা মুখে নিয়ে খাবার চেষ্টা করলাম। তাঁকে দেখানোর চেষ্টা করলাম আমি খাবারটা উপভোগ করছি।

কিন্তু চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠল, আমার সমস্ত শরীর বিদ্রোহ করে জিনিসটাকে সহ্য করার প্রাণপণ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার উপক্রম করল। ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় আমি তখনই ক্ষান্ত দিলাম আহারে। ওই পোকাগুলো বড় বড় মৃত গাছের গুঁড়িতে জন্মায়। এখানকার লোকদের কাছে এটা অতি প্রিয় একটা খাবার।

ফেরার সময় রাজার অনুরোধে আমি তার ছোট ছেলে নারাবাদিকে আমার সঙ্গে নিয়ে চললাম। তিনি ছেলেটাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন আমি যেন তার দেখাশোনা করি, তাকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করি। আমি রাজাকে কথা দিলাম, আমি তাকে দেখেশুনে রাখব শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করব।

ছেলেটাকে নিয়ে মানিকছড়ি ত্যাগ করে শহরের পথে চললাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা হালদা নদীর তীরে এসে পৌঁছালাম। এটা কর্ণফুলী নদীর একটা শাখা। এখানে আমার নৌকা বাঁধা আছে। আমরা নৌকায় উঠে ধীরে ধীরে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চললাম বড় নদীটার কাছে।

সন্ধ্যাটা খুব চমত্কার ছিল। আমি নৌকার ছাদের ওপর একটা মাদুরে শুয়ে শুয়ে ধূমপান করছিলাম আর নারাবাদির সাথে গল্প করতে করতে চারপাশের মনোরম দৃশ্যাবলি আর শীতল হাওয়ার পরশ উপভোগ করছিলাম। আমার বেয়ারা সোনারতন আমাকে এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা এনে দিল পাইপে দেওয়ার জন্য। ওটা দিতে গিয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। সে তার মাথার পাগড়ি খুলে নত হয়ে কুর্নিশ করল হঠাৎ করে।

আমি বললাম, ‘ব্যাপার কী সোনারতন?’

সে বলল, ‘ওটা একটা নতুন চাঁদ সাহেব। নতুন চাঁদ উঠলে সেটাকে সেলাম দিতে হয়। যে সেলাম দেবে ওটা তার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে। এখানকার আদিবাসিন্দাদের এই কুসংস্কারগুলো আমার কাছে কৌতূহলের বিষয় ছিল। আমি সন্ধ্যার নীলাভ ধূসর আকাশে ঝকঝক করতে থাকা নতুন চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম আমার কী চাওয়ার আছে। আমার তো ক্ষমতা, চাকরি, টাকাপয়সা কিছুর অভাব নাই। আমি কী চাইতে পারি? হঠাৎ মনে হলো আমি আমার সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করতে পারি যাতে আমি আমার আগামীদিনের কর্মগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারি।

ওখান থেকে ফেরার পর অফিসের জন্য কিছু ইংরেজি শিক্ষিত কর্মচারী আনতে আমাকে আকিয়াব যেতে হয়েছিল। এখানকার বাঙালি বাবুরা আমার বিরুদ্ধে পিটিশন করে ব্যর্থ হওয়ার পর সবাই দলবদ্ধভাবে পদত্যাগ করে চলে গেছে। তাই আমাকে নতুন কর্মচারী আমদানি করতে হবে আকিয়াব থেকে। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তাদের কারণে আরাকানেও কিছু ইংরেজি শিক্ষিত লোক হয়েছে। আমি আরাকানি পার্বত্য এলাকার সুপারিনটেনডেন্টের সাথেও দেখা করব। সীমান্ত রক্ষার তাগিদে যৌথভাবে কাজ করার জন্য যাতে পুলিশের টহল বাড়ানো যায়।

চট্টগ্রাম থেকে স্টিমারযোগে আকিয়াব গেলাম। সেখানে গিয়ে আমার পুরনো কমরেড মেজর এমের সাথে দেখা করলাম। তার পোষা কুকুরটির সাথেও দেখা হলো যাকে আমরা সেন্দুদের এলাকায় খিদের জ্বালায় প্রায় খেয়েই ফেলছিলাম।

আমার সব কাজ সেরে, কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করে উপকূল ধরে স্থলপথ দিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। ফেরার পথে হঠাৎ করে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। আমাদের যেহেতু নদী আর জলাভূমি পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম দেশি লোকদের কায়দায় খালি পায়ে হেঁটে যাব। আমি এটাতে মোটামুটি অভ্যস্ত ছিলাম। আমার ইংলিশ বুট বাদ দিয়ে খালিপায়ে হাঁটা শুরু করাতে প্রথমে খানিক সমস্যা হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর অবশ্য কাটিয়ে উঠলাম।

আমার সাথে মং রাজার ছেলে নারাবাদিও ছিল আর ছিল আমার ভৃত্য সোনারত ও আরেকটা ছেলে। আমাদের পথ গিয়েছে মূলত সমুদ্র তীর ঘেঁষে সৈকতের সাদা বালির ওপর দিয়ে। মাইলের পর মাইল এই সৈকত চলে গেছে ঝাউগাছের সারি বুকে নিয়ে। রাতের বেলা আমরা কোনো স্থানীয় বাড়িতে আশ্রয় নিতাম। কিন্তু দিনের বেলা মাইলের পর মাইল সমতল বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে চলা খুব একঘেয়ে ব্যাপার ছিল। বিশেষ করে আমরা খুব চমৎকার কিছু পার্বত্য এলাকা ভ্রমণ করে এসেছি বলে এগুলো আমাদের কাছে মোটেও আকর্ষণীয় ছিল না। তিনদিনে চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে যখন আমরা কক্সবাজারে পৌঁছালাম আমার পা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। চামড়া ফেটে গেছে নানান জায়গায়। গরমে ফোস্কা পড়ে গেছে রীতিমতো। তাই কক্সবাজারে যখন আমরা একটা নৌকা ভাড়া পেলাম সেটা নিয়েই বাকি পথ পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে এলাম।

চন্দ্রঘোনা ফেরার পর আমি বিস্ময়ের সাথে দেখলাম যে ইংল্যান্ড থেকে আসা দুটো বড় বড় উপহারের বাক্স আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার পাহাড়ি বন্ধুরাও ওটা দেখে খুব উৎসাহিত বোধ করল। সবাই বাড়ির চারপাশে ভিড় করল ভেতরে কী আছে দেখার জন্য। আমি তাদের সামনেই বাক্সগুলো খুলতে শুরু করলাম এক এক করে। প্রত্যেকটা জিনিস তাদের কাছে দারুণ রহস্যময়। আমি প্রথমে দুতিনটা দুধের বোতল খুলে সবাই মিলে ভাগ করে খেলাম। আমার মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রার্থনা করলাম যিনি এই উপহারগুলো আমার জন্য পাঠিয়েছেন।

চাকমা দেওয়ান ঈশান চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন তখন। তাঁকে এক টিন বেকন আর এক বৈয়াম জ্যাম দিলে তিনি সেটা অতি আনন্দিতচিত্তে গ্রহণ করেন। আমার পুলিশ প্রধান ডি রোজারিওকে একটা মাছের টিন দিলাম। নারাবাদিকে দেওয়া হলো কিছু চিনি দেওয়া বার্লি আর হরিণের খুরের একটা চুরুট হোল্ডার। সে উপহার পেয়ে আমার মায়ের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করল নিজস্ব ভাষায়।

নিজ দেশ ছেড়ে বাংলায় আসার পর যে কোনো ইংরেজ অনুভব করে যে সে একটা ভিন দেশে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, পাহাড়িদের মধ্যে থাকলে সেরকম কিছু মনে হয় না। মনে হয় যেন নিজেদের লোকের কাছে আছি। এই পাহাড়ি অঞ্চলে আমি যেখানেই গেছি সেখানেই সবার কাছ থেকে

চমৎকার আতিথেয়তা পেয়েছি। বিনিময়ে আমিও তাদের জন্য আমার ঘরের দরজা সবসময় খোলা রেখেছি যাতে তারা যে কোনো সময় আমার সাথে দেখা করতে পারে।

আমি আমার সমস্ত অবসর সময়কে কাজে লাগালাম এখানকার ভাষা শেখার জন্য। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে দোভাষীর মাধ্যমে এদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা কঠিন। অতএব এদের চিন্তাভাবনা আর রীতিনীতি বোঝার জন্য ভাষা শেখার কোনো বিকল্প নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে চারটা ভাষা চালু আছে। যার একটা হলো বার্মিজ, যেটার সাথে আমি ভালোভাবে পরিচিত ছিলাম। পাহাড়ে আসার আগেই আমি বাংলা ভাষা শিখেছিলাম। চাকমা ভাষায়ও আমি পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু টিপরা আর লুসাই ভাষা ছিল একদম আলাদা। সেগুলো শেখা একটু কঠিন।

আমার একটা বড় স্বস্তি ছিল যে আমি আমার দফতরে বাঙালি বাবুদের সরিয়ে দিয়ে বার্মিজ কেরানিদের নিয়োগ দিয়েছিলাম। তারা পাহাড়িদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিল। তাছাড়া তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত ছিল বলে বিচারকাজ করা অনেকটা সহজ হয়েছে।

লুসাই জাতির সন্ধানে

৩৭. স্বাধীনচেতা লুসাই জাতি

১৮৬৭ সালের শেষ দিকে সীমান্ত এলাকা খুব অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আমার কাছে যে লোকবল ছিল তাদের নিয়ে কাসালং সীমান্তে গিয়ে ঘাঁটি করলাম। সেটা যথেষ্ট ছিল না। আমি অনুভব করতে শুরু করছিলাম সীমান্তের উপজাতিগুলোর মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলো ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এগুলো দমন করার জন্য আগে বা পরে সরকারকে আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক দুই ভাবেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

হিংস্র আর নিষ্ঠুর লুসাই জাতির লোকেরা আমাদের শান্তিপূর্ণ নীতিকে দুর্বলতা কিংবা ভয়ের লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছে। তাই মনে হচ্ছে পাল্টা আঘাত না করলে তারা নিরস্ত হবে না। একমাত্র রতন পুইয়া তার গোত্র নিয়ে আমাদের পক্ষে আছে। সে আমাদের সম্ভাব্য লুসাই আক্রমণ সম্পর্কে গোপনে সংবাদ দিয়ে সাহায্য করে।

কাসালং অবস্থানকালে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম লুসাইদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। যেসব লুসাই অবাধে আমাদের এলাকার বাজারহাটে আসে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে লুসাইদের ভাষা এবং রীতিনীতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম।

লুসাইরা দেখতে অনেকাংশে আমাদের দেশের পার্বত্যবাসীদের মতো। গোত্রপ্রধানরা মাথায় লাল আর নীল রঙের পাগড়ি পরে। তাদের বাদ্যযন্ত্র দেখতে আমাদের ব্যাগপাইপের মতো। পানি বহন করার জন্য চামড়ার খোলের বদলে লাউয়ের খোল ব্যবহার করে। ওরাও নানান উপদলে বিভক্ত এবং একদল অন্য দলের সাথে লড়াই করে টিকে থাকে। তাদের মদও অনেকটা আমাদের পার্বত্যবাসীদের হুইস্কির মতো।

অতীতে তাদের নেতা নির্বাচিত হতো প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অভিজাত বংশ থেকে। কিন্তু আজকাল নেতার ছেলে নেতা হতে পারে না। তাকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। তার মধ্যে বহুবিধ গুণাবলি থাকতে হবে এবং যুদ্ধশৈলীতে পারদর্শী হতে হবে। নেতাকে সবসময় আক্রমণে সবার সামনে থাকতে হবে, পালাবার সময় সবার পেছনে থাকতে হবে।

রতন পুইয়ার গ্রামের একটা ঘটনার কথা মনে আছে। একবার আমি তাদের গ্রামে রতন পুইয়ার সাথে কথা বলছিলাম, তখন কোথা থেকে এক হদ্দ মাতাল এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কিন্তু রতন পুইয়া তাকে তিরস্কার করা দূরে

থাকুক, একটা কথাও বলল না। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে পাগড়িটা মাটি থেকে কুড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে মাথায় বসিয়ে দিল।

আমি বললাম, 'এটা কেমন ব্যাপার হলো? তুমি তোমার অনুসারীদের বেয়াদবির জন্য শাস্তি দাও না?'

সে রীতিমতো আঁতকে উঠে বলল, 'বেয়াদবি? কী বলছেন সাহেব? সে একটা বদ্ধ মাতাল। তার কোনো হুঁশ নাই। সে কী করেছে নিজেই জানে না। ওটার কথা বাদ দিলে গ্রামে আমরা সবাই সমান। কিন্তু যখন যুদ্ধে যাই তখন সে যদি আমার কথা অমান্য করে সেটার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান আছে। এখানে সে নিজের বাড়িতে আছে। ওসবের কোনো বালাই নাই। যে কোনো লোক চিফের বাড়িতে ঢুকে যে কোনো জিনিস নিয়ে আসতে পারে। তাদের কথা হলো- তিনি হলেন আমাদের চিফ। তিনি আরো অনেক উপহার পাবেন। আমাদের কাছে যা আছে সেগুলোও তাঁরই। অতএব তাঁর যা আছে সেগুলোও আমাদের। চিফ যদি আমাদের না দেয় তা হলে আর কে দেবে?

অকাট্য যুক্তি—কোনো সন্দেহ নেই।

যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে, যেমন উৎসব পালাপার্বণ বিয়েশাদি কিংবা অতিথি আপ্যায়নের কাজে চিফ তাদের কাছ থেকে যে কোনো ব্যাপারে সাহায্য নিতে পারেন। তাঁর নিজের বাড়িটা ওরাই তৈরি করে দিয়েছে, তাঁর জমিজমা ওরাই চাষাবাদ করে দেয় এটার জন্য কোনো টাকাপয়সা দিতে হয় না।

চিফের বাড়িটা এক ধরনের আশ্রয়কেন্দ্রও বটে। যে কোনো পলাতক আসামি এখানে আশ্রয় নিতে পারে। যদি কোনো খুনের আসামি কিংবা ফেরারি আসামি হাতেনাতে এদের হাতে ধরা পড়ে তা হলে তার রক্ষা নাই। কিন্তু সে যদি চিফের বাড়িতে আশ্রয় নেয় তা হলে সে রক্ষা পেতে পারে, সেক্ষেত্রে তাকে এখানে দাসত্ব করতে হবে। চিফের কাছে আরো দাস আছে যারা যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক হয়েছিল। চিফ তাদের নিজের বার্তাবাহক হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন।

বার্তা বহনের সময় চিফের বর্ণাটা বহন করে নিয়ে যাবে বার্তাবাহক। বর্ণাটা চিফের প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে বিভিন্ন রকম সাংকেতিক বার্তা বা টোকেন দেওয়া থাকে।

যদি বর্ণার মাথায় লাল কাপড় বাঁধা থাকে তার মানে হলো রক্ত। যদি ছোট একটা বেত বাঁধা থাকে তার মানে হলো পিটুনি। যদি সাথে ক্যাপসিকাম বাঁধা থাকে তার মানে শাস্তিটা খুব কঠোর হবে। যদি বর্ণার সাথে দুটো বাঁশ ক্রস করে বাঁধা থাকে তা হলে ব্ল্যাকমেইলের দাবি যুক্ত হবে। কয়টা গরুর মাথা দিতে হবে সেটা বুঝতে হবে বাঁশের গায়ে কয়টা দাগ আছে তা দেখে। যদি বাশের কোনো এক মাথা পোড়ানো থাকে তা হলে মহা বিপদের চিহ্ন এবং পরিস্থিতি খুব গুরুতর বুঝতে হবে।

শেষ টোকেন বা বার্তাচিহ্নের সাথে স্কটিশ সীমান্তের একটা পুরনো বার্তাচিহ্নের মিল আছে। ওটার মানে হলো একদণ্ড দেরি করা চলবে না। বার্তা পাওয়া মাত্র তখুনি দলবল নিয়ে আক্রমণ করার জন্য চলে আসতে হবে। এমনকি সেটা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে মশাল জ্বালিয়ে হলেও।

চিফের বাড়িতে সবসময় একটা পানোৎসব চলতে থাকে। খুয়োং নামের যবের তৈরি পাহাড়ি মদ চোঙা কিংবা সরাসরি পাত্র থেকে গলায় ঢেলে পান করা হয়। যদি কোনো বিশেষ অতিথি উপস্থিত হয়, তখন তার জন্য বাঁশ কেটে পাত্র তৈরি করে সেটা দিয়ে পরিবেশন করা হয়।

আমার দোভাষী রামোনি আগে রতন পুইয়ার বাড়িতে দাস হিসেবে কাজ করত। সে আমাকে লুসাইদের একটা অভিযানের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরল। ব্রিটিশ অধিকৃত কাছাড়ের এক বাঙালি গ্রামে সেই আক্রমণ চালানো হয়েছিল।

রামোনি বলল-

*আমাদের আক্রমণের মুখে বাঙালিরা সব পালিয়ে গেছে গ্রাম ছেড়ে। শুধু যে কয়জনকে বর্শাবিদ্ধ করা হয়েছে সে কজন পালাতে পারেনি। নারী আর শিশুরাও পালাতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা তাদের প্রায় সবাইকে ধরে ফেলেছি। আমরা যে কজন পুরুষকে দেখেছি সবাইকে হত্যা করেছি। শুধু পনেরো বছরের কম স্বাস্থ্যবান ছেলেগুলোকে রেখেছি। মেয়েদের মধ্যে যারা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের কম তারাও আছে। সবার হাত পেছনে নিয়ে বুড়ো আঙুলে বাঁধা হয়েছে। মেয়েগুলাকে কানের লতির ফুটো দিয়ে বাঁধা হয়েছে। যাদের কানের লতির ফুটো ছোট, তাদেরটা ছুরি বা শলাকা দিয়ে কেটে বড় করে তারপর রশি দিয়ে বেঁধে নেওয়া হয়েছিল।

ফেরার পথে এক মেয়ে ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত হয়ে ধপ করে বসে গেল, সে আর হাঁটতে পারছে না। তার পায়ের পাতা আর গোড়ালি ফুলে গেছে। চিফও থেমে গেল। তারপর অল্পসময়ে অন্যদের সাথে পরামর্শ করে আমাকে ডাকল। বলল- ‘রামোনি, যাও তো ওই মেয়েরে বর্শা দিয়ে শেষ করে দাও। আমি দেখব তুমি কাজটা ঠিকমতো করতে পারছ কিনা।’

আমার খুব ভয় লাগছিল। আমি জীবনে কোনোদিন মানুষ খুন করিনি। আমার বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর।

মেয়েটা যখন দেখল আমি বর্শা হাতে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সে কাঁপতে কাঁপতে আমার পা জড়িয়ে ধরল, আমার জামা ধরে টানাটানি করতে লাগল। আমি যেন তাকে হত্যা না করি। ওটা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগল। আমার মাথা চক্কর দিচ্ছিল। আমি চিফকে বললাম, আমি পারব না এই কাজ করতে।

চিফ ক্ষেপে গিয়ে বললেন ‘তুই একটা কুত্তা। বান্দির বাচ্চা। আমারে জীবনেও বাপ ডাকবি না আর।’

যোদ্ধাদের বাকি সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। বলল, তারা গ্রামে গিয়ে মেয়েদের কাছে বলবে আমি যুদ্ধে কিরকম সাহসের পরিচয় দিয়েছি। তারা মেয়েদের বলবে আমার জন্য একটা পেটিকোট তৈরি করে দিতে।

অপমান সহ্য করতে না পেরে আমি চোখ বন্ধ করে মেয়েটার দিকে ছুটে গিয়ে আমার বর্শাটা দিয়ে আঘাত করলাম। কিন্তু আঘাতটা ঠিকমতো লাগল না। তখন রতন পুইয়া আমার কাছ থেকে বর্ণাটা কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে মেয়েটাকে একটা আঘাত করে বিদ্ধ করল। তারপর রক্তাক্ত বর্শাটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল-'এখানে লেগে থাকা রক্তগুলো চেটে খা। তাইলে তোর কলিজা শক্ত হবে।

রামোনি বলল—'বাঙালিদের রক্ত নোনতা। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে আর কখনো আমি বর্শা দিয়ে কাউকে গেঁথে ফেলতে ভয় পাইনি।'

লুসাইরা যখন কোনো ঝটিকা অভিযানে বের হয় তখন পথের খাবার হিসেবে ভাত আর পাহাড়ি মিষ্টি আলুর মণ্ড তৈরি করে বাঁশের চোঙায় ভরে নেয়। এই সামান্য খাদ্য সম্বল করে তারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে পারে। তারা খুব ধূর্ত এবং তাদের আক্রমণ কৌশলগুলো বেশ চমকপ্রদ। তারা আক্রমণের অগ্রভাগে তাদের গুপ্তচরকে পাঠায় প্রথমে, পেছনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে আসল বাহিনী।

একবার এই পদ্ধতিতে লুসাইরা আমাদের একটা ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে অনেক ক্ষতিসাধন করেছিল।

৩৮. রাতের আক্রমণের ফাঁদে

লুসাই সীমান্তে গহিন জঙ্গলের মধ্যে একটা পার্বত্য গ্রাম। শেষ রাতের দিকে আমাদের এক পুলিশ ফাঁড়ির দরজায় কড়া নাড়তে লাগল কেউ।

ভেতরে থাকা সিপাইরা জানতে চাইল- কী ব্যাপার? কে ওখানে? বাইরে থেকে একজন জানালো খিয়ং-থা জাতির একটা গ্রামে লুসাইরা আক্রমণ করেছে। তাদের জরুরিভিত্তিতে সাহায্য করা দরকার। সেই গ্রামটা চার মাইল দূরে। এখনই রওনা না দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

পরিস্থিতি গুরুতর ভেবে ফাঁড়ির প্রহরীরা এক জমাদারের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অন্ধকার জঙ্গলের পথ ধরে রওনা হয়ে গেল তখুনি। ফাঁড়িতে মাত্র অল্প কয়েকজন লোক ছিল।

পুলিশ বাহিনীর বড় দলটা দূরে চলে যেতেই জঙ্গলের আড়াল থেকে লুসাইরা বের হয়ে আসতে লাগল একে একে। পুরো দলটা এসে আমাদের ঘাঁটিতে প্রবেশ করল। প্রথমে তারা আমার সব লোককে হত্যা করল। তারপর

ওই গ্রামের সব পুরুষকে হত্যা করে নারী ও শিশুদের বন্দি করে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় নিহতদের মুণ্ডু কেটে বর্শার আগায় ট্রফি বানিয়ে নিয়ে গেল।

বর্শার আগায় করে নরমুণ্ডু বহন করা তাদের বিজয় প্রদর্শনের রীতি। এই রীতির কারণে তাদের নাম হয়েছে লুসাই। তাদের ভাষায় লু (Lu) মানে মাথা, শা (Sha) মানে কেটে ফেলা। মাথা কেটে হত্যা করে বলে তাদের নাম হয়ে গেছে লুশাই বা লুসাই (Lushai)। কিন্তু সাধারণভাবে তাদের গোটা জাতিগোষ্ঠী জো (Dzo) নামে পরিচিত।

ওদের তরুণ যোদ্ধাদের প্রথম অভিযানের একটা রীতি আছে। তরুণ যোদ্ধাকে প্রথম অভিযানে তার সাহসিকতার পরিচয় হিসেবে নিহত শত্রুর হৃৎপিণ্ড বা কলিজার একটা টুকরো কাঁচা খেতে হবে। যখন কোনো অভিযান সফল হয় তখন তারা সতর্ক থাকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত তাদের হাতের রক্ত যেন মুছে না যায়। গ্রামে ফেরার পর তাদের নারী ও বয়স্করা বরণ করে নেয়। সম্মিলিত স্বরে গান গাইতে গাইতে, নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। একটা গয়াল কিংবা দু তিনটে শুয়োর জবাই করা হয়, পিপে ভর্তি মদ আনা হয়। তিনদিন ধরে আমোদ-প্রমোদ বিজয় উল্লাস চলতে থাকে।

এমনিতে এরা হলো খুব চুপচাপ ধরনের মানুষ। পারতপক্ষে মুখে রা কাড়ে না। এটা যেন সেই পুরনো প্রবাদের মতো- ‘পুত্র আমার, তুমি যদি বুদ্ধিমান হও তা হলে প্রথমে তোমার চোখ খুলবে, তারপর তোমার কান, সবার শেষে খুলবে তোমার মুখ। লুসাইরা বাস্তবিকই সেরকম। তারা ঘুমায় মুখবন্ধ করে, শিকার করে মুখ বন্ধ করে, হাসিটাও মুখ বন্ধ রেখে হাসে।

তাদের এই অভ্যাসের কারণে তাদের মুখ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস ঢুকতে পারে না, দাঁত ব্যথা হয় না, তাড়াতাড়ি দাঁত পড়ে না। তাছাড়া তাদের ক্ষয় কাশি হয় না, দাঁতের রোগ বা ফুসফুসের রোগ হয় না।

শৈশব থেকে তাদের শেখানো হয় চোয়াল বন্ধ রাখতে এবং ঘুমানোর সময় মাথার কাপড়টা মুখের ওপর দিয়ে ঘুমাতে, যাতে মশামাছি কিংবা দূষিত হাওয়া মুখের ভেতর ঢুকতে না পারে। লুসাইদের শারীরিক গঠন অধিকাংশ পার্বত্যবাসীর মজবুত। তারা সাধারণত একটাই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে যেটা মূলত অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে সৃষ্টি হয়। কলেরা আর গুটিবসন্তের মতো রোগগুলো ১৮৬১ সালের আগে তাদের কাছে অচেনা ছিল। ওইসব রোগ তাদের মধ্যে ছড়িয়েছে বাঙালিদের অপহরণ করতে শুরু করার পর থেকে।

এসব রোগের সংক্রমণ খুব দ্রুত ঘটে। গ্রামের পর গ্রাম খালি হয়ে যায়। পুরুষরা সবচেয়ে ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়। ব্যথায় যন্ত্রণায় তাদের মগজ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাদের আত্মীয় পরিবার সবাই ত্যাগ করে।

তবে একটা অমানবিক পন্থার কারণে একসময় রোগটা ছড়ানো বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে নতুন কোনো সংক্রমণের আগ পর্যন্ত নিরাপদ বোধ করে সবাই।

সাধারণভাবে কারো মৃত্যু হলে তার সব আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়ে একটা বিশাল ভোজের আয়োজন করে। লাশকে ভালো জামাকাপড় পরানোর পর মাথায় একটা আচ্ছাদন দিয়ে বসার ভঙ্গিতে রাখা হয়। তারপর তার অস্ত্রপাতিগুলো পাশে রেখে সবচেয়ে বয়স্ক আত্মীয় গিয়ে তাকে বলবে, 'ভাই তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে। খাও। ভালোমতন খেয়ে নাও।'

তারপর তিনি লাশের সামনে খাবারদাবার রেখে হাতে একটা তামাকের পাইপ দিয়ে মৃতকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান।

দ্বিতীয় দিনে, যখন সব অতিথি মাতাল হয়ে পড়ে, তখন লাশটাকে একটা কফিনে ভরে বড় একটা গাছের নিচে নিয়ে কবর দেওয়া হয়। কিছু কিছু জাতির মধ্যে আরো অদ্ভুত কিছু রীতি আছে। যখন কোনো গোত্রপ্রধান বা চিফ মারা যায়, তখন তারা তাঁর মৃতদেহকে আগুনের ওপর রেখে ধীরে ধীরে শুকিয়ে ফেলে। তারপর একটা গাছের ওপর ঝুলিয়ে দেয়।

হাওলং গোত্রের রীতি হলো মৃতদেহটা ঘরের কড়িকাঠের সাথে সাতদিন ঝুলিয়ে শুকাতে হবে। এই সময়টা মৃতের বিধবাকে তার নিচে সারাক্ষণ বসে থাকতে হবে। বসে বসে মৃতদেহটাকে ঘোরাতে হবে। সে ওই সময়ে অন্য কিছু করতে পারবে না। কোনো অজুহাতেই উঠতে পারবে না। এমনকি খাবার জন্যও না। তার সকল খাবারদাবারের দায়িত্ব আত্মীয়স্বজনের হাতে থাকে।

৩৯. ইংরেজ লুসাই সর্দার

আমার মনে হচ্ছিল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমার অবস্থানটা ঠিক কিরকম সেটা অসভ্য পার্বত্যবাসীদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার অবস্থানকে যেন তারা বুঝতে পারে সেরকম একটা কিছু করা।

আমি তাদের কায়দায় নিজেকে ওই জেলার একজন শ্বেতাঙ্গ বড়কর্তা হিসেবে স্থাপন করলাম। যার উপরে আরো বড় এক শ্বেতাঙ্গ কর্তা আছে কলকাতায়। সরকারের কাছ থেকে আমার হেডকোয়ার্টার চন্দ্রঘোনা থেকে সরিয়ে আরো গভীরে রাঙ্গামাটিতে স্থাপন করার অনুমতি চেয়ে নিলাম। ওখান থেকে সীমান্ত এক দিনের পথ। চিফ হিসেবে আমার নতুন অবস্থান কতটা মজবুত সেটা বোঝার জন্য আমি সব তাওং-থা গোত্রকে আহ্বান করলাম যেন ওরা আমার জন্য একটা বাড়ি তৈরি করে দেয়।

পরিকল্পনা মাফিক আমি পাংখো, ম্রো, বনযোগীসহ বিশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত নানান গোত্রের কাছে খবর পাঠালাম। বললাম যে আমি চন্দ্রঘোনা থেকে আমার অফিস সরিয়ে রাঙ্গামাটিতে নিয়ে আসছি। ওখানে আমার জন্য

একটা বাড়ি তৈরি করতে হবে। যারা এই কাজে নিযুক্ত হবে তাদের জন্য তিনটা শুয়োর জবাই করা হবে আর বড় এক পিপে মদের ব্যবস্থা থাকবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে তিনশ লোক এসে হাজির স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার জন্য। তারা আমার জন্য লুসাই কায়দায় একটা বাড়ি তৈরি করে দিল। আগাগোড়া বাঁশের তৈরি। শুধু গার্ড পোস্টগুলো গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হলো। মেঝেটাও তৈরি হলো দু ইঞ্চি বাসের ছোট ছোট চারা গাছের কাণ্ড দিয়ে।

আমার নতুন হেডকোয়ার্টার একদম মাঝামাঝি জায়গাতে তৈরি হলো। কর্ণফুলী নদীর একটা বাঁকে। আমি আশপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করে নিলাম। ওখানে আমি একটা পুলিশ ব্যারাকও তৈরি করলাম যেটা স্থলভাগের যে কোনো আক্রমণ ঠেকাতে পারবে। বাকি তিনদিকেই নদী। ওদিকটা প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত।

আমার থাকার জন্য একটা ঘর তৈরি করা হলো একটা সুন্দর টিলার ওপর। যেটা নদীর ওপর ঝুলে আছে। যেখান থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যায়। আমার নতুন আবাসস্থলের নাম দিলাম Barn House বা গোলাঘর। যদিও আমি সেই বাড়িতে বেশিদিন শান্তিপূর্ণ দিন কাটাতে পারিনি। আমাকে প্রায়ই নানান ইস্যুতে ছুটে যেতে হতো জঙ্গলের গভীরে।

আমি এখানে হেডকোয়ার্টার সরিয়ে আনার পর বেশ কিছুকাল কোনো উপদ্রব ছিল না সীমান্ত এলাকায়। কিন্তু কিছুদিন পর রতন পুইয়া খবর দিল যে হাওলং গোত্রের লোকেরা অচিরেই একটা যুদ্ধের পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছে। দক্ষিণের পার্বত্য এলাকায় নতুন সেই আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছে তারা।

খবর পেয়ে আমি আমার বাহিনী নিয়ে ছুটে গেলাম। বোমাং অঞ্চল ও সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থান দিয়ে তাদের আক্রমণের পথে বাধার সৃষ্টি করলাম। আমাদের অবস্থানের কারণে তাদের আক্রমণ পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। তারা পিছু হটে গেল। আমি দুদিন ধরে তাদের পিছু ধাওয়া করে গেলাম, কিন্তু কাউকে ধরতে পারলাম না।

এই অভিযানের সময় আমি জঙ্গলে ক্যাম্প করে রাত্রিযাপন করেছি। গাছের নিচে ঘুমিয়েছি। এই সময় আমি আমার পার্বত্য সঙ্গীদের অদ্ভুত কিছু রীতি দেখতে পেয়েছি। তারা যে গাছের নিচে ঘুমায় সে গাছের কাণ্ডে দা দিয়ে খাঁজ কেটে রাখে। উর্ধ্বমুখী খাঁজ। আমি প্রথমে ভেবেছি এটা তাদের অলস অবসর কাটাবার একটা কায়দা। কিন্তু সকালে দেখলাম তারা আবারো খাঁজ কাটছে, তবে এবার পুরো উল্টো। এবার কাটছে নিম্নমুখী খাজা। আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলে তারা বলল এটার কারণ হলো রাতের বেলা যে শিশির পড়ে ঊর্ধ্বমুখী বীজের কারণে সেই শিশির গাছে আটকে যায়। গারে এসে পড়ে না। সকালবেলা সেটা উল্টো করে কাটে যেন সেটা গড়িয়ে নিচে নেমে যায়। এই জল জঙ্গলে বসবাসরত অশরীরী আত্মাদের উপকার করে এবং তাদের সকল

অমঙ্গল দূর করে। বুনো গাছের আরেকটা চমকপ্রদ ব্যবহার আমি শিখেছি এই যাত্রায়। আমাদের যাত্রাপথটা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে পার্বত্য জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। আমরা যেখানে রাত কাটানোর জন্য ক্যাম্প করতাম সেটা সাধারণত ঝিরি বা নদী থেকে অনেক দূরে। তাই প্রায়ই জলের অভাব হতো আমাদের। এই সমস্যার সমাধানে আমার পাহাড়ি সঙ্গীদের একজন তার দা দিয়ে জঙ্গলের গাছে গাছে ঝুলে থাকা মোটা মোটা লতা থেকে দুই কোপ দিয়ে দুগজের একটা টুকরো কেটে নিল। তারপর সেই টুকরোটা খাড়া করে ধরে রাখার পর সেখান থেকে আধা লিটারের মতো টলটলে পরিষ্কার পানি বের হলো। এখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে এরকম বুনো লতার কোনো অভাব নেই। এভাবে খাবার পানির অভাব মেটায় এরা। তবে মনে রাখতে হবে খুব ধারালোভাবে কাটতে হবে। এলোমেলোভাবে কাটলে কাজ হবে না।

এবারের যাত্রায় আমরা একটা হুলুক বানর ছাড়া আর কাউকে আটক করতে পারলাম না। কালো রঙের এই লাজুক বানরটির বুকের দিকে সাদা রং। এরা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায়। গাছের ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তাদের বিচিত্র কিচমিচ শব্দে জঙ্গল ভরিয়ে রাখে। এরা ভূমিতে খাড়া হয়ে হাঁটে তবে একটা হাত উপরে তুলে রাখে—যদি কেউ বিরক্ত করে চট করে গাছে উঠতে পাড়ে। এই প্রাণীগুলো একেবারেই বুনো, এদের পোষ মানানো যায় না। একেবারে শিশুকালে ধরতে পারলেই পোষ মানে, নইলে না খেয়েই মারা যায়।

আমরা এখন যেটাকে ধরেছি তার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। এটা দেখতে অনেকটাই মানুষের মতো। বিশেষ করে হাত এবং হাতের নখগুলো একদম মানুষের মতো। রাতভর সে ঘুমায় মাথার নিচে একটা হাত বালিশের মতো রেখে। সে আমার হাত থেকে ফলমূল, শস্যদানা ইত্যাদি খেয়ে বেড়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। আমি যখন কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার ভান করি, সে আমার দিকে সহানুভূতির চোখে তাকায়। সে আমার সাথে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত। আমার হাত ধরে বন্ধুর মতো হাঁটতো। কিন্তু মাত্র ছমাস পর সে ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে যারা গেলে খুব মন খারাপ হয়েছিল আমার।

ওদিকে কালিন্দী রানি বরাবরের মতোই অসহযোগিতামূলক অবস্থানে রয়ে গেলেন। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কমিশনার মিস্টার ওয়াই, বদলি হয়ে নতুন কমিশনার চট্টগ্রামের দায়িত্ব নেওয়ার পর রানি তাঁর উত্তরাধিকারী পৌত্রকে বিশেষ মিশনে কলকাতা পাঠালেন। আবারো সেই পুরনো চেষ্টা। এখান থেকে আমাকে বদলি করার তদবির। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন আমি এখানে থাকলে তাঁর ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। তিনি তাঁর দৌহিত্রকে মোটা অংকের টাকা দিয়ে পাঠালেন যেন একজন খ্যাতনামা উকিল ভাড়া করেন। যার মাধ্যমে তিনি বাংলার বড়লাটের সাথে দেখা করতে পারেন।

এবার অজুহাত হিসেবে বলা হলো আগের কমিশনারের সাথে আমার খাতির ছিল বলে তিনি কারো অভিযোগ আমলে নিতেন না। কিন্তু যদি নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় তা হলে অনেক নির্যাতিত পাহাড়ি লোক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসবে।

অতএব আরেকটি তদন্ত কমিটি করা হলো নতুন কমিশনারের নেতৃত্বে। তিনিও আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ তদন্ত করে খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন। কিন্তু সেরকম কিছুই পেলেন না। শুধু একটা বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করলেন। আমি সব জায়গায় ঠিকমতো আইন মেনে কাজ করিনি।

হায় পবিত্র আইন। এরকম বেআইনি বিষয়ে সম্পূর্ণ আইন মেনে কাজ করা কিভাবে সম্ভব?

৪০. সাইলু চিফ সাভুঙ্গা

আমি রাঙ্গামাটি ফিরে দেখলাম আমার জন্য কাসালং থেকে একজন বার্তাবাহক এসে বসে আছে। সাইলু চিফ সাভুঙ্গার কাছ থেকে বার্তা এসেছে। সে আমার সাথে দেখা করতে চায় এবং সন্ধির প্রস্তাব দিতে চায়। আমি শুনে খুব আনন্দিত হলাম। কারণ এই গোত্রের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে পারলে আমি উত্তর দিকের সীমান্ত এবং কাছাড় জেলায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারব।

আমি তাদের চিফের সাথে সাক্ষাতের জন্য সম্মত হলাম। অধীনস্থদের বললাম সাক্ষাতের আয়োজন করতে। কিন্তু সেই সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে গুটিবসন্তের মহামারি ছড়িয়ে পড়ছিল। সাইলু চিফ এর মধ্যে ব্রিটিশ এলাকায় আসতে রাজি হলো না। অতএব আমাকেই ওদের এলাকায় যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হলো। সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুই দিনের পথ।

সাইলু বার্তাবাহকেরা আমাকে বলল যে তিন বছর আগে আমার পূর্ববর্তী অফিসার সাভুঙ্গার গ্রামের কয়েকজন সাইলু দূতের সাথে দেখা করেছিলেন। তাদের চিফের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তিনি সেই দূতের হাতে বহু মূল্যবান একটা ব্যাংক নোট দিয়েছিলেন যেটার বিনিময়ে অনেক রুপি পাওয়া যেত।

ওরা সেই নোটটা কত দামি সেটা বোঝার জন্য বাজারের এক বাঙালি দোকানদারের কাছে দিল। দোকানদার ওই নোটটা হাতে নিয়ে তাকে দ্রুতগতিতে লবণ, শুঁটকি, পুঁতিসহ আরো নানান জিনিসপত্র এক-চতুর্থাংশ দামে দিয়ে দিল।

তারা ওই জিনিসগুলো নিয়ে সাভুঙ্গার দিকে রওনা দিল। গ্রামে পৌঁছে চিফের কাছে বাজারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানালো। চিফ তখন বলল- ‘কী

বললি? ইংরেজ তোদের এরকম জাদুকরী একটা কাগজ দিল, আর তোরা সেটা বিক্রি করে এলি? এই অপদার্থগুলাকে কেটে টুকরো করে ফেল এখনই।

বেচারাদের তখনই হত্যা করা হলো।

কারবারি আমাকে অনুরোধ করল তাদেরও যেন একটা জাদুর নোট দেই আমি, যেটার বিনিময়ে অনেক কিছু পাওয়া যায়। আমি বললাম যখন চিফের সাথে দেখা করব তখন তার হাতে ওটা তুলে দেব। অতঃপর আমি একটা ব্যাংক নোট তৈরি করে আমার সেরা ত্রিশজন লোককে নিয়ে রওনা দিলাম চিফের সাথে দেখা করার জন্য।

সন্ধ্যার সময় ক্যাম্প করার পর আমি হাঁটতে বের হলাম হাতে ছোট একটা ছড়ি নিয়ে। তখন দেখি কোত্থেকে হুট করে একটি বাঘ নিঃশব্দে রাজকীয় চালে আমার সামনে থাকা ঝরনাটা পেরিয়ে জলের দিকে যাচ্ছে। মনে হলো সে আমাকে দেখেনি। জঙ্গলের মধ্যে ওটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ভাবলাম আর বাইরে ঘুরে কাজ নেই। তাঁবুতে ফিরে এলাম তখুনি।

কিন্তু শেষমেশ সাভুঙ্গা দেখা দিল না। তবে সে ছোটখাটো মোড়ল গোছের কিছু লোককে আমার কাছে পাঠাল তার প্রতিনিধি হিসেবে। আমি প্রথামাফিক তাদের সাথে বন্ধুতার শপথে অংশ নিলাম। তাদের জামাকাপড় আর পুঁতির মালা উপহার দিলাম।

তারা আমার কাছে বারুদ আর ব্যাংক নোটের আবদার করল। আমি সেটা প্রত্যাখ্যান করলাম কারণ সাভুঙ্গা নিজে আসেনি। তাছাড়া যতই বন্ধুতার শপথ নিক, আমি তাদের বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা এরা শুধু উপহারের লোভে আমার কাছে এসেছে, এদের বিশ্বাস করার কোনো মানে হয় না।

***

আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে পার্বত্য এলাকার একজন চিফের মতো আমার জীবন কাটাব, তখন এটাও ঠিক করলাম যে আমি একটা জুম খেত তৈরি করব। অতঃপর মে মাসে আমি আমার চাকরবাকরদের সাথে নিয়ে আধা একরের মতো জমি পরিষ্কার করলাম। এটা ছেলেখেলা নয়, রীতিমতো কঠিন একটা কাজ। সেই কাজ করতে গিয়ে আমার হাতগুলো ভয়ানক ব্যথায় জর্জরিত হয়ে গেছে।

যখন প্রথম বৃষ্টি নামল তখন আমি বীজ বপন শুরু করলাম। শস্যদানা, শসা, তরমুজ ইত্যাদির বীজ পুঁতে দিলাম খেতের মধ্যে। ভাবলাম শিগগির আমার খেতের ফসল উপভোগ করতে শুরু করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে প্রত্যেক পাহাড়ি মানুষ তার পরিবার নিয়ে জুম খেতেই অবস্থান করে। কচি কচি চারাগাছগুলো পরিচর্যা করে, আগাছা সাফ করে। আমি সেসব কিছু না করে নানান কাজে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে

সময় কাটিয়েছি। অতএব আমার সব ফসল কচি অবস্থাতেই খেয়ে শেষ করেছে পাখপাখালির দল। সামান্য কিছু তুলা বাদে আমি আর কোনো ফসল তুলতে পারিনি।

আমি এখানে রেশম চাষেরও চেষ্টা করেছিলাম। সিল্কের খুব চাহিদা এদিকে। কলকাতা থেকে সিল্কের কাপড় এনে কক্সবাজারে সুন্দর সুন্দর জামা তৈরি করা হয়। ভেবেছিলাম সিল্কটা এখানেই উৎপাদন করা যায় কি না। সে উদ্দেশ্যে আসাম থেকে রেশমপোকাও আনিয়েছিলাম। কিন্তু কেন জানি সফল হলো না প্রচেষ্টা। হয়তো আবহাওয়া, অথবা এখানকার লোকদের অদক্ষতা। শুধু উন্নত জাতের শস্য আর তুলা চাষেই যা কিছু সফলতা এসেছিল। বিশেষ করে তুলাচাষ এখানকার লোকেরা খুব আগ্রহের সাথে নিয়েছিল।

৪১. ছুটির ঘণ্টা বাজল

ধীরে ধীরে এখানকার লোকদের সাথে আমি গভীরভাবে মিশে গেলাম। সবাই আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। কালিন্দী রানি ও তাঁর সহযোগী বাঙালিগুলো বাদে বাকি সবার সাথে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে। আমার বিরুদ্ধে করা তাঁর সকল পিটিশন ব্যর্থ হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে পিটিশন করে বরং আমার উন্নতির পথ খুলে দিয়েছে। চট্টগ্রামের কমিশনার এবং কলকাতার বড়লাট সবাই আমার কাজ পছন্দ করেছে।

এখানকার প্রকৃতিপূজারি লোকদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য কলকাতা থেকে মিশনারি পাঠাতে বলেছিলাম। বৌদ্ধধর্মে যারা দীক্ষিত তাদের সাথে কোনো বিরোধে না গিয়ে শুধু আদিম প্রকৃতিপূজারিদের মধ্যে কিছু সভ্যতার আলো ছড়ানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তবে সেটা যেন ইউরোপিয়ান সভ্যতার দোষগুলো থেকে মুক্ত থাকে সেটাও লক্ষ্য ছিল।

আমার পরবর্তী কাজ ছিল চন্দ্রঘোনা থেকে হেডকোয়ার্টার্স পুরোপুরি সরিয়ে চল্লিশ মাইল ভেতরে রাঙ্গামাটিতে নিয়ে আসা। আমার নিজের থাকার ঘরটা তো পার্বত্যবাসীরা স্বেচ্ছাশ্রমে বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অফিস এবং পুলিশ ব্যারাক তৈরি করা বড় ঝামেলার কাজ। সেগুলো এক এক করে শেষ করা গেল। আমি একটা প্রাইমারি স্কুল তৈরির উদ্যোগও নিলাম এখানে।

সেপ্টেম্বরের দিকে তাওং-থা গোত্রের কিছু লোক আমার জন্য চাল, তরমুজ, শসা, কয়েক বোতল পাহাড়ি মদ উপহার নিয়ে এলো। আমি বিনিময়ে তাদের টার্কিশ ডিলাইট নামের মিষ্টান্ন আর ইংলিশ রাম উপহার দিলাম।

বছরের শেষ দিকে আমার শরীরটা খারাপ হয়ে গেল। আমাকে এক বছরের ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ড চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। আমি ছুটি নিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে শুরু করলাম।

জানুয়ারির দিকে কাসালং নদী বেয়ে রতন পুইয়ার সাথে দেখা করতে গেলাম। রতন পুইয়া আর অন্য কারবারিদের বললাম আমি শিগগির ফিরে আসব। আসার পথে সেখানকার পুলিশ ফাঁড়িগুলো পরিদর্শন করলাম।

ঘরে ফেরার পর আমি নদীতীরে আমার কুঁড়েতে একটা মাদুরে বসে লেখালেখি করছিলাম। হঠাৎ করে আমার ঘরের চাল আর দেওয়াল ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল। আমি ভাবলাম কোনো একটা হাতি হয়তো ছাড়া পেয়ে আমার ঘরের পাশে এসে ধাক্কাধাক্কি করছে।

আমি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে হাতি খুঁজতে গেলাম। কিন্তু আশপাশে কোনো হাতির ছায়াও নেই। তার বদলে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখে আমার চোখ ছানাবড়া। আমার ঘরের সামনে নদী, নদীর তীরটা বেশ উঁচু। নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ বনভূমি। আমি দেখলাম নদীর তীর থেকে ভয়ানক দর্শন বিশাল ঢেউ উঠে প্রবল আক্রোশে জঙ্গলের বুকে আছড়ে পড়ছে। নদীর তীরের শক্ত ভূমি ফেটে চৌচির। বিশাল বিশাল গাছগুলো এমনভাবে নুইয়ে পড়ছে যেমন কোনো ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছে। অথচ কোথাও এক ফোঁটা বাতাস নেই।

সম্বিত ফেরার পর আমি টের পেলাম এইমাত্র একটা শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। আমার জেলার অধিকাংশ ঘরবাড়ি বাঁশের তৈরি, তাই এদিকে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু বাংলার অন্যান্য জেলায় এই ভূমিকম্প মারাত্মক রকমের ধ্বংসলীলা চালিয়েছে।

ছুটিতে যাওয়ার আগে আমি মং রাজার সাথে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু বেশি সময় থাকতে পারলাম না। আমাশয় আর জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম আমি। মং রাজা আর তাঁর লোকজন আমার চলে যাওয়ার খবর শুনে খুব মর্মাহত হলো। তাদের কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমার জামাকাপড় ধরে অনুনয় করতে লাগল যেন আমি চলে না যাই।

তাদের এই আন্তরিকতা আমাকে স্পর্শ করল। আমি তাদের আবার ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলাম। ঈশ্বরের মর্জিতে যদি সুস্থ হয়ে উঠি তা হলে আমি আবারো তাদের কাছে ফিরে আসব। আবারো একসাথে কাজ করব আমরা।

লুসাই যুদ্ধ এবং জোলুটি উদ্ধার (১৮৭২)

৪২. বিলেতে ছুটি কাটিয়ে বাংলায় ফেরা

১৮৭১ সালের জানুয়ারি শুনলাম দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত খুব অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। সরকার আমাকে অনুরোধ করল যত দ্রুত সম্ভব পার্বত্য এলাকায় আমার দফতরে যোগ দিতে। আমার অনুপস্থিতিকালে সেন্দুরা দুবার আক্রমণ করেছে বোমাং রাজার এলাকায়। এই দুটো ঘটনা বাদে পাহাড় মোটামুটি শান্ত ছিল। লুসাই বন্ধুরা আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকার কারণে এদিকে কোনো আক্রমণ না করলেও অন্য জেলাগুলোতে আক্রমণ চালানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে কাছাড় জেলায়। সেখানে একাধিক ইউরোপিয়ানকে হত্যা করা হয়েছে। এক ইউরোপিয়ান চা ব্যবসায়ীর ছোট্ট মেয়েটাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সাথে আরো অনেক স্থানীয় ব্রিটিশ প্রজাকে অপহরণ করা হয়েছে।

মাসে প্রায় দুবছর পর আমি কলকাতায় ফিরলাম। এসেই কলকাতা ত্যাগ করার আগে আমি ভারতের গভর্নর জেনারেল (লর্ড মেয়ো) এবং বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর উভয়ের সাথে দেখা করি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে লুসাইদের বিরুদ্ধে এ বছরের শেষ নাগাদ একটা কঠিন শাস্তিমূলক অভিযান চালানো হবে। এই বিষয়ে লর্ড মেয়ো সরকারিভাবে একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে অবশেষে সরকারের কাছ থেকে লুসাইদের এলাকায় অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত আসার ফলে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ নিকট অতীতে আমাকে লুসাইদের হাতে যথেষ্ট নাকাল হতে হয়েছিল। সরকারের নীতি রক্ষার স্বার্থে কেবল প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে থাকার কারণে ওদের অনেক উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে।

আমার মতে এই ধরনের অভিযানকে এড়ানোর সুযোগ ছিল। যদি শুরুতেই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দেওয়া হতো লুসাইদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জোরালো শাস্তিমূলক অভিযান চালানোর জন্য, তা হলে এত বড় যুদ্ধের পরিকল্পনা করার দরকার হতো না। এখন তাদের এলাকায় গিয়ে এত বড় মাপের একটা সামরিক অভিযান অনেক ব্যয়বহুল হবে।

তবু যাই হোক মিষ্টি কথায় যখন কাজ হয়নি এবার কঠিন আঘাতে তাদের শায়েস্তা করা হবে। নির্দেশ পেয়ে ফেব্রুয়ারির দিকে আমি রাঙ্গামাটিতে আমার কর্মস্থলে ফিরে আগের মতো শাসনকাজে নিয়োজিত হলাম।

এটা চিরন্তন সত্য যে অনেকদিন পর কোনো চেনামুখের দেখা পেলে মনটা ভরে যায়। কাজে যোগ দেওয়ার পর সবাই আমাকে দেখে খুশি হলো। আমাকে

খুব চমৎকার এবং জাঁকজমকপূর্ণভাবে বরণ করে নেওয়া হলো পুরনো কর্মস্থলে। প্রায় এক পক্ষকাল ধরে আমার কাছে লোকজন আসতে থাকল দেখা করার জন্য। আমি আমার বাড়ির পেছনের পাহাড়ে একটা বাঁশের গ্যালারি তৈরি করলাম যেখান থেকে নদীর চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। এখানে বসলেই শীতল বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

যেদিন আবহাওয়া ভালো থাকে সেদিন সূর্যাস্তের আগে ওখানে একটা মাদুর বিছানো হয়। মাদুরের ওপর বড় একটা বালিশ রেখে তাতে হেলান দিয়ে বসে আয়েশ করে ধূমপান করতে করতে আমার সাথে দেখা করতে আসা পাহাড়িদের সাথে গল্প-গুজব করি। আমার কর্মচারীরা একটা রূপোর থালায় পান-সুপারি সাজিয়ে তার সাথে হাতে রোল করা সিগারেট বিলি করে দর্শনার্থীদের মধ্যে। এই গ্যালারিটা শিগগির বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সবার কাছে। এখানে বসেই আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যাই। তাদের কাছ থেকে অনেক কিংবদন্তির গল্পও শুনতে পাই।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমার কর্মচারী নুরুদ্দিন এক গ্লাস শেরি এনে আমার সামনে রেখে ডিনারের ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার অর্থ হলো আজকের মতো আসর গুটাতে হবে।

নুরুদ্দিন আমার সাথে খুব ছোট একটা পদে কাজ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু আমি যখন পার্বত্য অঞ্চলের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হই, তখন আমার একান্ত বিশ্বস্ত টোবি ছাড়া বাকিরা কেউ পার্বত্য অঞ্চলে আসতে রাজি হয়নি। কারণ সমভূমির লোকদের কাছে পাহাড়ি এলাকা ও তার বাসিন্দাদের সম্পর্কে নানান বদনাম আছে। নুরুদ্দিনই একমাত্র লোক যে তার সকল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সতর্কতা উপেক্ষা করে আমার সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে নেয় এবং লুসাই অভিযান পর্যন্ত সে আমার সাথেই কাজ করেছিল বিশ্বস্ততার সাথে। পুরস্কার হিসেবে আমি তাকে পদোন্নতি দিয়ে জমাদার হিসেবে সীমান্ত এলাকার একটা বাজারে নিয়োগ করেছিলাম। সে ওই পদের জন্য উপযুক্ত ছিল। আমি তাকে একটা পাহাড়ি মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হবার কাজেও উৎসাহিত করি। যার ফলে সে লুসাইদের ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করে।

ইতোমধ্যে, আমি শুধু অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েই বসেছিলাম না। আমি প্রত্যেক গোত্র থেকে দোভাষী আর গাইড সংগ্রহ করে তাদের সাথে কুলিদের সমন্বয় সাধন করলাম। এক ফাঁকে গোপনে রতন পুইয়ার সাথে যোগাযোগ করে আমাদের অভিযানে তার সম্পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করে নিলাম।

এসব প্রস্তুতি গ্রহণের কয়েকদিন পর কলকাতা থেকে আমার ডাক এলো। আমি পাহাড়ে অভিযানসংক্রান্ত একটা সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতা গেলাম মে মাসে। সেখানে আলোচনা হলো কোথায় কীভাবে কোন পদ্ধতিতে অভিযান পরিচালনা করা হবে। স্থির হলো যে দুটো কলামে বিভক্ত হয়ে সেনাবাহিনী

প্রবেশ করবে লুসাইদের দেশে। একটা হবে উত্তরের কাছাড় থেকে, অন্যটা দক্ষিণে চট্টগ্রাম থেকে। যদি সম্ভব হয়, দুটো কলাম লুসাই অঞ্চলের একটা পয়েন্টে গিয়ে মিলিত হবে।

আমি দক্ষিণ কলামের কমান্ডিং অফিসারের অধীনে রাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে অভিযানে যুক্ত থাকব। অন্যদিকে উত্তরে একই দায়িত্বে থাকবেন কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার।

লর্ড মেয়ো আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন। তিনি সাক্ষাতের সময় পার্বত্য এলাকা সম্পর্কিত আমার অভিজ্ঞতাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। এই অভিযান যেন সফলভাবে শেষ হয় সেদিকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে বললেন এবং তিনি আমার কাজের উপযুক্ত পুরস্কার হিসেবে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবেন বলে জানালেন।

ইতোমধ্যে আমার সীমান্ত রক্ষী পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। তাদের জন্য উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। আমার সাথে কাজ করার জন্য ইউরোপিয়ান সহকারীও দেওয়া হয়েছিল। মোদ্দাকথা পাহাড়ি অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে যেসব সমস্যা ছিল তা আস্তে আস্তে দূর হতে শুরু করেছে।

কলকাতার সম্মেলন শেষ হওয়ার পর আমাকে সিলেট যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। ওখানে পুলিশের ডিআইজির সাথে দেখা করতে হবে। তিনি কাছাড় ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে পুলিশ বাহিনী নিয়োগের দায়িত্বে আছেন। তাঁর সাথে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আমার এই যাত্রাটা তেমন ঝামেলাপূর্ণ ছিল না। কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একটা বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হলো। সেখানে গঙ্গা নদী হয়ে ঢাকা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সরকারি স্টিমারে জায়গা বুক করা হলো। ওখান থেকে আসামগামী নিয়মিত স্টিমারে চড়ে ছাতকের কাছাকাছি একটা গ্রামে নামলাম। ছাতক থেকে সিলেট পর্যন্ত পথে ছোট একটি শাখা নদী আছে। আমি ছাতক থেকে একটা নৌকা ভাড়া করলাম যেটায় চড়ে সিলেটে গিয়ে ডিআইজি সাহেবের সাথে আমার প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আবারো দ্রুত ছাতক ফিরে আসলাম। এখানে আসাম থেকে ঢাকামুখী স্টিমার থামে। সেরকম একটা স্টিমার ধরার চেষ্টা করব।

ছাতকে পৌঁছে ছোট্ট একটা বেড়ার ঘরে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিলাম। সেখানে বসে ডিম দিয়ে ভাত খেতে খেতে স্থানীয়দের সাথে নানা বিষয়ে আলাপ করছিলাম। ফাঁকে ফাঁকে দূরে বিশাল নদীর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম আমার কাঙ্ক্ষিত স্টিমারের ধোঁয়ার ফানেল দেখা যায় কি না। আমার ডানদিকে নীল রঙের খাসিয়া পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে কিছু সাদা সরু ঝরনার ধারা নেমে এসেছে সাড়ে চার হাজার ফুট নিচে।

স্টিমারের পাত্তা নেই এখনো। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর জায়গাটা ঘুরে দেখার জন্য হাঁটতে বের হলাম। জানা গেল ছোট ছোট অসংখ্য মাটির ঘরের কারণে জায়গাটার নাম হয়েছে ছাতক।

গ্রামের বাইরের দিকে বড় নদীটার তীরে একটা ভগ্নপ্রায় কালী মন্দির দেখতে পেলাম। কৌতূহলী হয়ে মন্দিরটার ভেতরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম আধো অন্ধকারে ভূতের মতো কেউ একজন নিঃশব্দে বসে আছে মাঝখানের বেদিটার সামনে।

একজন ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী। প্রায় নগ্ন শরীরে একটা নেংটি পরে আপাদমস্তক ছাই মেখে বসে আছেন। কপালে সিঁদুরের রং লেপ্টে চেহারাটা আরো বিদঘুটে দেখাচ্ছে। আমি তাঁর সাথে সংলাপ শুরু করলাম :

'নমস্কার হে পবিত্র পুরুষ। আপনি এখানে মা কালীর মন্দিরে একা বসে আছেন কেন?''

'সাহেব আমি জ্ঞানসাধনা করতে বসেছি।' 'কিসের জ্ঞান মহারাজ?"

কোনো জবাব নেই।

'আমি মজা করছি না মশাই। আমি নিজেও জ্ঞানের সন্ধানে আছি। যদিও আমি শ্বেতাঙ্গ, আমার পরনে সাহেবদের মতো পোশাক। আমি সবসময় জ্ঞানের আলোক সন্ধানীদের শ্রদ্ধা করি। সে জন্য জানতে চাই, কী ধরনের জ্ঞান মহারাজ?"

'আমি এখন মন্ত্র পড়ছি (বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে বললেন তিনি)। আজ রাতে মৃতদের আমার সাথে লড়াই করতে হবে। দয়া করে আমাকে এখন বিরক্ত করবেন না জনাব।'

'আমি আপনাকে বিরক্ত করব না, চলে যাব শিগগির। কিন্তু তার আগে আমাকে বলুন বাবা, আজ রাতে আসলে আপনি ঠিক কী করতে যাচ্ছেন?'

'যখন আমি আমার মন্ত্রবলে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করব তখন আমি একটা বালকের কবরে যাব। সেখানে গিয়ে মন্ত্রের শক্তিতে তাকে জীবিত করে তুলব। তারপর তার সাথে লড়াই করব। যদি লড়াই করে আমি জিততে পারি তা হলে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানালোকের সন্ধান পাব। যদি হেরে যাই তা হলে আমার নিজেকে কবরে ঢুকে যেতে হবে।'

'বেশ বেশ মহারাজা। আপনার জ্ঞান সাধনা সফল হোক।

গ্রামের মধ্যে খোঁজ নিয়ে জানলাম এই ফকির সত্যি খুব আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। তিনি গত এক সপ্তাহ ধরে ওই মন্দিরে একাকী রাত্রিযাপন করছেন। গ্রামবাসীরা মন্দিরের সামনে তাঁর জন্য খাবারদাবার রেখে সরে যায়। কিন্তু তাঁকে বিরক্ত করার সাহস করে না কেউ। বিকেলের দিকে আমার স্টিমার চলে এলে আমি তাতে উঠে পড়লাম। ফকিরের জ্ঞানার্জনের শেষ ফলাফল জানা হলো না আমার।

ঢাকায় পৌঁছে আমার এক বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করলাম। সে আমার জন্য একটা বজরা নৌকা ভাড়া করে দিল কুমিল্লা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। পরদিন সকালে সেই নৌকায় চড়ে আমি কুমিল্লা পৌঁছালাম সন্ধ্যার দিকে। কুমিল্লায় ত্রিপুরা রাজ্যের ইংলিশ এজেন্টের বাড়িতে উঠলাম। তিনি আমার জন্য একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করলেন যেটা আমাকে ফেনী নদী পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

ফেনী নদীর অবস্থান হলো চট্টগ্রাম আর ত্রিপুরা জেলার সীমানায়। ফেনী নদীর ওপাশে আমার জন্য একটা ঘোড়া তৈরি থাকার কথা। কুমিল্লা থেকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছিল চট্টগ্রামে। কিন্তু ফেনী নদী পার হয়ে কোনো ঘোড়ার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে পথঘাট সব ভেসে গেছে। সব গাড়িঘোড়া যোগাযোগ-ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে আছে।

অতঃপর উপায় না দেখে সেখান থেকে বাকি পথটা আদি অকৃত্রিম পদযুগলকে ভরসা করে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সঙ্গী নুরুদ্দিন আর আমি দুজনেই জুতোমোজা খুলে ৬০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। তিনদিন পথ চলার পর ভিজে জবজবে অবস্থায় ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত অবস্থায় চট্টগ্রাম পৌঁছালাম।

৪৩. লুসাই অভিযানের প্রস্তুতি

রাঙ্গামাটি পৌছানোর পর আমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিয়মিত ড্রিল শুরু করালাম। আগামী অভিযানের প্রস্তুতি জোরদার করার চেষ্টা। কিন্তু এদিকে আমার শরীর আবারো খারাপ করল। এরকম ঘন ঘন অসুস্থ হওয়া শরীর নিয়ে আমি অভিযানে কতটা নামতে পারব সে দুশ্চিন্তা আমার মধ্যে প্রবলভাবে চেপে বসল। আমি বেহালা বাজিয়ে আমার মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করলাম।

আমাকে আরো একজন ইংরেজ অফিসার দেওয়া হলো আমার সহকারী হিসেবে। তাকে সীমান্ত ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োজিত করা হলো।

কদিন পর সরকারের কাছ থেকে প্রশংসাসূচক চিঠি পেলাম একটা। যেখানে আমাকে এই অভিযানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আমার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে নানা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি দুনিয়ার এক কোনায় নিভৃতে যে কাজটি করে যাচ্ছিলাম সেটার খবর এখন দ্রুতগতিতে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এ পদ্ধতিটাকে ঠিক সুখকর বলা যাবে না।

জুলাই মাসের মধ্যে আমি পার্বত্যবাসীদের বহুল ব্যবহৃত প্রবাদসমূহের একটা সংকলন করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এই প্রবাদগুলোর মধ্যে বেশ অনেকগুলো খুব আকর্ষণীয় এবং বুদ্ধিমত্তায় পরিপূর্ণ।

পাহাড়িদের প্রবাদ সংকলনের ব্যাপারে আমি যে কারণে আগ্রহী ছিলাম তা হলো- পৃথিবীর নানান জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, তাদের

মধ্যেকার মানবিক গুণাবলির প্রকাশগুলোর মধ্যে একটা অভিন্নতা আছে। চিন্তাভাবনার দিক থেকে এই প্রবাদগুলোর সাথে পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলোর প্রবাদগুচ্ছের অনেক মিল পাওয়া যায়। সেটা এশিয়ান হোক আর ইউরোপিয়ান হোক। আদিম যুগ থেকে পৃথিবীর মানুষ বিবর্তিত হতে হতে এই বর্তমানে এসে পৌঁছেছে তাদের মধ্যে একটা বিরাট মিল পাওয়া যায় এসব প্রবাদের মাধ্যমে। তাতে বোঝা যায় সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষের চরিত্র অনেকটা একইভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। এই প্রবাদগুলো যে কোনো দেশের যে কোনো সভ্যতার মানুষের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য। এই যে আধুনিক বলে বিবেচিত কৃত্রিম সভ্যতার যে বিশাল জগৎ, তার খোলস ছিঁড়ে যা পাওয়া যাবে সেটা হলো আদি অকৃত্রিম সাধারণ মানব চরিত্র।

দিন যতই গড়াচ্ছিল অনাগত মিলিটারি অপারেশনের প্রস্তুতি নিয়ে তাড়াহুড়ো তত বাড়ছিল। আমাকে বোমাং অঞ্চলে যেতে হলো সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য। ওদিকের ক্যাম্পে বোমাং রাজার লোকজনকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। সীমান্ত বাহিনীর পরিকল্পনা হলো ওদিকের সব লোককে যতটা সম্ভব কাজে লাগানো। মালামালের নিরাপত্তা দেখভাল করা, নজরদারি করা ইত্যাদি কাজেও অনেককে লাগানো হলো।

বোমাং রাজার কাছ থেকে ফিরতে না ফিরতে মং রাজার এলাকায় যেতে হলো কারণ তাঁর এলাকা থেকে কুলি হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয়েছে। আমি যথাসম্ভব নৌকার মধ্যে রাত্রিযাপন করলাম পাহাড়ি মশার আক্রমণ আর ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা পেতে। পাহাড়ের ঝোপ-জঙ্গলগুলো সব মশার আখড়া।

৮ অক্টোবর ১৮৭১ তারিখে অভিযানের প্রাথমিক পর্বের সূচনা হলো। সেনাবাহিনীর ডেপুটি কমিশনার জেনারেল এবং অ্যাসিসট্যান্ট কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের দূত এলেন আমার দফতরে। আমাকে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা অবিরাম প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন। এখানকার বাসিন্দা এবং এই অঞ্চলের নানান বিষয়ে জানতে চাইলেন। তারপর তারা নিজেরা সীমান্তের দিকে চলে গেলেন সরেজমিন দেখে আসার জন্য।

অক্টোবরের ২৮ তারিখ আমি চট্টগ্রামে গেলাম জেনারেল ব্রাউনলোর সাথে দেখা করার জন্য। তিনি এই দক্ষিণ কলামের নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর সাথে দেখা করার আগে আমি নিজের সামরিক পোশাক পরে কেতাদুরস্ত হয়ে নিলাম যাতে আমার সেনা পদবি এবং যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর চোখে কোনো সন্দেহ না থাকে।

তিনি খুব অমায়িক হাসিখুশি নীল চোখের একজন ভদ্রলোক, যিনি তাঁর পেশাগত জীবনের চূড়ান্ত উৎকর্ষে অবস্থান করছেন। তাঁর চোখ দুটো এত ধারালো যে শত্রুপক্ষের কাছে সেটা ভীতিকর মনে হবে। তাঁকে প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেল আমার। তাঁর সাথে কাজ করতে আমার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি এবং এখানকার কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়ে একটা বেসরকারি প্রতিবেদন লিখে লর্ড মেয়োর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে পাঠাব। কিন্তু ইচ্ছেটা বাতিল করতে হলো কাজটা সুখকর নয় বলে। তাছাড়া রিপোর্টে হয়তো এমন কিছু লেখা হবে যেটা জেনারেল ব্রাউনলো কিংবা বেঙ্গল গভর্নমেন্টের পছন্দ নাও হতে পারে।

নভেম্বরের শুরু থেকে আমাকে লুসাই অভিযানের দক্ষিণাংশের পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হলো। আমার আগের কাজের ভার দেওয়া হলো এক বেঙ্গল সিভিলিয়ান আইরিশ অফিসারকে। যদিও তাঁকে দেখে এই কাজের জন্য উপযুক্ত মনে হলো না। কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না।

লুসাই অভিযান শুরু করার জন্য শত্রু অঞ্চলে প্রবেশ করার আগে পুরো বাহিনীকে কাসালং এলাকায় জড়ো করা হলো। আমি সেখানে ফাঁকফোকরগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করছিলাম। ওদিকে রতন পুইয়াকে আগেই বলে রেখেছিলাম আমাদের এদিক থেকে কোনোরকম যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে সে যেন ঘাবড়ে না যায়। তারা যদি আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তা হলে তার গোত্রের কারো ক্ষতি হবে না।

আমার একটা আশা আছে রতন পুইয়া আর তার গোত্রকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজে লাগাব হাওলংদের কাছ থেকে আমাদের লোকদের উদ্ধার করার কাজে। কলকাতা থেকে স্টিমারযোগে শত শত সৈন্যবাহিনী চট্টগ্রামে এসে পৌঁছাচ্ছিল। তারপর চট্টগ্রাম থেকে নৌকাযোগে সীমান্ত এলাকায় আসছে। কর্নেল ম্যাকফারসনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় গুর্খা রেজিমেন্ট সবার আগে এসে উপস্থিত হলো। গুর্খারা দেখতে ছোটখাটো কিন্তু শরীর বেশ গাট্টাগোট্টা। নিজ নিজ অফিসারের নেতৃত্বে তাদের পুরো বাহিনীকে খুব উৎফুল দেখাচ্ছিল।

আমি আমার সহকারী মি. ক্রাউচকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দেড়শ লোক দিয়ে ডেমাগিরিতে পাঠালাম একটা ঘাঁটি তৈরি করার জন্য। জায়গাটা রতন পুইয়ার গ্রামের কাছাকাছি। নভেম্বরের ১২ তারিখ রতন পুইয়া দুই কনিষ্ঠ মাতব্বরকে সাথে নিয়ে আমাদের কাছে এসে জানালো সে এই অভিযানে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে রাজি আমি জেনারেল ব্রাউনলোর সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। জেনারেলকে সে তার গ্রামে বেড়াতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। জেনারেল প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি সময় সুযোগ পেলে যাবেন।

এই অভিযানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে যেটাকে দেখা যাচ্ছে সেটা হলো এত বড় একটা বাহিনীর জন্য রসদ সরবরাহ। সব ধরনের সরবরাহ চট্টগ্রাম থেকে নৌকায় করে কর্ণফুলী নদী দিয়ে ডেমাগিরিতে আনতে হচ্ছে।

তাওংথা গোত্রের মোড়লদের পাঠানো কুলিরা সব এখানে জড়ো হতে শুরু করেছে। তাদের প্রধানত কাজে লাগানো হচ্ছে ক্যানুতে করে মালামালগুলো নদীর উজানে পাঠানোর জন্য। ছোটখাটো গুর্খা সৈন্যরা তাওংথা বা লুসাইদের মতো নৌকা বাইতে জানে না। নৌকা চালানো দূরের কথা তাদের কেউ কেউ

এমনকি নৌকাতে ঠিকমতো বসতেও পারে না। নৌকায় চড়তে গিয়েও সেটা উল্টে দেয় মাঝে মধ্যে।

নভেম্বরের ১৬ তারিখে জেনারেল ব্রাউনলো, কর্নেল ম্যাকফারসন আর আমি আলাদা আলাদা নৌকায় করে কাসালং থেকে ডেমাগিরির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। প্রত্যেকটা নৌকায় চারজন করে পার্বত্যবাসী মাঝি আছে। আমরা উঠানছত্র নামক জায়গায় রাত্রি যাপন করলাম। এখানে বালির মধ্যে কিছু কাছিমের ডিম দেখলাম, যেগুলো আমাদের খিচুড়ির সাথে রান্না করে খাওয়া হলো।

পরদিন আমরা ডেমাগিরি পৌঁছে দেখলাম বেশ বড় একটা এলাকা পরিষ্কার অল্প সময়ের মধ্যে ভালো রকমের একটা সৈন্যাবাস তৈরি করা হয়েছে। মি. ক্রাউচের নির্দেশে এখানকার লোকেরা সেটা তৈরি করেছে। জেনারেল সাহেব খুব সঙটি প্রকাশ করলেন।

ডেমাগিরি ঝরনার কাছাকাছি এলাকায় লুসাইদের একটা গোপন নজরদারি কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল। নদীর স্রোত যেখানে একটা পাথুরে বেসিনে আছড়ে পড়ছিল সেখানে পাহাড়ের ওপর একটা গাছের ডালে বেতের তৈরি দোলনা ঝুলছিল। ওখানে বসে কর্ণফুলী নদীর অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু আশপাশে কাউকে দেখা গেল না। যে রাতে আমাদের অগ্রগামী পার্টি সেখানে পৌঁছালো সে রাতে ওখান থেকে কেউ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে একটা পাথর ছুড়ে মেরেছিল। ফলে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেছে। নইলে তাদের গোপন নজর কেন্দ্রের অস্তিত্বই জানা যেত না। আমি কয়েকজন স্কাউটকে পাঠালাম ওদিকের অবস্থা বোঝার জন্য। ওরা ফিরে এসে জানালো উত্তরদিকে সাজুক নদীর ধারে লুসাই বাহিনী আমাদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কয়েকজন লোক নিয়োজিত করা হলো ডেমাগিরি জলপ্রপাতের ওপরে একটা কাঠের কপিকল তৈরি করার জন্য। আমরা যখন সামনে এগোবো, তখন আমাদের প্রতি আউন্স খাবার ওই টিলার ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ওটা অবশ্য খুব বেশি উঁচু নয়। মাত্র বিশ ফুটের মতো হবে।

নভেম্বরের ২২ তারিখ জেনারেল ব্রাউনলো পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রতন পুইয়ার গ্রাম পরিদর্শনে গেলেন দ্বিতীয় গুর্খা রেজিমেন্টের একটা দল সাথে নিয়ে। আমিও গেলাম মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার জন্য। গ্রামটা আমাদের ক্যাম্প থেকে পূর্বদিকে তিন মাইল দূরের পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। মাঝপথে রতন পুইয়া এসে জেনারেলকে বরণ করে নিয়ে গ্রামের দিকে পথ দেখিয়ে চলল। আমরা সেখানে গিয়ে সাথে আনা খাবারদাবার দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারলাম। সেই সাথে পাহাড়ি মদ। জেনারেলের সম্মানে একটা গয়ালও জবাই করা হলো। গয়ালের মাংস কেটে দুটো ঝুড়িতে করে আমাদের ক্যাম্পে পাঠালো।

জেনারেল ব্রাউনলো আর তাঁর সঙ্গীরা বিকেলে ফিরে গেলেন। আমি রয়ে গেলাম লুসাই গ্রামে। কারণ রতন পুইয়া তার পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে আমার পরিচয় করাতে চায় এবং সামনের অভিযানে তাদের ভূমিকা কী হবে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে চায়।

ওখানে অনেক পানভোজন সহযোগে দীর্ঘ আলোচনা হলো। রতন পুইয়ার ইচ্ছা ছিল নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে কাজ করার। কিন্তু আমি তাকে বললাম যে সেটা সম্ভ না। তা হলে জেনারেল এমন ক্ষেপে যাবেন যে সেটা সামলানো যাবে না।

কিন্তু রতন পুইয়ার সমস্যা হলো সে যদি আমাদের পক্ষে কাজ করে তা হলে অভিযানের পর তাদের গোত্রের ওপর ভয়াবহ অভিশাপ নেমে আসতে পারে অন্য লুসাই গোত্রের পক্ষ থেকে। তাকে সমূলে উচ্ছেদ করে দেবে ওখান থেকে।

আমি তার কাছে প্রতিশ্রুতি রাখলাম যে অভিযানের পর তার গ্রামে একটা পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে এবং জেনারেল ব্রাউনলোর পক্ষ থেকে তার জন্য সুবিচারের আশ্বাস থাকবে। আপাতত আমি তার গ্রামের জন্য ১৫ জন পুলিশ রেখে যাচ্ছি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তার প্রতি সমর্থনের নজির হিসেবে। সে যেন নিশ্চিন্তে আমাদের ওপর আস্থা রাখে। আর এই অভিযানের জন্য যা যা দরকার সব রকমের সহায়তা প্রদান করে।

আমাদের দীর্ঘ আলোচনাপর্বের সমাপ্তি ঘটতে ঘটতে রাত হয়ে গিয়েছিল। তখন রতন পুইয়ার স্ত্রী তার দশ বছর বয়সি পুত্রকে নিয়ে এলেন। আমার কাছে এনে তার হাত দুটো আমার দুই হাতের মধ্যে তুলে দিলেন। এটা হলো আমার কাছ থেকে তার নিরাপত্তার জন্য এক ধরনের স্বীকৃতির আবদার।

ডেমাগিরি ফেরার পর আমি জেনারেলকে সব খুলে বললাম। রতন পুইয়ার গোত্রের সাথে আমার সমস্ত কথাবার্তা আর আলাপ-আলোচনার বিবরণ দিলাম। তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন। বললেন- সামনের দিনগুলোতে আমাকে তাঁর সাথে থাকতে হবে। অতএব কুলিদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অন্য একজন অফিসারকে দায়িত্ব দিতে চান। তিনি ক্যাপ্টেন হুডকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করলেন। আমি কুলিদের ডেকে বললাম, তারা এখন থেকে আমার বদলে ক্যাপ্টেন হুডের সাথে কাজ করবে। তাদের বুঝিয়ে বললাম আমাকে তারা যেভাবে মান্য করেছে তাঁকেও যেন সেভাবে মান্য করে।

কয়েকদিন পর আমাদের কাছে একটা ভীতিকর সংবাদ এলো। শোনা গেল নদীর কাছাকাছি এলাকায় আমাদের শত্রুবাহিনী জড়ো হয়েছে। তারা আমাদের যোগাযোগ আর সরবরাহ লাইন কেটে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। এ কথা শুনে ডেমাগিরি আর কাসালংয়ের মাঝামাঝিতে অবস্থিত উঠানছত্র এলাকার পার্বত্য কুলিরা কাজ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলাবলি শুরু করল। কারণ খিয়ংথা গোত্রের লোকেরা লুসাইদের যমের মতো ভয় করে। এমনকি একজনের মাথা কেটে ফেলার গুজবও ছড়িয়ে পড়ল।

সে রাতে কথাটা আমাদের কানে আসার ঘণ্টাখানেক পর আমি বিশজনের একটা দল দিয়ে রওনা দিলাম। আকাশে কোনো চাঁদ ছিল না, চারদিক অন্ধকার। অন্ধকারে খরস্রোতা নদীপথ দিয়ে চলার সময় মাঝপথে একটা নৌকা উল্টে গেল। চারটা রাইফেল হারিয়ে গেল নদীর জলে। তবে আর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ভোরের দিকে আমরা উঠানছত্র এলাকায় পৌছালাম।

আমার প্রথম কাজ হলো পাহাড়ি কুলিদের আশ্বস্ত করা, অভয় দেওয়া। কিছুক্ষণ পর তাদের একটা দল ডেমাগিরির দিকে রওনা হলো। খোঁজখবর করে জানা গেল এখান থেকে কয়েকমাইল ভাটিতে অস্ত্রধারী কথিত লুসাইদের একটা দলকে নদী পার হতে দেখা গেছে। আমরা সেই জায়গাতে পৌঁছে একটা ট্রেইল দেখলাম। সেটাকে অনুসরণ করে ঘণ্টা দুয়েক চলার পর একটা জায়গা দেখলাম যেখানে ওরা বিশ্রাম করেছে, রান্নাবান্না করেছে। সেই জায়গাতে কিছু চালও পড়ে থাকতে দেখা গেল। চালগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম সেগুলো আমাদের কাছে সরবরাহকৃত চালের মতোই। পাহাড়ি চাল থেকে তাদের পার্থক্য একদম পরিষ্কার।

যেহেতু আমাদের ভাঁড়ারের কোনো চাল লুট হয়নি, সুতরাং আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে ওই লোকগুলো মোটেও লুসাই গোত্রের কেউ না। ওরা আমাদেরই লোক। যারা তাদের রেশনের চাল সরিয়ে ভেগেছে। আমি সুবাদার মোহাম্মদ আজিমকে ওই ট্রেইলের আরো গভীরে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ডেমাগিরি ফিরে গেলাম।

ডিসেম্বরের ২ তারিখে ভেনপোইয়া নামের এক গোত্রপতি এসে আমাদের কিছু খবর দিল। সে জানালো সাইলুরা নির্বিচারে তাদের গয়াল হত্যা করে খেয়ে ফেলছে এবং আমাদের প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। সেও রতন পুইয়ার মতো নিজের গ্রামকে রক্ষার চেষ্টা করছে। কারণ সে জানে আমাদের পক্ষ নেওয়ার কারণে সাইলুরা তাদের গিলে খাবে। আমি তাকেও প্রতিশ্রুতি দিলাম যে এই অভিযানের শেষে তাদের গ্রামকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বাহিনী নিয়োগ করব।

আমি পাহাড়ি কুলিদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। তারা কেউ আমার হুকুম ছাড়া কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। আমার অন্য অফিসারেরা কেউ এখানকার ভাষা জানে না। কিন্তু আমার একদণ্ড সময় নেই তাদের এসব শেখাব।

২৭তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আগমনে আমাদের বাহিনী আরো চাঙ্গা হয়ে উঠল তারা কাসালং থেকে ডেমাগিরি পর্যন্ত পুরো এলাকা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মার্চ করতে করতে এসেছে। ইংল্যান্ডের পার্বত্যবাসী বাহিনীগুলোর মতো তারাও বাঁশি বাজিয়ে, বাদ্য বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এসেছে। ক্যাম্পে প্রবেশ করেই তারা পাঠান কায়দায় হুংকার দিয়ে উঠল সম্মিলিতভাবে। তাদের হৈ হুল্লোড়ে পুরো এলাকার মধ্যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব চলে এসেছে।

যে জিম্মিদের উদ্ধার করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য তাদের অধিকাংশই হাওলং গোত্রের হাতে। হাওলং আর আমাদের মাঝখানে সাইলু গোত্রের গ্রামগুলোর অবস্থান। আমরা চেষ্টা করছিলাম যদি সম্ভব হয় সাইলুদের নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখার জন্য। কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছানোর আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তারা এত ধৃত এবং পিছলা স্বভাবের যে তাদের সংলাপে আনার জন্য কোনো চেষ্টাই সফল হলো না।

অতএব তাদের নাগাল পাওয়ার জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী খুঁজে বের কর হয়ে পড়ল যে আমাদের হয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

ডিসেম্বরের ৮ তারিখ আমরা লেঙ্গুরা নামের এক গোত্রপতির খোঁজে একটা গ্রামে গেলাম। শুনেছি সে সাইলুদের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতার আপন ভাই। তার কোনো অযোগ্যতার কারণে কিংবা দুর্ভাগ্যের কারণে সাইলুদের মূল দলের কাছে অবহেলিত।

কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাকে হতাশ হতে হলো। গিয়ে দেখলাম আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে পুরো গ্রামটাই খালি করে সবাইকে নিয়ে পালিয়েছে। আমার লোকেরা এদিকসেদিক খুঁজে একটা শুয়োর, দুটো গয়াল আর পঞ্চাশ মণের মতো ধান পেল।

মনে হলো গ্রামবাসীর এই পলায়ন অস্থায়ী, তারা আবারো ফিরে আসবে। আমি তাই একটা দলকে ওখানে অ্যামবুশ করে থাকার জন্য রেখে এলাম। সত্যি সত্যি রাতের বেলা লেঙ্গুরা নিজেই ধরা পড়ল আমার লোকের হাতে। সে তার গয়াল দুটোর খোঁজ করতে এসেছিল।

ক্যাম্পে ধরে আনার পর আমি দীর্ঘ সময় ধরে তাকে নানা ভাবে পোষ মানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেলাম। সে আমার সকল প্রস্তাবের প্রতি বোবা কালা হয়ে থাকল। এমনকি তাকে দুটো গয়াল আর একটা শুয়োরের মূল্য বাবদ দেওয়া টাকাগুলো আমার পায়ের কাছে রেখে দিল।

তাকে দুয়েকদিন আটকে রাখার পর অবশেষে আমাদের দূত হিসেবে পাশের একটা গ্রামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। ওই গ্রামের প্রধান ভেনলুলার কাছে একটা বার্তা পাঠিয়ে বললাম যে তাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে হাওলংদের এলাকায় যাওয়ার পথে যদি আমাদের বাধা না দেওয়া হয় তা হলে সাইলুদের কোনো ক্ষতি আমরা করব না।

সন্ধ্যার দিকে আমি হাঁটতে বের হলাম। লেঙ্গুরা যেদিকে গেছে সেদিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলাম ভেনলুলার গ্রামের দিকে। কিন্তু চাল বেয়ে অল্প কিছুদূর উঠতেই আমার মাথার পাশ দিয়ে একটা গুলির মতো কিছু ছুটে বেরিয়ে গেল। তাতে আমি ইঙ্গিতটা পেয়ে গেলাম। ওদিকে গেলে বিপদ আছে। অতঃপর ক্যাম্পে ফিরে এলাম। আমাদের হেডকোয়ার্টার এখন ডেমাগিরি থেকে আরো এগিয়ে সাজুক নদীর কাছে ভেনলুলার গ্রামের কাছে চলে এসেছে।

জেনারেলের শরীরটা তেমন ভালো না। পার্বত্য এলাকার বিরূপ আবহাওয়ায় এর চেয়ে ভালো থাকার কথাও নয়। এখানে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। তবে এখানকার বুনো পরিবেশে আর গুর্খাদের দ্রুত গতির কর্মতৎপরতা দেখার মতো। চোখের পলকেই তারা একটা ঘোর জংলা এলাকাকে কেটেছেঁটে পরিষ্কার করে বাসযোগ্য করে ফেলেছে। সন্ধ্যার মুখে আমরা একটা নির্জন বনভূমিতে যাত্রাবিরতি করলাম। অস্ত্রশস্ত্র স্তূপ করে রাখা হলো একটা জায়গায়। তারপর চারদিকে কিছু সময়ের জন্য শুধু দা আর কুকরি দিয়ে গাছ কাটার শব্দ শোনা গেল।

আধঘণ্টার মধ্যেই নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনে কয়েকটা কুঁড়েঘর তৈরি করে ফেলা হলো। আমাদের পুরো বাহিনীর কাছে তাঁবু জাতীয় কোনো জিনিস নেই। আমরা অস্ত্র গোলাবারুদ আর খাবার বাদে বাকি সব জিনিস বাদ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। ঘরবাড়ির আমরা শত্রুপক্ষের ওপর নির্ভর করি। ওদের কাছ থেকে বাড়ি দখল করে সেখানে আ ানা গাড়ার পরিকল্পনা করি। ওটা পাওয়া না গেলে নিজেদের জন্য ছোটখাটো কুঁড়ে তৈরি করে তাতে কোনোমতে রাত্রিযাপন।

ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে লেঙ্গুরা ফিরে এলো। সে জানালো যে ভেনলুলার গ্রামে পাঁচ বা ততোধিক গোত্রপ্রধান এবং তাদের অনুসারীরা জমায়েত হয়েছিল। তারা সবাই মিলে লেঙ্গুরাকে বলে পাঠিয়েছে যে সে যেন আমাদের এক্ষুনি এই এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। শুধু এই শর্তে তারা আমাদের জন্য কাজ করতে পারে কিংবা আমাদের জিম্মিদের উদ্ধারের জন্য সহযোগিতা করতে পারে। আমরা যদি আর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি, তারা আমাদের আক্রমণ করবে।

মস্তবড় বেকুব এরা। আমি লেঙ্গুরাকে পুরস্কৃত করলাম তার এই বার্তার জন্য। জেনারেলকে তার বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার পর তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন। পরদিন সকালেই ভেনলুলার গ্রাম আক্রমণ করার হুকুম জারি করলেন।

৪৪. সাইলু চিফ ভেনলুলার গ্রামে

পরদিন সকালে দুটো দলে বিভক্ত হয়ে কুয়াশার মধ্যে অগ্রসর হতে লাগল আমাদের বাহিনী। ডানদিকে মেজর ম্যাকিনটায়ারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় গুর্খা ব্যাটেলিয়নের দলটা এগিয়ে গেল। ওটা আসলে সাইলুদের বোকা বানাবার জন্য পাঠানো হয়েছে। ওরা সাইলুদের ব্যস্ত রাখার অবকাশে কর্নেল ম্যাকফারসনের নেতৃত্বে আসল বাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে পাহাড়ের উপরিভাগে অবস্থিত গ্রামে ঢুকে পড়ল। আক্রমণের শুরুতেই ভেনলুলা তাদের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমরা গ্রাম পুরোপুরি দখল নেওয়ার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একজনের মৃতদেহ পাওয়া গেল। পালাবার সময় কয়েকজন আহত বা নিহতের দেহ নিয়ে ওরা পালিয়েছে আমরা পলাতক

সাইলুদের অবস্থান জানার জন্য কয়েকজন গুপ্তচরকে পাঠালাম। সন্ধ্যার সময় তারা ফিরে এসে জানালো তারা উত্তরদিকে পালিয়ে গেছে। পালাবার সময় পথে পথে নানান ধরনের জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে গেছে। যার মধ্যে একটা মৃতদেহও আছে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটা কোটও পাওয়া গেছে আরেকটা ঝুড়িতে বাঙালি মিস্ত্রিদের ছোটখাটো কিছু জিনিসও মিলেছে।

এতে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্রিটিশ এলাকায় যেসব হামলার ঘটনা ঘটেছিল তাতে সাইলুরাই জড়িত ছিল। তাদের কারণেই এই অভিযানের সূচনা করতে হয়েছিল। নিজেরা দোষী বলে ওরা শুরু থেকেই আমাদের সাথে কোনোরকম সমঝোতার পথে রাজি হয়নি।

জেনারেল এখনো সুস্থ হননি। তাঁর জন্য খারাপ লাগছে। কারণ তিনিই সত্যিকারের নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁর সাথে যারাই কাজ করে তাদের সবার মধ্যে উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। কিন্তু শরীরের এই নাজুক অবস্থার কারণে তিনি তাঁর কাজকে বাধাগ্রস্ত হতে দেননি। তিনি পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলছেন। তাঁর কাজ ঠিকমতো চালিয়ে যাচ্ছেন আগের মতোই।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে ভেনলুলার গ্রামে একটা খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা হবে সেই উদ্দেশ্যে আশপাশে গুপ্ত স্থানের খোঁজে লোক লাগানো হলো। তাদের লুকানো খাদ্যসম্ভার খুঁজে বের করে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

এই পর্যায়ে জিম্মিদের উদ্ধারের উপায় নিয়ে একজন কূটনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ আমার দায়িত্ব শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু সাইলুদের সাথে কিছুতেই কোনো সম্পর্ক গড়া যাচ্ছে না। মরিয়া হয়ে আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। রতন পুইয়া আমাদের সাথে কাজ করছে, তার সাথেও ওদের সম্পর্ক ভালো না। ফলে তাকেও দূত হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। তার ওপর একটা বড় ঝামেলা হলো আমাদের সকল রসদ আনতে হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে। অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসব রসদ এখানে এসে পৌঁছায়। এদিকে শত্রু পালাবার সময় তাদের সকল রসদ পুড়িয়ে দিয়ে গবাদিপশুকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ ভোরবেলা আমি নতুন কোনো পরিকল্পনা করার কথা ভাবতে বসলাম। কিন্তু দুহাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বসে চারদিকের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এতই মোহিত হয়ে পড়লাম যে আমার সকল দুশ্চিন্তা মুছে গিয়ে অনাবিল এক আনন্দের ভেতর ডুবে গেলাম। আমার সামনে ছড়িয়ে আছে অপরূপ এক পার্বত্য স্বর্গরাজ্য।

বিস্তীর্ণ বনভূমির মধ্যে জেগে থাকা বেগুনি রঙের পর্বতচূড়াগুলোর ফাঁক দিয়ে ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছিল। সেখান থেকে ভেসে আসা শীতল মৃদুমন্দ হাওয়া যেন আমাদের শত্রুদের বার্তা বহন করে আনছিল। ওদিকের পর্বতগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠা গ্রামগুলোতে আমাদের প্রতিপক্ষের

বসবাস। গোটা সাইলু অঞ্চল এখন আমাদের চোখের সামনে। একদিনের যাত্রাপথের মধ্যে অন্তত ছয়টি গ্রামের অবস্থান। তার পরে হাওলংদের এলাকা। ওরা বসবাস করে আরো উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে। অনাবিষ্কৃত ওই অঞ্চলটা সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। যেদিকে কখনো কোনো ইংরেজের পা পড়েনি।

আশপাশের সকল উপত্যকা তুষার শুভ্র কুয়াশায় পরিপূর্ণ। দেখে মনে হবে নরম তুলোর নিচে ঢাকা পড়ে আছে সমগ্র বনাঞ্চল। এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে পেকে ওঠা সোনালি রঙের শস্যখেত দেখা যাচ্ছে। সকালের রোদে সেগুলো আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আরো দূরের দিগন্তে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে গাঢ় বেগুনি রঙের পার্বত্য সারি, গুগুলো সম্ভবত বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য আরো ওপরে উঠে গেলে ওটাকে দেখে মনে হলো বিপুল ফেনায়িত এক মহাসমুদ্র আমার সম্মুখে পড়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। আমার মনে হতে লাগল ওই সাদাফেনাগুলো বিশাল জলরাশি, আমি যেন সেখানে ডুবে গেছি—মনে হচ্ছে আর পাঁচ মিনিট বাদে আমি পরপারের উদ্দেশ্যে রওনা দেব।

আমরা এখন পাহাড়ের যে উচ্চতায় উঠেছি এখানকার আবহাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর। এই আবহাওয়ায় জেনারেলের স্বাস্থ্যেরও বেশ দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। বাতাস বেশ শুষ্ক এবং ঠান্ডা। খিদে বাড়িয়ে দেয় এমন আবহাওয়া। আমি এখানকার পরিবেশটা বেশ উপভোগ করছি। প্রতিদিনের যে পরিবর্তন, অ্যাডভেঞ্চার সবকিছুই আমার কাছে উপভোগ্য। রাতের বেলা ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসে গল্পগুজব করা সত্যি আনন্দদায়ক।

এসবের মধ্যেই আমরা একবার লুসাইদের হাতে আক্রান্ত হলাম। আমাদের রসদ সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করল ওরা। একদিন আমাদের একটা দল ডাক নিয়ে আসার সময় এক গুর্খা সৈন্যকে ওরা গুলি করল। কিন্তু তারাও রেহাই পেল না। পাল্টা আক্রমণ করে তাদের দুজনকে হত্যা করা হলো।

ডিসেম্বরের ২১ তারিখ কর্নেল ম্যাকফারসনের নেতৃত্বে আক্রমণ চালিয়ে লাল হিরার গ্রামটা দখল করে নেওয়া হলো। আমরা দূর থেকে খুব উৎকণ্ঠার সাথে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে সেই আক্রমণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। গ্রামটা এখান থেকে তিন চার মাইলের মধ্যে অবস্থিত। বেশ গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল এখান থেকে। জেনারেল খুব সন্তুষ্ট হলেন যখন কর্নেল ম্যাকফারসন পতাকার সংকেতের মাধ্যমে জানালেন যে আমাদের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই গ্রামটা দখল করা গেছে। শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বড় একটা শস্যগোলা দখল করা হয়েছে।

অন্যদিকে মেজর ম্যাকিনটায়ার আরেকটা দল নিয়ে উত্তরদিকে আক্রমণে ছিলেন। সেখানে তিনি দুটো গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে ছাপ্পান্নটা ধানের গোলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা গ্রামে সাইলুদের মজবুত একটা দুর্গ ছিল। সাইলুরা তেমন কোনো ছাড়াই পালিয়ে গেছে। ওদের গ্রাম থেকে বেশকিছু

গবাদিপশুও অধিকার করা গেছে। যেটা আমাদের খাদ্যভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হলো।

আমার কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখলাম। আমি সাইলুদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমাদের যোগাযোগ হতো চিৎকার করে। আমাকে সেই পুরনো গীতই বারবার গেয়ে যেতে হচ্ছিল—'তোমরা যদি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করো, তা হলে তোমাদের ওপর কোনো আক্রমণ করা হবে না।'

কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমন কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যেত না।

ক্যাম্পের মধ্যে ক্রিসমাস পালিত হলো সত্যিকারের ইংলিশ কায়দায়। জেনারেল ব্রাউনলো সম্মুখ সারির সব অফিসারকে তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। ভালো ভালো খাবারদাবারের মধ্যে আমি প্লাম পুডিংয়ের মতো অলৌকিক বস্তু দেখে রীতিমতো তাজ্জববনে গেলাম। এরকম দুর্লভ জিনিস তিনি কীভাবে এখানে হাজির করালেন খোদা মালুম। পরবর্তীতে আমি সহকারী কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের কাছ থেকে এই জিনিস রান্না করার রেসিপি উদ্ধার করেছিলাম।

পরদিন আমরা আরো এগিয়ে গিয়ে সাইলু চিফ ভ্যান হোইয়ার গ্রাম দখল করলাম কোনোরকম প্রতিরোধ ছাড়াই। এটা বেশ বড় একটা গ্রাম, এখানে তিনশর মতো বাড়ি আছে। গ্রামের মধ্যখানে একটা দর্শনীয় রকমের বেদি আছে যেখানে পশু বলি দেওয়া হয়। তার পার্শে নানান জীবজন্তুর খুলি আর কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা গেল। অবশ্য ওখানে মানুষের কোনো খুলি দেখতে পেলাম না।

আমরা ভেন হোইয়ার গ্রামে ঢুকতে না ঢুকতে দেখা গেল অনতিদূরে অবস্থিত ভেন কুংগা আর ভেন হুনার গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সেখানকার বাসিন্দারা। আমি কয়েকজন বাছাই করা লোক যাদের মধ্যে কিছু রতন পুইয়ার গোত্রের, তাড়াতাড়ি করে পাঠিয়ে দিলাম ওখানকার বাসিন্দাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে এই অনর্থক ধ্বংসযজ্ঞ থামানোর জন্য। কিন্তু বিফলে গেল আমাদের সকল চেষ্টা। তারা পুরো গ্রামটা আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

৪৫. তাওয়াং লাং পাহাড়ে

দিনের পর দিন আমরা চলতে চলতে আরো গভীরে যেতে থাকি। মাসের শেষ ভাগে গিয়ে আমরা লুসাই এলাকার একেবারে পেটের ভেতর ঢুকে পড়লাম। তাওরাং লাং নামের পর্বত রেঞ্জে পৌঁছার পর জেনারেল বিপরীত দিক থেকে আসা আমাদের উত্তরের কলামটির সাথে মিলিত হওয়ার আশা করছেন। শত্রু সেই পুরনো কৌশলে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা পারতপক্ষে

যুদ্ধ করতে চায় না। কেবল আমাদের যাত্রাপথে তাদের গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

একদিন তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছিল“তোমরা আমাদের শস্যগুলো ধ্বংস কোরো না।’

আমি বললাম-’তা হলে তোমাদের চিফকে বলো আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।’

তারা বলল-’না না না, তোমরা দূর হয়ে যাও। আমাদের দেশ থেকে সরে যাও। তোমাদের দেওয়ার জন্য আমাদের আর কিছু না থাকলেও যথেষ্ট পরিমাণ গুলি আর বারুদ আছে।’

স্বীকার করতেই হবে খুব সাহসী উচ্চারণ। তাদের আর কিছু না থাকলেও দুঃসাহসের কমতি নেই।

জেনারেলের অনুরোধে আমি কিছু ঘোষণাপত্র তৈরি করলাম তাদের উদ্দেশ্যে 1 বললাম- আমরা লুসাই রাজ্যে অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছি। কারণ লুসাইরা মহারানির কিছু প্রজা ধরে নিয়ে এসেছে। আমরা তাদের মুক্ত করতে এসেছি। লুসাইরা যদি আমাদের সাথে আলোচনা করতে চায় তা হলে তাদের দূত পাঠাতে পারে।

ঘোষণাগুলো বাংলা এবং বার্মিজ ভাষায় লিখে জঙ্গলের গাছের সাথে পেরেক দিয়ে টিকে দিলাম পথে পথে। আমরা যতগুলো গ্রাম অতিক্রম করেছি সব জায়গায় এরকম পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু লুসাইরা আগাগোড়া নিরক্ষর। তাদের কেউ লিখতে বা পড়তে পারে না। এসব পোস্টারের ভাষা তাদের বোঝার কথা নয়। যদি তারা জিম্মিদের কাউকে দিয়ে ওই লেখাগুলো পড়াতে পারে তা হলে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারবে। তা নইলে তারা হয়তো ধরে নেবে ওই জাদুকরী কাগজগুলোতে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা কোনো জীবাণু বা অভিশপ্ত মন্ত্র রয়েছে।

সেদিন আমাদের ছোটখাটো এক গুর্খা সৈন্য লুসাইদের পেতে রাখা হরিণ ধরার ফাঁদে আটকা পড়ল অসাবধানে হাঁটতে গিয়ে। যেইমাত্র সে ফাঁদে পা দিল অমনি তার পা ফাঁদের রশিতে আটকা পড়ে তাকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিল। ত্রাহি চিৎকারে তার সঙ্গীরা ছুটে গিয়ে দড়ি কেটে তাকে উদ্ধার করল। সে জানে বেঁচেছে কিন্তু ভয় আর আঘাত দুটোতে বেশ কাবু হয়ে পড়েছে।

আবহাওয়া ক্রমশ শীতল হতে শুরু করেছিল। রাত এবং ভোর ছিল সত্যিকারের আরামদায়ক পরিবেশে ভরপুর। আমাদের বাহিনী খুব সীমিত খাওয়াদাওয়া করেও বেশ ঝরঝরে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল।

জানুয়ারির ২ তারিখে জেনারেল আর আমি তাওরাং পর্বতের চূড়ায় উঠলাম যদি জেনারেল বাউচারের কলামের কোনো চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু তাদের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

আমাদের চোখের সামনে দিগন্ত জোড়া পার্বত্য এলাকা ছাড়া আর কিছুই পড়ল না। এদিকে সাইলু গোত্রের সবচেয়ে বড় গ্রাম সাইলু সাভুং নামের এলাকা, যেখানে বাস করে তাদের গোত্রপ্রধান সাভুঙ্গা। এই উপত্যকাটি দশ মাইলের চেয়ে বেশি হবে না। তিনটা নদীর মোহনা দ্বারা বিভক্ত ওই গ্রাম। এখানে উত্তরের কাছাড় জেলা থেকে আসা দুটো নদী যুক্ত হয়ে দক্ষিণের কর্ণফুলী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। পূর্বদিকে আমরা হাওলংদের গ্রাম দেখতে পাচ্ছি যেটা প্রায় আট মাইল পর্যন্ত ছড়ানো আছে। এই গ্রামগুলো নিয়ন্ত্রণ করে লাল নোগরা। সাভুঙ্গার জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। এখানে তার শক্ত ঘাঁটি আছে। জেনারেল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই গ্রামটি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেবেন।

সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরদিন দ্বিতীয় গুর্খা রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানিকে ক্যাপ্টেন বেট্রিয়ের নেতৃত্বে পাঠানো হলো পরিস্থিতি বোঝার জন্য। খবর পাওয়া গেল যে ওই গ্রামে সাইলুদের একটা বড় বাহিনী প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি আছে।

পরদিন কর্নেল ম্যাকফারসনের রেজিমেন্ট ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে পুরো এলাকা দখল করে। মেজর ম্যাকিনটায়ার সর্বপ্রথমে এগিয়ে যান তাঁর বাহিনী নিয়ে। তিনিই প্রথম ঘাঁটিটা দখল করেন। আমাদের এক গুর্খা সৈন্য নিহত হয় এই যুদ্ধে, আরো নয়জন আহত হয়। ওই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বেট্রিয়ে নিজেও আহত হয়েছিলেন। গ্রামটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রচুর পরিমাণ শস্যভাণ্ডার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ওই রাতে সাইলুরা আমাদের ক্যাম্পে এসে আমার সাথে যোগাযোগ করে সন্ধির প্রস্তাব দিল। তারা জানালো তাদের গোত্রপতি চিফ সাভুঙ্গা শিগগির হাতির পিঠে চড়ে আমাদের সাথে সন্ধি করতে আসবেন।

আমি বললাম যে তিনি সেটা নিরাপদেই করতে পারেন। কিন্তু আপস করার আগ পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে যাব আমরা। আমি আরো বললাম যে তারা যদি আমাদের কোনোরকম বাধা না দেয় তা হলে তাদের গ্রাম আর ফসলগুলো রক্ষা পাবে।

আমাদের এই নৈশ সংলাপের সময় রতন পুইয়া আমার সাথে ছিল। সে আমাকে ত্বরিৎ পরামর্শ দিল যে যদি সাভুঙ্গা এখানে আসে তা হলে তার মুণ্ডু কেটে সেটা একটা বাঁশের ডগার ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত।

হায় রে লুসাই! তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। আমরা পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করলাম কেউ আমাদের সাথে দেখা করতে আসে কি না। কিন্তু সাইলুদের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।

অতএব আমরা সাভুঙ্গার গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম জানুয়ারির ৬ তারিখে। রাস্তাগুলোর মধ্যে বড় বড় পাথর ফেলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছিল বলে অগ্রসর হতে খুব সমস্যা হচ্ছিল। রাস্তাগুলো ছিল দুর্গম। একবার

হাজার ফুট উঠতে হচ্ছিল, আবার নামতে হচ্ছে। এভাবে আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের বাহিনী নিয়ে। পথে পথে কিছু ঝরনাধারা অতিক্রম করলাম।

কিছুদূর এগিয়ে একটা জুম এলাকা দেখা গেল। প্রায় নয়শ গজ প্রশস্ত পরিষ্কার একটা এলাকা। পাশেই একটা গ্রাম। সেই জায়গাটা লুসাই যোদ্ধায় গিজগিজ করছে। জেনারেল ভাবলেন আমাদের শক্তি প্রদর্শনের এটা একটা উপযুক্ত সুযোগ। তিনি পঞ্চাশজনের মতো গুর্খা সৈন্যকে সামনে পাঠিয়ে দিলেন, যেটার নেতৃত্বে আছেন কর্নেল জেমস হিলস। তারপর তাদের মাথার ওপর দিয়ে লুসাই বাহিনীর ওপর গোলাবর্ষণের নির্দেশ দিলেন।

আমাদের সাথে কুলিদের বয়ে আনা স্টিলের তৈরি সেভেন পাউন্ডার কামান ছিল। তাদের দুটোর মধ্যে গোলা ভরে লুসাইদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হলো। এই কামানগুলো বয়ে আনতে কুলিদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এখন সেই পরিশ্রম সার্থক হলো। পাহাড়ের ওপর থেকে ওই গ্রামের ওপর শেল নিক্ষেপ করার একটা ভালো সুবিধা হলো।

লুসাইরা কোনোদিন এত বড় শক্তিশালী অস্ত্র দেখেনি। প্রথম গোলাটা নিক্ষেপ করার পর শত্রু বাহিনীর প্রতিক্রিয়া ছিল দেখার মতো। তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। পুরো গ্রাম খালি করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

রতন পুইয়া আমাদের এই গোলাবর্ষণ পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করল- 'এটা তো ভয়ানক তাজ্জব একটা যন্ত্র!! বন্দুকের এক নলে গোলা ভরে দেওয়া হলো- আর অন্য নল দিয়ে গুলি বের হয়ে গেল!! এই জিনিসের সাথে কেউ পেরে উঠবে না।

আমরা গ্রামে ঢুকে দেখলাম যে শত্রুপক্ষ আমাদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করার জন্য অসংখ্য পাথর স্তূপ করে রেখেছিল। সেগুলো সরিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে আমাদের বেশ বেগ পেতে হলো। উপরে উঠে দেখলাম তির-ধনুক-বল্লমসহ আরো অনেক অস্ত্রের বিশাল স্তূপ। সব ফেলে ওরা পালিয়ে গেছে। আমাদের শক্তিশালী গোলার আঘাত ওদের সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছে।

ওইদিনই আমি কিছু গুপ্তচরকে পাঠিয়েছিলাম যদি কোনো সাইলুকে ধরে আনতে পারে দূতিয়ালি করার জন্য। কিন্তু সেরকম কাউকে পাওয়া না গেলেও তাদের ফেলে যাওয়া চীনাদের তৈরি চারটা অস্ত্র পাওয়া গেল।

পরদিন ভোরে দেখা গেল সাইলু সাভুং গ্রামে আগুন জ্বলছে। ওরা বুঝতে পেরেছে যুদ্ধে আমাদের সাথে পেরে উঠবে না। তাই নিজেদের গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। ১১ তারিখে আমরা গ্রামটা পুরোপুরি নিজেদের অধিকারে নিয়ে এলাম। আর কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো না।

এখন আমাদের শুধু একটা গ্রাম অধিকার করা বাকি আছে। সাভুঙ্গার কনিষ্ঠ পুত্র লাল জিকা ওই গ্রামের নিয়ন্ত্রণে আছে। বাকি সব গ্রাম হয় ওরা নিজেরা পুড়িয়ে দিয়েছে অথবা আমাদের দখলে এসেছে। এ পর্যন্ত এসে মনে

হচ্ছে সাইলুদের নিয়ে আমাদের আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তারা পরাস্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। আমাদের পরবর্তী সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে হাওলং গ্রামের জন্য। যেখানে আমাদের জিম্মিদের আটক করে রাখা হয়েছে। হাওলংদের গ্রাম এখন আমাদের চোখের সামনে। আমরা যে কোনো সময় ওদিকে আক্রমণ চালাতে পারি।

ওদিকে কলকাতা থেকে পত্র মারফত ভারত সরকার বরাবরই জেনারেলকে চাপ দিয়ে আসছিল যেন অযথা রক্তক্ষয় না হয়, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস না হয়, খাদ্যভাণ্ডার নষ্ট না হয়। যদিও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও এসব এড়াতে পারিনি। আমরা যা করছি তার চেয়ে ভালো আর কী করা যেত। তবুও মানতে হবে গভর্নর জেনারেলের ইচ্ছাই হলো আইন। আমি জেনারেলের অনুরোধে হাওলংদের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ চালাবার আগে একটা শান্তিপূর্ণ দূতিয়ালি করার চেষ্টা করলাম।

অতঃপর আমি রতন পুইয়াকে নিয়ে ৫০ জনের একটা গুর্খা বাহিনী নিয়ে নিকটস্থ হাওলং গ্রামের দিকে রওনা দিলাম। ওই গ্রামটা আমাদের এখান থেকে দেখা যায়। কিন্তু আমরা যেই কাছাকাছি পৌঁছেছি, আবারো পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। গ্রামের বাসিন্দারা ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে পালিয়ে গেল।

এ ধরনের আপসহীন শত্রুতার মনোভাব দেখে রতন পুইয়া খুব হতাশ হয়ে পড়ল। সে আর অগ্রসর হবার পক্ষপাতী নয়। তার অভিমত হলো এইভাবে এগোলে কোনো সমাধান হবে না। তার চেয়ে পেছনের রাস্তা বেছে নেওয়া সবচেয়ে ভালো হবে। তার প্রস্তাব হলো আমরা এখন সাভুঙ্গার গ্রামে ফিরে যাই। তারপর সে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে বেনকুইয়া আর সাভুঙ্গার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। ওই দুই ভাই হাওলংদের প্রধান নেতা। এই প্রস্তাব মেনে নিলে আমাদের আরো দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু আর কোনো উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। অতএব আমরা সাইলু সাভং ফিরে গিয়ে জেনারেল ব্রাউনলোর কাছে আমাদের ব্যর্থতার কথা জানালাম।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেনারেল রতন পুইয়ার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তারপর রতন পুইয়া সীমান্ত ব্যাটেলিয়নের সবচেয়ে দক্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা সুবেদার মোহাম্মদ আজিমকে নিয়ে ঘুরপথে রওনা দিল হাওলংদের সাথে গোপন যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে।

রতন পুইয়াকে বলে দেওয়া হলো যে আমরা তাদের সাথে একমাত্র সেই শর্তে সন্ধি করতে পারি যদি তারা আমাদের সকল জিম্মি মুক্তি দেয় এবং আমাদের হাওলংদের গ্রামে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়। যদি তাতে রাজি না হয় তা হলে আমরা আক্রমণ চালিয়ে তাদের এলাকায় ঢুকে পড়ব, সেটা তাদের জন্য ভালো হবে না।

৪৬. মেরি উইনচেস্টার উদ্ধার এবং সন্ধি চুক্তি

অতঃপর আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার রইল না। আমাদের সৈন্যদেরও বিশ্রামের দরকার ছিল। যদিও তেমন বেশি যুদ্ধ করতে হয়নি, তবু এই বিরান বনভূমিতে শত্রুদের দেশে সীমিত খাদ্য খেয়ে সবাই অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পাহাড় থেকে পাহাড়ে ওঠানামা করতে করতেই অধিকাংশ সৈন্য কাহিল। খাবার বলতে আছে চাপাতি, মাংস আর রাম। এমনকি জেনারেল নিজেও এর চেয়ে বেশি কিছু খাচ্ছিলেন না। খাবারের এই অপ্রাচুর্যতার কারণে সবার স্বাস্থ্যেরই অবনতি ঘটছিল।

তবু কারো কোনো অভিযোগ ছিল না। সবাই পরিস্থিতি মেনে নিয়ে সব অভাব-অভিযোগ হজম করে ফেলছিল চিরাচরিত নিয়মে। রতন পুইয়ার মিশনের ফলাফল আসার জন্য অপেক্ষায় থাকতে থাকতে জেনারেলের মনোযোগ নিবন্ধ হলো নিকটস্থ শেষ সাইলু গ্রামের দিকে। যে গ্রামটা সাভুঙ্গার কনিষ্ঠ পুত্র লাল জিকা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে লড়াই করতে ইচ্ছুক ওরা।

জেনারেল ব্রাউনলো সিদ্ধান্ত নিলেন আক্রমণের। ২১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে আটটার সময় কুয়াশার আবরণ সরে যেতেই আমাদের বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করল। বেলা একটার দিকে আমরা লুসাইদের একটা ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছালাম।

আমাদের বাহিনী যখন অস্ত্রপাতি বের করে আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে তখন ওপর থেকে লুসাইদের ঠেলে দেওয়া বিশাল একটা পাথরধস নামতে শুরু করল। শব্দ শুনেই আমরা সতর্ক হয়ে সরে গেলাম। ভাগ্যক্রমে আমাদের তেমন বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলো না। পরিস্থিতি বেকায়দা দেখে লুসাইরা ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে তাদের গ্রামের দিকে পালিয়ে গেল।

আমাদের বাহিনী এগিয়ে চলল। সাতশ গজ বাকি থাকতে কর্নেল হিল তাঁর সাথে বহন করা ছোট সেভেন পাউন্ডার কামানটা বের করে গোলা ছুড়তে নির্দেশ দিলেন। লুসাইরা এই ভয়ানক অস্ত্রের আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা খুব ঘাবড়ে গেল এত বড় গোলার আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে। দেরি না করে দ্রুত গতিতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল সবাই। আমাদের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই গ্রামটা দখল করা সম্ভব হলো। এটা লুসাইদের খুব শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। যদি ওদের কাছে ভালো অস্ত্রপাতি থাকত তা হলে এটা দখল করা কঠিন হতো।

ওদের শস্যগোলা সবকিছু ধ্বংস করে আমরা সাইলু সাভুং গ্রামে ফিরে এলাম। ফিরে আসতে না আসতেই আমার দূত রতন পুইয়ার দেখা পেলাম। সে অভাবিত একটা কাজ করে এসেছে। যে ব্রিটিশ শিশুটিকে লুসাইরা অপহরণ করেছিল কাছাড় থেকে, সেই মেরি উইনচেস্টারকে উদ্ধার করে এনেছে। মেয়েটাকে চতুর্থ গুর্খা রেজিমেন্টের কর্নেল টিটলারের কাছে পাঠানো হয়েছে,

যিনি ডেমাগিরির দায়িত্বে আছেন। পরে তিনি শিশুটাকে চট্টগ্রাম হয়ে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন।

মেরি উইনচেস্টার ৬ বছর বয়সি ফর্সা সুন্দর চমৎকার একটা শিশু। বাদামি চোখের ইউরোপিয়ান গড়নের মেয়ে। কর্নেল টিটলার যে অফিসারকে রতন পুইয়ার বাড়ি থেকে মেয়েটাকে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তিনি দেখলেন মেয়েটা চিফের বাড়ির বড় কাঠের বারান্দার ওপর বসে বসে অন্য একদল শিশুর সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তার পরনে শুধু নীল রঙের একটা কাপড়ের টুকরো কোমরে পেঁচানো। মুখে একটা পাইপ দিয়ে ধূমপান করছিল আর ছোট ছোট বাচ্চাদের রানির মতো হুকুম দিচ্ছিল বসে বসে। বাচ্চাগুলো তার পায়ের কাছে বসেছিল।

তাকে দেখে মনে হচ্ছিল দীর্ঘ সময় অপহরণকারীদের সাথে থেকে সে ইংরেজি ভুলে গেছে। কিন্তু অফিসারটি যখন পকেটে হাত দিয়ে ওকে চকোলেটের লোভ দেখাল তখন তার স্মৃতির মধ্যে আলোড়ন জাগল, এই প্রশ্নটি তার বহুল পরিচিত। সে সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে দিল চকোলেটের জন্য। তাতে বোঝা গেল তাকে যা বলা হয়েছে সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

প্রথমে মেয়েটাকে কলকাতায় তাদের পারিবারিক বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখান থেকে স্কটল্যান্ডে। ওখানে তার বাবার দিকের আত্মীয়স্বজন আছে। আরো দশ বছর পর সে রয়েল মোরে কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে পাস করেছিল বলে জানা গেছে। যদি তাকে সময়মতো উদ্ধার করা না যেত, তা হলে সে হয়তো বড় হয়ে কোনো লুসাই চিফের বউ হিসেবে পাহাড়ি পোশাক আর গলায় কাঠের মালা পরে ঘুরে বেড়াত বনেবাদাড়ে।

[বিস্তারিত তথ্যের জন্য সংযোজন: মেরি উইনচেস্টার উপাখ্যান

৪৭. রতন পুইয়ার সফল দূতিয়ালি

এই সফলতার পর রতন পুইয়া আরো একটা বড় কাজের পরিকল্পনা নিল। সে উত্তরদিকের হাওলংদের সাথে দূতিয়ালি করার জন্য যাবে। যে গ্রামগুলোতে আমরা অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি সে গ্রামগুলো বিনাযুদ্ধে জয় করা যায় কি না তার চেষ্টা করা। যাওয়ার আগে আমাকে খুব জোর দিয়ে অনুরোধ করল এই দূতিয়ালি চলাকালে আমরা যেন কোনো অভিযান না চালাই। তা হলে তার জীবননাশ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

প্রস্তাবটা বাধ্য হয়ে মেনে নিলেও জেনারেল ওটা পছন্দ করেননি মোটেও। তিনি খাঁচায় বন্দি সিংহের মতো গরগর করছিলেন। এই ধরনের অনাক্রমণ পরিস্থিতি তাঁর কাছে একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। প্রায় নিরুপায় হয়ে তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছিল এটা। তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন যে আক্রমণ চালিয়েও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছিল না। সাইলুদের গ্রামে একের পর আক্রমণ

করে যা বোঝা গেছে, তাতে মনে হয় সামনেও একই ফলাফল হবে। ওরা পালিয়ে বেড়াতে থাকবে, আমরা বাকি জিম্মিদের উদ্ধার করতে পারব না। তাছাড়া আমি রতন পুইয়ার ওপর আস্থা রেখেছি। তাই হাওলং অঞ্চলে আক্রমণ চালানোর আগে আরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

এই সিদ্ধান্তের এক রাত কিংবা দুই রাত পর আমরা রাতের খাবার সেরে জেনারেলের কুঁড়েতে বসে রাবার গেম খেলছিলাম তখন হঠাৎ করে পরপর দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল এবং একজন আহত মানুষের তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এলো। তারপর আরো কয়েকটা গোলাগুলির শব্দ। আমাদের লোকেরা পাল্টা গুলি চালাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের পুরো ক্যাম্প এরিয়ার মধ্যে একটা হুড়োহুড়ির সৃষ্টি হলো যেন পিঁপড়ের বাসা ভেঙে দিয়েছে কেউ। ক্যাম্পে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল দ্রুত। মেক-আপ হাঁকডাকে সরব হয়ে উঠল পুরো এলাকা।

লুসাইদের কেউ অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমাদের এক প্রহরীর বুক লক্ষ্য করে বিশ গজ দূর থেকে গুলি করে দ্রুত বেগে পালিয়ে যায়। বেচারা সৈনিকটা খুব মারাত্মকভাবে আহত হয়। এখানে তার ভালো চিকিৎসা দেওয়ার উপায় নেই। আমরা জেনারেলের কুটিরে ফিরে এলাম। কিন্তু খেলায় মন বসাতে পারলাম না কেউ। সৈনিকটার জন্য সবার মন খারাপ। গুর্খা রেজিমেন্টের মেডিক্যাল অফিসার ড. এলেনের একান্ত প্রচেষ্টায় তাকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু প্রাচ্যদেশীয়ের ভাষায় তার কিসমত বা ভাগ্য খারাপ ছিল। তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেও ওই বছরের শেষ নাগাদ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল গুর্খা সৈন্যটি। সে ঘটনার পর খেলা না জমলেও জেনারেল এ ধরনের অন্য একটা অভিজ্ঞতার গল্প করলেন আমাদের সাথে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের সাথে যুদ্ধ করার সময় সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে যুদ্ধে শতাধিক ব্রিটিশ সৈন্য হতাহত হয়েছিল। সে যুদ্ধের কমান্ডার স্যার নেভিল চ্যাম্বারলেইন এবং কর্নেল হোপও ছিলেন গুরুতর আহতদের মধ্যে।

আমাদের বর্তমান শত্রু লুসাইদের আক্রমণ সে তুলনায় নিহায়েত মশার কামড় এটা যদিও তেমন শক্তিশালী কোনো লড়াই না, কিন্তু খুব বিরক্তিকর একটা প্রতিপক্ষ। আরেকবার রাতেরবেলা ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাদের ঘরের তলদেশ দিয়ে আক্রমণ চালায়। ঘরগুলো লুসাইদের কায়দায় বাঁশের খুঁটির ওপর তৈরি করা হয়েছিল। সেই আক্রমণে অবশ্য কেউ হতাহত হয়নি। আমাদের আশা তিন সপ্তাহের মধ্যে এই অভিযানের সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু আমার কারণে এই এক সপ্তাহ যুদ্ধবিরতি যুক্ত হয়ে মোট সময় চার সপ্তাহে গড়াবে মনে হচ্ছে। জেনারেল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর বাহিনীর প্রস্থ সম্প্রসারণ করবেন একটা ভাসমান কলামের মাধ্যমে।

জেনারেল বাউচার বামদিকের কলাম নিয়ে কাচার থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। আমরা যে সময়ে কাসালং থেকে যাত্রা করি তিনিও সেই সময়েই ওদিক থেকে যাত্রা শুরু করেন। আমাদের এখানে কোথাও মিলিত হওয়ার কথা ছিল। ঠিক কোন জায়গায় আমাদের দেখা হতে পারে কেউ জানে না। আমাদের কাছে এই এলাকার কোনো ম্যাপ নেই। এই এলাকা আমাদের সবার কাছে অজানা। তাই আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না আমরা কতটা এগিয়েছি।

স্বীকার করতে হবে যে দিনগুলো খুব ধীরগতিতে এগোচ্ছিল। আমাদের সবার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠছিল। একজন সৈন্যের কাছে যুদ্ধ না করে বসে অলস সময় কাটানোর মতো বিরক্তিকর বিষয় আর কিছু হতে পারে না। এই সাইলু সাভুং এলাকায় কিছু করার নাই, কিছু দেখার নাই, কিছু পড়ার নাই, কোনো ভালো খাবার নাই। আর কিছু না হোক কোথাও থেকে কোনো খবরাখবর যদি আসত এখানে।

আমাদের পরনের জামাকাপড়গুলো ছিঁড়ে ত্যানা হয়ে যাচ্ছিল। বুটগুলোতে ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। আমরা যেসব কুঁড়েতে বাস করি সেগুলো ভয়ানক ঠান্ডা। এবড়ো-খেবড়ো মেঝেতে শুয়ে ঘুমানো খুব কষ্টকর। এমনকি আমরা সন্ধ্যার সময় যেসব গান গাই, সেগুলো শোকসংগীতের মতো শোনায়। আমাদের সব ভালো ভালো গল্প বলা হয়ে গেছে। এর পর আমাদের শুধু বিরক্তিটাই অবশিষ্ট আছে।

পলিটিক্যাল অফিসারের প্রতি বিরক্ত সবাই। যার ব্যর্থ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সবাইকে এখানে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। ওদিকে কলকাতা থেকে সরকারও বিরক্তি প্রকাশ করে যাচ্ছে অভিযানের এই অনাহূত বিলম্বের কারণে। সবচেয়ে খারাপ কথা হলো জেনারেল এখন নিজেই আক্ষেপ করছেন আমার ওপর আস্থা রেখেছিলেন বলে।

আমি আমার সর্বোচ্চ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে আমার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম। যদিও জানি তার ফলাফলের ওপর আমার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নির্ভর করবে। তা হলেই আমি একটি চকচকে তারাখচিত মেডেল ঝোলাতে পারব আমার বুকের ওপর। যদিও এটা ঠিক যে ব্যাপারটা পতঙ্গের জন্য নক্ষত্র ছোঁয়ার বাসনার সাথে তুলনীয় নয়, তবু একজন সৈনিকের বুকের রিবনে একটা তারকা যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন সবসময় জিইয়ে থাকে। যে মহারথী এই জিনিস উদ্ভাবন করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবে মানব মনের এই দুর্বলতাটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। যুদ্ধে একটা পা হারিয়ে একটা মেটাল ক্রস অর্জন করা। সারাজীবনের সৈনিক জীবনের প্রাপ্তি একটা টিনের তৈরি মেডেল। এসবের লোভে একজন মানুষ তার জীবনের হুমকি তোয়াক্কা না করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সপ্তাহটা শেষ হতে অনেক লম্বা সময় লাগল। জেনারেল আর একদিনও অপেক্ষা করতে রাজি নন। আমিও নই। আমার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ

হয়েছে সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। রতন পুইয়ার কাছ থেকে আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। এখন অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

৪৮. হাওলং অভিযান

হাওলংদের বিরুদ্ধে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। আমাদের ছোট বাহিনীতে ৩০০ জন গুর্খা সৈন্য আছে। সাথে আছে পার্বত্য এলাকায় বহনযোগ্য দুটো সেভেন পাউন্ডার কামান। স্যাপার নামে পরিচিত আধ-কোম্পানি সৈন্য আছে যারা শুধু জঙ্গল কেটে চলার পথ তৈরি করে অগ্রসর হবে। এই পথটা ২৩০০ ফুট নিচে নেমে গেছে দালেসারি উপত্যকার দিকে। তারপর আবার ১৩০০ ফুট উচ্চতার পাহাড়ের খাঁজ ধরে এগিয়েছে কিছুটা পথ। এরপর হাজার ফুটের মতো নিচে একটা পার্বত্য ঝিরির দিকে নেমে গেছে। ওটা পার হয়ে ১৬০০ ফুট ওঠার পর হাওলং এলাকার সীমান্তে পৌঁছে গেলাম অবশেষে।

যখন আমাদের জলের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল, তখন আমি ঠিক করেছিলাম এই পথে আমি খালি পায়ে হাঁটব। প্রথমে আমাদের অন্য অফিসারেরা ভেবেছিল এটা শুধু মজা করার জন্য করা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি শক্ত নুড়ি, কাদাপানি পেরিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে জুতাপায়ে হাঁটা আর খালি পায়ে হাঁটার মধ্যে তুলনামূলকভাবে আমার পন্থাই উত্তম। পরে অবশ্য বাকিরাও আমার দেখানো পথটাকেই বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

আমরা সন্ধ্যার আগে আগে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম এবং সেখানে আমাদের ক্যাম্প করলাম। পরদিন সকালে এসিসট্যান্ট কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল ক্যাপ্টেন বাস্ট এবং আমি দুজনে মিলে সামনের কিছু এলাকা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বের হলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম আমাদের বামদিকে একটু উঁচু একটা জায়গায় পুড়ে যাওয়া একটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। এখনো ধোঁয়া উঠছে। সম্ভবত আগের দিন এই গ্রামটা পুড়িয়ে দিয়েছে তার অধিবাসীরা।

যে টিলার ওপর গ্রামটা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এখন অসংখ্য লুসাই গিজগিজ করছে। আমাদের কাছ থেকে বন্ধুতাসুলভ ইশারা পেয়ে তারা সাড়া দিল। সামান্য কথাবার্তা বলার পর জেনে আমার অত্যন্ত স্বস্তি লাগল যে তারা এখন আপস করতে ইচ্ছুক। আমি তখন তাদের বললাম—'যাও তোমাদের নেতাদের ডেকে নিয়ে এসো। সেই সাথে আমাদের লোকদেরও মুক্ত করে দিতে বলো। তা হলে আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না।'

ক্যাম্পে ফিরে আসার পর এই ঘটনা জেনারেলকে জানানোর পর তিনি খুব খুশি হলেন। আমরা সবাই এরকমই চাইছিলাম। আপসমূলক কথাবার্তা শোনার পর আমাদের বাহিনী আরো অগ্রসর হয়ে চোংমামা নামের একটা গ্রামে পৌঁছাল। এখান থেকে হাওলং চিফ বেনকুইয়া আর সাংবুঙ্গার গ্রাম মাত্র দুদিনের পথ। আমাদের কাছাকাছি আরো চারটি গ্রাম আছে যেটা আমাদের আক্রমণ সীমানার মধ্যে পড়েছে। ওই গ্রামগুলোতে আনুমানিক হাজারখানেক বাসিন্দা আছে।

আমরা দেখলাম জঙ্গলঘেরা চোংমামা গ্রামের মধ্যে অসংখ্য কুঁড়েঘর। যেগুলো তৈরি করেছে ঘর পুড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া সাইলুরা। তাদের খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ওখানে মজুদ রেখেছে। আমরা এগুলো স্পর্শ করলাম না। ওদের যথেষ্ট শায়েস্তা করা হয়েছে। আমরা হাওলংদের কাছ থেকে জানতে পারলাম জেনারেল বাউচারের বাহিনী এখান থেকে চারদিনের দূরত্বে পূর্বদিকে অবস্থান করছে। আমাদের জেনারেল ওই বাহিনীর সাথে মোলাকাত করার আশা ছেড়ে দিলেন। কারণ আমাদের সাথে তাঁর অবস্থানের দূরত্ব অনেক বেশি। আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে পূর্ব দিকে কয়েকসারি পর্বতমালা রয়েছে, যেটা অতিক্রম করলেই ওই বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব। ওটা খুব কষ্টসাধ্য কাজ।

ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ মেজর ম্যাকিনটায়ারের নেতৃত্বে জেনারেল দুটো পর্যবেক্ষক দল পাঠালেন সামনের দিকে। যাতে উত্তরের দিকে যাওয়ার পথঘাটের খোঁজখবর নিয়ে আসতে পারে। দ্বিতীয় আরেকটা দলকে পাঠানো হলো পূর্বদিকে ক্যাপ্টেন বেট্রিয়ের নেতৃত্বে। পূর্বদিকের দলটা ফিরে এসে জানাল ওদিকে একটা নদীর ধারে লুসাইদের একটা বড় সশস্ত্র বাহিনীকে দেখা গেছে। জেনারেল তাদের ফিরে আসতে বলে আমাকে পাঠালেন আসল ঘটনা কী সেটা জেনে আসতে। আমি গিয়ে দেখলাম ওদিকে বেনকুইয়ার লোকেরা তাদের গ্রামের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে।

আমি তাদের বললাম যে তাদের চিফকে ডেকে আনতে। আমি তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমার মনে হলো রতন পুইয়ার পেছনের দিকের দূতিয়ালি এখন ফল দিতে শুরু করেছে। হাওলংদের মধ্যে আত্মসমর্পণ করার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তারা নিজেরা বদমায়েশ চরিত্রের বলে আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না।

সেই রাতে আমি যখন নিজের কুঁড়েতে ঘুমিয়ে ছিলাম তখন বাইরের অন্ধকার থেকে একটা ফিসফিস শব্দ শোনা গেল আমার মাথার কাছে।

'থাংলিয়ানা' (লুসাইরা তাদের উচ্চারণে আমার নাম টম লুইনকে থাংলিয়ানা বলে ডাকে)।

'থাংলিয়ানা! এটা কি শান্তির প্রস্তাব?'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

সেই কণ্ঠ বলে যেতে লাগল—'আমাদের নেতারা কাল ভোরে তালদুং ঝরনার কাছে থাকবে। কিন্তু তোমাকে একা যেতে হবে। আর কাউকে সাথে নিতে পারবে না।'

একটু বিরতি নিয়ে কণ্ঠটা আবারো বলতে লাগল— 'থাংলিয়ানা, তুমি কী শুনতে পাচ্ছ?'

আমি আমার রিভলভারটা অন্ধকারে হাতের মুঠোয় নিতে নিতে জৰাৰ দিলাম—'আমি শুনতে পাচ্ছি।'

তারপর সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বের হলাম রহস্যময় কণ্ঠস্বরের মালিকের খোঁজ করতে। কিন্তু কেউ নেই বাইরে। চারদিক শুনশান নীরব। আমার লোকজনের নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। লুসাই বার্তাবাহক আমাদের সেন্ট্রির চোখ ফাঁকি দিয়ে যেভাবে এসেছিল, সেভাবে মিলিয়ে গেছে নিঃশব্দে। আমি ঘরে ঢুকে পাইপ ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম এই পরিস্থিতিতে আমার কী করা উচিত।

আমি জানি জেনারেল কখনো আমার এই একাকী যাত্রায় রাজি হবেন না। কারণ এটা যদি ফাঁদ হয়ে থাকে, আমাকে যদি ওরা ধরে জিম্মি বানিয়ে ফেলে তা হলে অবস্থা আগের চেয়ে আরো খারাপের দিকে যাবে। কিন্তু আমি যদি একা না গিয়ে আমার সৈন্যদের নিয়ে ওদিকে যাই তা হলে তাদের নেতারা দেখা দেবে না। তারা মনে করবে আমরা কোনো বদ মতলব করেছি।

কিন্তু অতীতে আমি পার্বত্যবাসীদের সাথে একাকী কাজ করতে গিয়ে সফল হয়েছি। তখন আমার পেছনে কোনো বাহিনীর সমর্থন ছিল না। আর এখনকার পরিস্থিতিতে আমার প্রয়োজন আরো বেশি। ওদের সাথে আপস করার ব্যাপারে আমার নিজস্ব নীতি আছে। আমাকে শুধু ব্যর্থতার হিসাব করলে চলবে না। এদের সাথে আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি এরা আমাদের মতো জটিল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বুঝতে সক্ষম না। এরা বিশ্বাস করে ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতিকে। অতীতে এর চেয়ে অনেক ছোটখাটো কারণে আমি নিজের জীবনের ওপর বাজি রেখেছি। এটার জন্যও আমার তাই করা উচিত। অতএব আমাকে যেতেই হবে।

পরদিন ভোরে ক্যাম্পে কেউ জেগে ওঠার আগে আমি রওনা দিলাম। যে পথটা তালদুং ঝিরির দিকে চলে গেছে সেদিক দিয়ে এগিয়ে চললাম। আধমাইলের মতো যাওয়ার পর আমি একটা শব্দ শুনলাম আমার পেছন দিকে। তাকিয়ে দেখলাম এক সশস্ত্র লুসাই আমাকে অনুসরণ করছে।

আরো কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, জঙ্গল থেকে আরো একজন বেরিয়ে তার সাথে যুক্ত হয়েছে। এভাবে শেষ পর্যন্ত দশ থেকে বারোজন লুসাই আমার পেছনে অনুসরণ করে আসছে।

আমার পেছনে কে আসছে তা নিয়ে আমি তেমন গা করলাম না। আমি ধীরস্থিরভাবে সোজা হেঁটে চললাম। পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নেমে যাচ্ছিলাম।

অনেক নিচের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট ঝিরির কাছে পৌঁছালাম। এটাই তালদুং। বিশ ফুটের মতো প্রস্থ একটা ঝিরি। এটা পার হওয়ার জন্য একটা সেতু আছে। একটা মোটা গাছের গুঁড়ি ফেলে সেতুটা তৈরি। তার ওপর দিয়ে হেঁটে পার হতে হবে। ঝিরির উল্টোদিকের পাড়টা খুব খাড়া। সেই খাড়া ঢালের মধ্যে সারি সারি লুসাই যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে তির-ধনুক আর বন্দুক হাতে নিয়ে।

আমার হৃৎপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছি এখানে। আমার বেল্টটা টাইট করে এগিয়ে চললাম ব্রিজটার ওপর দিয়ে। যেতে যেতে ওপাশে তাকালাম। ওই পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শত্রুভাবাপন্ন লুসাইদের অপ্রসন্ন দৃষ্টিগুলো আমার দিকে যে পরিমাণ ঘৃণা বর্ষণ করছিল, সেটা আমি জীবনেও ভুলব না।

সেতু পার হয়ে ঝিরির অন্যপ্রান্তে পৌঁছানোর পর একজন সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ এসে আমার সাথে হাত মেলালেন। তারপর আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললেন। আরো দুই লুসাই আমাদের সামনে ছিল। ওরা আমাদের পথ দেখিয়ে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে আমাকে নিয়ে গেল কিছুদূরের একটা জায়গায়।

ওখানে গোল হয়ে বসে আছে গ্রামের সব মোড়ল আর মাতব্বরগণ। ঝিরি থেকে একটু দূরে বনের মধ্যে সেই জায়গাটা লুসাইদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। মনে হচ্ছিল জঙ্গলের মধ্যে যেন একটা পিঁপড়ের বাসা। দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোকটা যখন আমাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছালেন তখন ভিড় থেকে শোনা যেতে লাগল—

'থাংলিয়ানা, থাংলিয়ানা।'

গহিন পার্বত্য এলাকায় লুসাইদের গ্রামে ঢুকতে না ঢুকতে সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই শত্রুপক্ষের কাছ থেকে এমন অভিবাদন মোটেও আশা করিনি। মাত্র দুদিন আগেও এরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করছিল। নিজেদের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আর এখন ওরা আমার ইংলিশ নামটাকে নিজেদের ভাষায় রূপান্তর করে নিয়ে স্লোগানে পরিণত করেছে অনন্য এক ভালোবাসা আর বিশ্বাসে।

মাতব্বরের দল উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বরণ করে নিল। আমি জানতে চাইলাম, তাদের মধ্যে সাংবুঙ্গা কে? সাংবুঙ্গা এগিয়ে এসে অন্ধকার চেহারায় তার হাতের বন্দুকটা আমার হাতে তুলে দিল। তার ভাই বেনকুইয়া তার কোমর থেকে ছোট একটা তরবারি বের করে আমার গলার কাছে ঝুলিয়ে ধরল। ভাগ্যক্রমে বিনিময় করার জন্য আমার কাছে দুটো মূল্যবান অস্ত্র ছিল। একটা ছোট তলোয়ার আর রুপার হাতলওয়ালা একটা ছুরি—যেটা সিপাহি বিদ্রোহের অনেক আগে আমি নিয়েছিলাম। ওই দুটো জিনিস তাদের দুজনকে দিলাম সন্ধির স্মারক হিসেবে। তারপর আমরা সবাই বসে পড়লাম।

আমি তখন কতখানি স্বস্তিবোধ করছিলাম সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তারা যে খুব সন্ত্রস্ত ছিল সেটা বোঝাই যাচ্ছে। ওদের এই সমর্পিত মনোভাব দেখে আমার নার্ভাস অবস্থা কেটে গেল। খেলায় জিত হয়ে গেছে আমাদের। এই যুদ্ধ অভিযান এখানেই শেষ।

আমি সামান্য লুসাই ভাষা জানতাম আর হাওলং চিফরা সামান্য কিছু বাংলা জানত যেগুলো হাটবাজারে ঘুরতে গিয়ে শিখেছে। ফলে আমাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেটুকু ভাষা বোঝা দরকার সেটুকু বুঝতে খুব বেশি সমস্যা হলো না।

আমি তাদের বললাম, প্রথমে আমাদের জিম্মিদের ছেড়ে দিতে হবে। তারা এবং তাদের বন্ধুগোত্রেরা যেসব ব্রিটিশ নাগরিককে ধরে এনেছে তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, এখন এবং ভবিষ্যতে তাদের এলাকায় আমাদের প্রবেশ করতে দিতে হবে। পরবর্তীকালে তাদের শপথ নিতে হবে তারা যেন ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকায় আর কোনো আক্রমণ না চালায়। যদি এই শর্তগুলো তারা মেনে নেয় তা হলে আমরা এখান থেকে আমাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নেব।

মোড়লরা নিজেরা কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে জানালো যে আমার কথাগুলো সন্তুষ্টচিত্তে শুনেছে তারা। তারা সবাই শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। আমার প্রস্তাবের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত আগামীকাল জানাবে।

ঠিক তখনই আমার কানে এলো ট্রাম্পের বাজনার শব্দ। গুর্খাদের ট্রাম্পের শব্দ ভেসে আসছে ঝিরির অন্যপ্রান্ত থেকে। লুসাইরা সেই শব্দে ছুটে এসে জানালো- ব্রিটিশ সৈন্যরা আসছে। মুহূর্তের জন্য সভা থমকে গেল। মোড়লেরা সবাই পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল। ওটা দেখে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোতের ধারা নেমে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘ভয়ের কিছু নেই। সৈন্যরা ঝিরি পার হয়ে এদিকে আসবে না। ওরা এসেছে জেনারেল সাহেবের নির্দেশে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।’

তারপর আমরা পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

৪৯. লুসাই যুদ্ধের বিজয়লগ্নে

ক্যাম্পে ফিরে এই সুসংবাদটা জেনারেলকে দেওয়ার সময় আমার বুকের ভেতর কতটা আনন্দস্রোত বয়ে যাচ্ছিল সেটা বোঝাতে পারব না। জেনারেল তাঁর সহজাত ঔদার্য দিয়ে বিষয়টার প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেওয়া হবে সে ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিলেন।

আমি নিজেও খুব করে এটাই চাইছিলাম। নিজের হাতে হাওলংদের সাথে এই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটাতে পারলে ভবিষ্যতে তাদের সাথে কাজ করা সহজ হবে আমার জন্য। অভিযান শেষ হওয়ার পর আমাকে যখন কোনো ব্যাপারে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে তখন এটা একটা বাড়তি সুবিধা হিসেবে কাজ করবে। হাওলংরা মনে রাখবে যে আমার পেছনে শক্তিশালী একটা বাহিনী আছে।

১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাকে সেই অনিবার্য শপথ গ্রহণ করতে হলো হাওলং চিফদের সাথে। রক্ত আর ইস্পাত ছুঁয়ে আমরা পরস্পরের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার শপথ দিলাম। শান্তি প্রস্তাবের অংশ হিসেবে হাওলং চিফরা হাতির দাঁত, ঘরে বোনা কাপড়, গয়ালের মাংস ইত্যাদি পাঠাল। পরের দিন জিম্মিদের প্রথম দলটিকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। আরো জানালো বাকি জিম্মিদের দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে এনে অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হবে।

আমাদের ক্যাম্পটা এখন বিভিন্ন চেহারা আর বয়সের লুসাইদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাদের নারী, পুরুষ, শিশুরা এখানে গিজগিজ করছে। কেউ ডিম নিয়ে এসেছে বিক্রির জন্য, কেউ মোরগ, কেউ কাপড়চোপড়, কেউবা পাইপ আর অন্যান্য জিনিসপাতি। তারা বিস্ময়মাখা চোখে শত্রুবাহিনীর ক্যাম্পের নানান জিনিসপত্র ঘুরে ঘুরে দেখছে।

আমাদের নবলব্ধ চুক্তির অধীনে জেনারেল একটা গুর্খা রেজিমেন্টকে একজন সার্ভে অফিসারের নেতৃত্বে বেনকুইয়ার গ্রাম এবং আশপাশের এলাকা জরিপ করার জন্য পাঠালেন। যাতে নিশ্চিত হয় যে চুক্তি অনুসারে সেখানে আমাদের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। সার্ভে অফিসার ওই এলাকার ম্যাপ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নিয়ে গেছেন।

সবাই খুব খোশ আমোদে সময় কাটাচ্ছিল। কারণ অভিযানটা সত্যি সত্যি দারুণ সফল। আমরা যা যা চেয়েছি সবই পেয়েছি।

কিন্তু হায়! সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখেই এমন একটা সংবাদ এলো যেটা আমাদের সব আনন্দ উৎসবকে স্তব্ধ করে দিল।

গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো আন্দামান সফরকালে নিহত হয়েছেন এক উনাত্ত বন্দির হাতে।

আমাদের কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমরা বাকহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের চিন্তাভাবনা অসাড় হয়ে পড়েছিল। এমন হরিষে বিষাদ ঘটনা আর কখনো দেখিনি। এমনকি পরবর্তীকালেও আমরা যখনই সেই অভিযানের সফলতার কথা স্মরণ করি, তখনই আমাদের মনটা ভারী হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডটির কথা ভেবে।

এই ব্যাপারে জেনারেল উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে ছোট একটা ব্রিগেড অর্ডার বা ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না সেই ছোট্ট ঘোষণাটি

সবার বুকের মধ্যে কতটা বেদনার সৃষ্টি করেছিল। কারণ এই অভিযানটা ছিল গভর্নর জেনারেলের একেবারে নিজস্ব পরিকল্পনায় গড়া। তিনি অভিযানের অগ্রগতি নিয়ে সবসময় খোঁজখবর করতেন। এমনকি গত সপ্তাহেও লর্ড মেয়ো জেনারেলকে টেলিগ্রাম করে অভিনন্দিত করেছিলেন অভিযানের সফলতার ব্যাপারে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুব আনন্দিত ছিলেন জেনারেল ও তার বাহিনীর সফলতার বিষয়ে।

এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বাদে আর সবই ঠিকঠাক চলছিল। সাইলুরা এসে আমাদের সাথে আপস করল। তাদের কাছ থেকেও কিছু জিম্মিকে ফেরত পাওয়া গেল। তারাও আর কোনো শত্রুতা না করার ব্যাপারে শপথ নিল। আমাদের অভিযানে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন তারা ভয় পাচ্ছে অভিযান শেষ হওয়ার পর তাদের ওপর হামলা চালাবে হাওলং গোত্র। তাদের এই আশঙ্কা কদিন বাদে সত্যি প্রমাণ হলো। বেনকুইয়া আমার কাছে খবর পাঠিয়ে জানাল যে তারা তাদের এলাকা থেকে সব সাইলুকে উৎখাত করবে। আমরা যদি চাই তারা সাভুঙ্গার দলকে মেরে সাফ করে দেবে।

আমাদের যে বাহিনীটা বেনকুইয়ার গ্রামে গিয়েছিল তারা ফিরে এলো ২২ তারিখে এসে জানাল তাদের সবরকম সহায়তা দেওয়া হয়েছে হাওলং গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে। কোথাও কেউ তাদের বাধা দেয়নি। তাদের এমন খাতির যত্ন করেছে যে ওরা রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছে। ওদের সবাইকে রাতের বেলা লুসাই গ্রামে থাকতে দিয়েছে পাশাপাশি গীতবাদ্য বাজিয়ে শুনিয়েছে।

ওখানে আমাদের আর কোনো কাজ বাকি ছিল না। তাই আমরা গোটা বাহিনী নিয়ে ডেমাগিরি ফিরে এলাম। এর মধ্যে জেনারেল দক্ষিণের হাওলংদের বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযান চালান। তাদের কাছ থেকেও কিছু জিম্মি উদ্ধার হয়। তাদের নতি স্বীকারে বাধ্য করা হয়। এভাবেই আমাদের অভিযানের সমাপ্তি ঘটেছিল।

সমাপ্তি পর্বে এসে আমাদের পুরো বাহিনীর বাইরের চেহারাটা হাস্যকর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এতদিনের পার্বত্য অঞ্চলে ছোটাছুটি করে সবার জামা জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। কারো এক পায়ে বুটজুতো, অন্য পায়ে স্যু জুতো। কারো পরনে লুসাইদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হাতে বোনা জামা। বিচিত্র পণ্যসম্ভার সবার হাতে হাতে। অদ্ভুত দর্শন অবস্থা হয়েছে একেকজনের।

এদিকে জেনারেল ব্রাউনলো তো তাঁর সদ্য সাবেক শত্রু লুসাইদের কাছ থেকে দেখার পর রীতিমতো মুগ্ধ। তিনি কলকাতায় পাঠানো একটা রিপোর্টে লুসাইদের ব্যাপারে লিখেছেন:

‘লুসাইরা সকল পার্বত্যবাসী জাতিসমূহের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের শারীরিক গড়ন, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র সবকিছুই ব্যতিক্রম। তারা সবাই স্বাধীনচেতা নির্ভীক। তাদের চেহারা সদাহাস্যময়। তারা যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে

সেটা চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। তাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতা কিংবা সাহস কোনোটারই ঘাটতি নেই।’

৫০. লুসাই জাতির অনন্য চরিত্র উন্মোচন

আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি তাদের সহজ সরল সচ্ছল সুন্দর জীবন দেখে। আধুনিক সভ্য মানুষের নানাবিধ দুশ্চিন্তা থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি না চাইলেও আমার সামনে কিছু জিনিসের তুলনা চলে এলো। আমরা সুখী হওয়ার যে কায়দাকানুন শেখার চেষ্টা করি, সেটা তাদের জীবনে অনায়াসে বিরাজমান। তাদের সরলতা ও শঠতার তুলনা করলে দেখা যাবে সেটা অনেক অনেক সভ্য ইউরোপিয়ানের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে।

তারা এমন একটা গভীর বনে ছাওয়া পার্বত্য এলাকায় বসবাস করে যেখানকার আবহাওয়া ইতালির মতো। প্রত্যেক মানুষই সমান এখানে। গোত্রপতিরা এখানে শুধু সাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। কোনো গোত্রপতি যদি তার অধিকারের চেয়ে বেশি মাতব্বরি ফলাতে চেষ্টা করে, তা হলে সাধারণ মানুষ তার বদলে কম উচ্চাভিলাষী কাউকে নেতা নির্বাচিত করে।

ওরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জমি চাষ করে। একজন বাঙালি কৃষক এক মাসের খাদ্য উৎপাদন করার জন্য যতটুকু পরিশ্রম করে, ততটুকু পরিশ্রম করে ওরা সারা বছরের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। তাদের মধ্যে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। তাদের সম্পদের নিরাপত্তার জন্য গোত্রপতি একাই যথেষ্ট। তার মুখের কথাই আইন। তাদের যেমন হারানোর ভয় নেই, তেমনি কোনো কিছুর প্রতি অতিরিক্ত মোহও নেই। তাদের জন্য সভ্য জগতের আইনকানুনের বেড়াজালগুলো একটা অযথা বিড়ম্বনা— যেখান থেকে তাদের উপকৃত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তারা যা জানে তার চেয়ে বেশি কোনো জ্ঞান তাদের দরকার নেই। তারা জানে কখন কীভাবে বীজ বপন করতে হয়, কখন ফসল তুলতে হয়। তাদের গাছের শেকড়বাকড় থেকে তৈরি তাদের নিজস্ব ওষুধপত্র আছে। তাদের নারীরা গরম কাপড় বুনতে জানে। তারা জানে জন্তু-জানোয়ারের কাছ থেকে কীভাবে পশম সংগ্রহ করতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে তারা তাদের জীবনের সুখসমৃদ্ধি আর আনন্দের জন্য যা যা করা দরকার তার সবই জানে। তারা জানে কীভাবে সুখী হতে হয়। অসুখী জীবন তাদের প্রভাবিত করতে পারে না। সে যাই হোক। এই বিষয়ে যথেষ্ট আলাপ হলো। এবার কাজের কথায় ফেরা যাক।

আমাদের অভিযানের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটার পর মার্চের শেষভাগের মধ্যে জেনারেল তাঁর লোকজন নিয়ে চট্টগ্রাম চলে গেলেন। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা। আমি তাঁদের সাথে দীর্ঘ চার মাস ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। তাদের বিদায়

দেওয়ার পর আমার বেশ নিঃসঙ্গবোধ হচ্ছিল। আমি আমার নিজের দায়িত্বে ফিরে গেলাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে আবারো আমার কাজ শুরু করলাম।

গত চার মাসে আমার কাজের সারমর্ম এরকম—

আমরা মেরি উইনচেস্টারকে উদ্ধার করতে পেরেছি এবং শ খানেক ব্রিটিশ প্রজাকে মুক্ত করতে পেরেছি লুসাইদের কাছ থেকে। দুটো শক্তিশালী উপজাতি আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিশটার মতো গ্রাম পুড়ে গেছে আমাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে। সব গ্রামপ্রধান আমাদের কাছে নতি স্বীকার করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে ভবিষ্যতে আমাদের সাথে ওরা আর কোনো শত্রুতা করবে না। অন্তত এটুকু বলা চলে আগামী কয়েক বছর সীমান্তে কোনো অশান্তি থাকবে না। তবে আমাদের এই অভিযানের ফলাফল হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য হয়তো আরো অনেক সময় লাগবে। ওই জাতিগোষ্ঠীগুলোর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে হবে। আমরা যদি বর্তমান অবস্থান থেকে সরে আসি তা হলে আবারো আগের অবস্থা শুরু হবে।

জেনারেল ব্রাউনলো এই অভিযানের সময় আমার ভূমিকার ব্যাপারে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন তাঁর চিঠির অংশ কোট করার ব্যাপারে। আজ যদি লর্ড মেয়ো বেঁচে থাকতেন তা হলে আমাদের এই সফলতা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি আমার জন্য যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নিশ্চিতভাবে সেটা আমি অর্জন করতাম। তবু এটাই সান্ত্বনা যে আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতে পেরেছি। ওটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

৫১. পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে সরকারি পরিকল্পনা

সেই সময়টা আমি খুব উপভোগ করছিলাম। ডেমাগিরির উঁচু পাহাড়ে বাঁশের তৈরি একটা জুমঘরের বারান্দায় খড়ের বিছানায় শুয়ে আছি। পাশের একটা জঙ্গল থেকে মৌমাছির গুঞ্জন কানে আসছে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে বাতাসে ভেসে থাকা বুনো ফুলের গন্ধ। এমন একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মতো আনন্দ খুব কমই আছে। অদূরে রূপোলী ফিতার মতো নদী পার হয়ে দৃষ্টি চলে যায় দূরের উপত্যকার দিকে। একটা অপরূপ সুন্দর কালো প্রজাপতি কোথা থেকে উড়ে এসে বসল আমার পাশে রাখা রাইফেলের স্তূপের ওপর। কিছুক্ষণ পাখা থামিয়ে বসে থাকল তারপর আবার উড়ে চলে গেল লুসাইদের আগমনে। তারা কাঁধে বোঝা নিয়ে পাহাড়িদের স্বভাবসুলভ কলকোলাহল করতে করতে আসছিল এদিকে।

সবকিছুর শেষ আছে। কোমল গোলাপি আভার ভোর কিংবা প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নের রাত, সবকিছুই একদিন শেষ হয়। আমাদের লুসাই অভিযানটিও

অবশেষে সমাপ্ত হয়ে গেল। আমি জেনারেলকে বিদায় জানালাম। দ্বিতীয় গুর্খা রেজিমেন্টের চমৎকার অফিসারদেরও বিদায় দিলাম। বেশ কয়েক সপ্তাহ আমরা একসাথে কাটিয়েছি। কর্ণফুলী নদী বেয়ে ওদের বহন করে নেওয়া নৌকাগুলোর দিকে আমি তাকিয়ে ছিলাম দীর্ঘসময়। আবারো আমাকে নিঃসঙ্গ রেখে সবাই চলে গেল চট্টগ্রামের দিকে।

এই সময়টাতে এমনিতেই অভিযানের সমাপ্তি ঘটত, কারণ গরমটা অসহনীয় হারে বেড়ে যাচ্ছিল এখানে। এমনকি প্রবল কষ্টসহিষ্ণু পার্বত্যবাসীর পক্ষেও কঠিন এই গরমকালটা। কালো রঙের গয়ালগুলো পর্যন্ত ঘন জঙ্গলের ছায়ায় নিজেদের আড়াল করে রাখছিল। পার্বত্য মাছির অত্যাচারে মাঝে মাঝে তারা গোঙানির মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছিল। ছোট ছোট পার্বত্য ঝিরিগুলো শুকিয়ে যেতে শুরু করেছিল। ওখান থেকে অসংখ্য মাছ ডাঙায় উঠে পড়ছিল। রাতের বেলা মশাল আর দা নিয়ে পাহাড়ি লোকেরা মাছ ধরতে বের হয়। মাছ ধরে কেটেকুটে ভেজে খেয়ে ফেলে হাতের দা দিয়ে।

আমিও বেশিদিন অলস বসে থাকলাম না। অল্প কিছুদিন পরই ডাক এলো কলকাতা থেকে। ওখানে একটা সভা ডাকা হয়েছে লুসাইদের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। ভবিষ্যতে আমাদের সীমান্ত নীতি কী রকম হবে সে সম্পর্কেও আলাপ হবে। ১৮৭২ সালের এপ্রিলে আমি সেখানে গিয়ে অনেক পরিচিত লোকের দেখা পেলাম। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সেই অভিযান। জেনারেল ব্রাউনলো আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন। তিনি বাকিদের কাছে আমার সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করতে ভুললেন না।

তিনি ছিলেন আমার চোখে একজন আদর্শ ইংরেজ। আমি তাঁর প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, সেটা শুধু আমার প্রশংসা করেছেন বলে নয়। তিনি সবসময়ই অন্যদের মঙ্গলের কথা আগে ভাবেন, সবার শেষে নিজের কথা ভাবেন। তাছাড়া তাঁর ব্যাপারে আমি সবসময়ই যেটা বিশ্বাস করে এসেছি, সেটা হলো একজন আন্তরিকতাপূর্ণ নেতার অধীনে কাজ করা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। কোনো হৃদয়হীন লোকের অধীনে আমি কখনোই ভালোভাবে কাজ করতে পারিনি। অতএব পরোক্ষভাবে এটাই সত্য যে আমি লুসাই অভিযানে এত ভালো ভূমিকা রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম শুধু জেনারেলের আন্তরিকতা ও সঠিক নেতৃত্বের কারণে।

ওই সম্মেলনে আমি যেসব প্রস্তাব করেছিলাম ভবিষ্যতে আমাদের সীমান্ত রক্ষার নীতিমালা বিষয়ে, সেই প্রস্তাবগুলো বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর অতি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করলেন। আমি পাহাড়ে ফিরে এলাম ডেমাগিরিতে একটা স্থায়ী ঘাঁটি তৈরির নির্দেশ নিয়ে। আমার সাথে আরো একজন ইংরেজ অফিসারকে দেওয়া হলো। লেফটেন্যান্ট গর্ডন আমার অতিরিক্ত সহকারী হিসেবে কাজ করবেন ডেমাগিরিতে।

২৫ এপ্রিল তারিখে তাঁকে নিয়ে আমি চট্টগ্রামে এলাম। তারপর আমরা রাঙ্গামাটি গেলাম একসাথে। সেখান থেকে আমরা ডেমাগিরির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম গর্ডনকে তাঁর দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো সময় ছিল না। যে কোনো সময় বর্ষা নেমে আসবে। বর্ষাকালে এখানে যাতায়াত খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু কপালে বৃষ্টি লেখা ছিল। কাসালং থেকে রওনা দেওয়ার আগেই তুমুল বৃষ্টি নামল। পাহাড়ি ঢলে চারপাশ ভেসে গেল। প্রচণ্ড গর্জনে নদীর স্রোত বয়ে যেতে লাগল। আমাদের যাত্রা কঠিন করে তুলল। স্রোতের শক্তি এত বেশি, ঘূর্ণিস্রোতে পড়ে আমাদের নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। প্রতিটি ছোট ছোট ঘূর্ণিও ফেনার সৃষ্টি করছিল। কোমর পানিতে নেমে গর্ডন আর আমি আমাদের লোকদের নিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে এগোতে লাগলাম।

রাতের বেলা ভয়ানক অবস্থা হলো। শতশত খুদে মাছির বিষাক্ত আক্রমণে আমরা অস্থির হয়ে পড়লাম। এরা এত সাংঘাতিক যে নিপুণ মশারির ছিদ্রের ভেতরে ঢুকে যেতে সক্ষম। এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্থানীয়দের কায়দায় মোটা কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলতে হবে অথবা ঘুমোবার সময় এক জাতের পিঁপড়ার বাসায় আগুন দিয়ে সেই ধোঁয়ার মধ্যে ঘুমাতে হবে।

পিঁপড়ার বাসাগুলো দীর্ঘসময় জ্বলে আর পাহাড়ে এগুলো সব জায়গায় মেলে। ওই বাসাগুলো পুড়ে যে গন্ধ বের হয় সে গন্ধে ওই কীটগুলোর অত্যাচার কম থাকে। কিন্তু যে কোনো পদ্ধতি নেওয়া হোক না কেন, তাতে পুরোপুরি সফলতার সম্ভাবনা নেই। অতএব আমাদের সারা রাত একটা অস্থির অসহ্য যন্ত্রণাকর অবস্থায় পার করতে হলো। বিষাক্ত পতঙ্গ বাহিনীর আক্রমণের মধ্যে নদীর একঘেয়ে স্রোতের শব্দ শুনতে শুনতে রাতটা কেটে গেল কোনোমতে।

ডেমাগিরিতে আমি একটা জায়গা ঠিক করলাম আমাদের স্থায়ী ফাঁড়ির জন্য। সেখানে আমাদের লোকদের খাবারদাবারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিলাম। আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা সহজ ছিল কারণ অভিযানের শেষে আমাদের কাছে যে অবশিষ্ট খাদ্য মজুদ ছিল সেটাকে কাজে লাগানো গেছে। এই মজুদ থেকে আমি সাইলুদেরও কিছু খাবার দিয়েছি। ওদের সাথে এখন আমার সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তারা যুদ্ধের সময় খাদ্যসামগ্রী পুড়িয়ে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।

আমি আমার সুহৃদ রতন পুইয়ার সাথে দেখা করে লেফটেন্যান্ট গর্ডনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমরা তাকে পালকের মুকুট পরা অবস্থায় খুব ফিটফাট একজন নেতা হিসেবে দেখলাম। এই অভিযানে সে যে ভূমিকা পালন করেছে সেটা অসামান্য। সে কারণে তার ক্ষমতার পরিধি বেড়ে গেছে অনেক। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তার অবস্থানটা পোক্ত হয়েছে।

তবে বর্ষাকালে ডেমাগিরিতে বসবাসের উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই গর্ডন আর আমি ঠিক করলাম এই যাত্রায় এখানে থাকব না। আপাতত

ফিরে যাব। পরে অনুকূল সময়ে আবারো আসতে হবে। আগামী অক্টোবর বা নভেম্বরে আমরা ওখানে স্থায়ী ফাঁড়ি চালু করব বলে স্থির করলাম।

অতঃপর সেখানকার খাবারদাবার এবং অন্য মালপত্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আমরা রাঙ্গামাটি ফিরলাম। তখনকার সেই ছোট্ট স্টেশনটি এখন কত বড় হয়েছে, কলকোলাহপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। অথচ আমি যখন প্রথম ওই এলাকায় আসি তখন এক নিঃসঙ্গ ভ্রমরের মতো এদিক-সেদিক ছুটে বেরিয়েছি একা একা। এখন এখানে গর্ডন আছে সহকারী কমিশনার হিসেবে। তার সাথে আছে মেসার্স নাইভেট, ক্রাউচ আর বিগনেল। তাদের সবাইকে নিয়োগ করা হয়েছে আমার অধীনে সীমান্ত ব্যাটেলিয়নে কাজ করার জন্য।

এটা ভাবতে খুব অবাক লাগে যে পথ দিয়ে আমি ঘন জঙ্গল কেটে পথ করে এগিয়ে গিয়েছিলাম একদিন, যেখানে আমার জুমঘর তৈরি হয়েছিল, সেখানে এখন একটা জমজমাট বাজার। যেখানে ছিল একটা জঙ্গলাবৃত পাহাড় সেখানে এখন কচি কচি ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গবাদিপশুর দল। ছোট ছোট বেশকিছু বাড়ি তৈরি হয়েছে পাহাড়জুড়ে। পরিণত হয়েছে একটা প্রাণবন্ত জনপদে। এই এলাকার প্রাথমিক উন্নয়নে আমি ছিলাম প্রথম অভিযাত্রী। আমার চেষ্টাতেই রাঙ্গামাটি একটা নিরাপদ আরামদায়ক জনপদে পরিণত হয়েছে।

শীতের আগে আগে আমি আবারো ডেমাগিরি ফিরে গিয়ে সেখানকার কিছু কাজকর্ম শুরু করলাম। লুসাই অভিযানের ফলশ্রুতিতে আমার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারেরা আমাকে পরামর্শ দিলেন হাওয়া বদল করার জন্য কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ড গিয়ে ঘুরে আসতে। অথবা এখান থেকে অন্য কোনো জেলায় বদলি নিতে। কিন্তু এই প্রিয় পাহাড়ের বন্ধন ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না। এখানে আমাকে যেসব কাজে যুক্ত থাকতে হয় সেগুলো সত্যিই খুব আকর্ষণীয়।

সত্যি বলতে আমার জন্য এই বছরটা খুব চমৎকার ছিল। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ গ্রহণ করে সব রকমের সংশোধন বা উন্নয়নের ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পার্বত্যবাসীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা (যা আনুমানিক চার হাজার পাউন্ড)। ওই টাকা দিয়ে তারা লাঙ্গল আর গরু কিনবে, তা দিয়ে চাষবাস করবে। এর ফলে জুম নামে পরিচিত তাদের আদিম কৃষিকাজের পদ্ধতি ত্যাগ করতে পারবে। আমার এই পরিকল্পনা যদি সফল হয় তা হলে এই এলাকায় যুগান্তকারী একটা পরিবর্তন আসবে মানুষের ভাগ্যে।

আমাদের সাবেক শত্রু সাইলুদের অনেক লোক আমার সাথে দেখা করতে এলো। তারা আমাকে পিতা বলে ডাকতে শুরু করেছে এবং তাদের সন্তানদের নাম রাখছে থাংলিয়ানা বলে। কারণ তারা মনে করে এই নামটা শক্তি এবং সৌভাগ্যের প্রতীক। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এমন সৌভাগ্যের

অধিকারী করার জন্য। তিনিই আমার হাতকে শক্তিশালী করেছেন এবং আমার ভাগ্যকে গড়ে দিয়েছেন।

৫২. পার্বত্য অঞ্চল জরিপ অভিজ্ঞতা

শীতের আগমন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমরা আমাদের কাজের জন্য প্রস্তুত হলাম। লেফটেন্যান্ট গর্ডন এবং মি. বিগনেলের নেতৃত্বে আমরা দক্ষিণের সীমান্ত ব্যাটেলিয়নকে সাহায্য করার জন্য একটা শক্তিশালী বাহিনী পাঠালাম বোমাং অঞ্চলে। ওই রাজ্যের অংশবিশেষ প্রায়ই সেন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেন্দুরা সব আরাকানের পাহাড় থেকে নেমে আসে। আমাদের গত অভিযানে তাদের ওপর কোনো আক্রমণ চালানো হয়নি বলে তারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছে। মি. ক্রাউচ ডেমাগিরির দায়িত্বে থাকলেন। ওদিকে মি. নাইভেট রাঙ্গামাটির ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে আমাকে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হলো দক্ষিণের সীমান্তের পার্বত্য এলাকা জরিপ করতে হবে। এই কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্য জরিপ বিভাগ থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে লোকজনকে পাঠানো হলো আমার কাছে। আমরা ওদিকে নতুন আবিষ্কৃত অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করব। দক্ষিণের বিপুল অঞ্চলে জনমানবের কোনো বসতি নেই। সম্পূর্ণ অজানা একটা এলাকা।

আমি আমার সাথে পনেরো জন মজবুত গড়নের লোক নিলাম। সবাই সশস্ত্র। সেই সাথে দশজন পার্বত্য কুলি। ওরা আমাদের খাবারদাবার বয়ে নিয়ে যাবে। সরকারি জরিপকর্তার সাথেও একজন সশস্ত্র মিলিটারি পুলিশ আছে। তাঁর মালামাল বহনের জন্য সার্ভে যন্ত্রপাতি নেওয়ার জন্য বেশকিছু কুলি নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে আমরা নব্বইজনের একটা দল।

আমার নিজের ইচ্ছে ছিল এই দুর্গম সীমান্ত এলাকার রীতি অনুযায়ী যতটা সম্ভব কম জিনিসপত্র নিয়ে, কম লোকবল নিয়ে চলাচল করা। কিন্তু দেখতে দেখতে সংখ্যাটা এত বড় হয়ে যাবে আমি চিন্তাও করিনি। এত বড় দল নিয়ে চলাচল করা এখানে কোনো কাজের কথা নয়।

সে যাই হোক, আমরা নভেম্বরের শেষদিকে আমাদের পথ চলা শুরু করলাম। প্রায় এক পক্ষকাল চলার পর সরকারি সার্ভেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি আর আগাতে পারবেন না। তাঁর জরিপ কাজের যন্ত্রপাতি নিয়ে এর চেয়ে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া খাবারদাবারও ফুরিয়ে আসছিল। অতএব তিনি বেশকিছু এলাকা জরিপ না করেই মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন। তারপর ডেমাগিরি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

অতঃপর ১৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ সালে আমি আমার সঙ্গীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পথঘাটহীন আদিম বনভূমির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। যে জঙ্গল বাঘ, গণ্ডার, বন্যহাতির আবাসস্থল সে পথে আমরা এগিয়ে চললাম।

আমরা একবার পথ হারালাম। আমাদের খাদ্যমজুদ বিপজ্জনকভাবে কমে আসছিল। একবার একটা বাঘ দুদিন দুরাত আমাদের পিছু নিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে আমাদের চারপাশে চক্কর দিত বিশাল এক বেড়ালের মতো। এছাড়া সে আমাদের আর কোনো ক্ষতি করেনি।

আমাদের ক্রিসমাস কাটল সেই জঙ্গলের মধ্যে। নিকটবর্তী মানববসতি থেকে অন্তত সাতদিনের দূরত্বে। আমার ক্রিসমাস ডিনার হলো সেদ্ধ ভাত আর ঝরনার পানি দিয়ে। সেই সাথে অজানা কিছু ফলমূল শেকড়বাকড়। ভাগ্যক্রমে আমার তামাকের মজুদ যথেষ্ট ছিল। নিকোটিনের দাসত্ব করার মতো বিশ্রী ব্যাপার হয় না।

আমরা একেবারে অজানা অঞ্চল ধরে প্রায় দেড়শ মাইল পথ চললাম। এখানে সেখানে আমরা হাতির বাসভূমি দেখতে পেলাম। বড় বড় গাছে ঘেরা জঙ্গলের ভেতর হাতির দল নিজেদের বসবাসের জন্য ভূমি পরিষ্কার করেছে ঝোপঝাড় চ্যাপটা করে। আরেক জায়গায় গিয়ে দেখলাম জলহস্তীর লীলাভূমি। খেলাধুলা করতে গিয়ে বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলেছে শেকড় সমেত। গাছের ডালপালা এমনভাবে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলেছে দেখলে মনে হতে পারে এদিক দিয়ে ভয়ানক শক্তিশালী কোনো ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে।

একদিন সকালে আমরা যখন হাঁটছিলাম তখন দেখতে পেলাম বিশাল একটা গণ্ডার আমাদের সামনে কিছুদূর দিয়ে আপনমনে দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে, আমাদের খেয়ালই করেনি। আরেকবার একটা বিশাল অজগর, প্রায় বিশ ফুট দীর্ঘ, আমার ঊরুর মতো মোটা হবে, চকচকে শরীর নিয়ে ধীরগতিতে আমাদের পথের সামনে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমরা প্রতিরাতে ঘুমোতাম এবড়ো-থেবড়ো শক্ত ধরণী মাতার বুকে। এরকম অসুবিধাজনক অবস্থায় প্রতি রাতে খুব সামান্য ঘুম হতো। ভোর চারটার পরে ঘুমিয়ে থাকা কঠিন ছিল। হয় সেই সময়ে শীত বেশি পড়ত বলে অথবা রাত কেটে ভোর এগিয়ে আসত বলে কি না জানি না, কিন্তু আমি ওই সময়টাতে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠে বসতাম। নিভে আসা লাকড়িগুলো নেড়ে চেড়ে আগুনটা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। চারপাশজুড়ে কুয়াশার অন্ধকারে ঢাকা একটা অজানা অচেনা বনাঞ্চল আমাদের ঘিরে রেখেছে।

কখনো কখনো দিনভর হাঁটতে হাঁটতে আমাদের মাথা চক্কর দিয়ে উঠত। সন্ধ্যার সময় আমরা সামান্য ভাত আর শেকড়বাকড় ছাড়া আর কিছু খেতে পেতাম না। তবে শেষমেশ আমরা আমাদের ভ্রমণ সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম। সীমান্তের ওই অংশটা আমরা মানচিত্রের মধ্যে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমরা আমাদের সর্বদক্ষিণের ফাঁড়ি চিমা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। ওই এলাকা বোমাং রাজ্যের সীমানার মধ্যে। সেখান থেকে আমরা সাঙ্গু নদীর তীরে গর্ডনের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছালাম। আমাদের অবস্থা তখন খুব কাহিল। জামাকাপড়

ছিঁড়ে ত্যানা হয়ে গেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর সবাই। সেখানে পৌঁছার পর গর্ডনের ফাঁড়ির ভালোমন্দ খোঁজখবর সেরে তার সাথে সীমান্ত সংক্রান্ত আলোচনা সেরে নদীপথে চট্টগ্রাম ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। চট্টগ্রাম হয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব ডেমাগিরিতে ফিরে গিয়ে আমার কাজকর্ম শুরু করতে হবে।

৫৩. আমার ডেমাগিরি জীবন

লুসাইরা এখন ডেমাগিরিতে গড়ে ওঠা বাজারে নিয়মিত ভিড় জমায়। আমার বিশ্বস্ত সহকারী নুরুদ্দিনকে ওখানকার জমাদার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বছরে ৬০ রুপি বেতন তার। তার ভবিষ্যৎ এখন নিশ্চিন্ত। সে তার বিশ্বস্ততার পুরস্কার পেয়েছে যথাযথভাবে। ওই পদের জন্য তার চেয়ে উপযুক্ত আর কোনো পাত্র হয় না।

আমার মা ইংল্যান্ড থেকে তার জন্য একটা ডাবল ব্যারেলের বন্দুক আর কার্তুজ পাঠিয়েছিল উপহার হিসেবে। কারণ সে পুরো অভিযানে আমার ছায়াসঙ্গী রূপে ছিল। আমার সমস্ত কিছুর দেখভাল করেছে আন্তরিকতার সাথে। উপহার পেয়ে খুব অভিভূত সে। কয়েকদিন পর আমার মায়ের কাছে একটা চিঠি দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল।

লুসাই অভিযানের অভিজ্ঞতা আমাকে তাদের ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিল। আমি অবসর সময় তাদের ভাষার প্রয়োজনীয় শব্দ বাক্যগুলো অর্থ সহকারে একটা নোটবুকে টুকে রেখেছিলাম। যেটা পরবর্তীকালে সরকারিভাবে প্রকাশ হয়েছিল।

ডেমাগিরিতে আমার বাড়িতে প্রায়ই একেকজন নতুন অতিথির আগমন ঘটত 1 একবার এক লুসাই চিফ একদল সঙ্গীসাথি নিয়ে থাংলিয়ানার সাথে দেখা করতে এলো। এসেই এমনভাবে গেড়ে বসল যে মনে হলো এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাবে সে। তেমন কোনো কথাবার্তা বলত না, চুপচাপ বসে মদ গিলত। তার মনে হয়তো ১০১টা প্রশ্ন ছিল আমাদের দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ, খাবারদাবার, শৃঙ্খলা আর আমার ছোট বাহিনীটার যন্ত্রপাতি নিয়ে, কিন্তু খুব কমই সেটা প্রকাশ হতো।

এখানে আমাদের একটা বড় সমস্যা ছিল খাবারদাবার নিয়ে। আশপাশের গ্রামগুলোতে বিক্রি করার মতো যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না। আমাদের খাদ্যসামগ্রীর জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো চট্টগ্রামের ওপর। আমার ঘাঁটি থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব প্রায় একশো আশি মাইল। দীর্ঘ নৌপথ পার হয়ে এখানে আসতে হতো। আমার এখানে ছোটখাটো একটা হাসপাতাল ছিল, কিন্তু ডাক্তার ছিল না। আমাকেই ডাক্তারি কাজ করতে হতো প্রতিদিন গড়ে দশ পনেরোজন অসুস্থ মানুষের ওপর। পরে অবশ্য সরকার এখানে একজন স্থানীয় ডাক্তারকে পাঠালে আমি নিস্তার পেলাম।

এর পাশাপাশি আমাকে আরো হরেক রকমের কাজ করতে হতো। গাছ কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, ঘরবাড়ি তৈরি করা, বারোটা হাতির দেখভাল করা। সেই সাথে নানা ধরনের রিপোর্ট লেখা, সেগুলোর অনুলিপি করা এসব বিরক্তিকর কাজ তো নিত্যসঙ্গী ছিল। যেসব বিষয়ে রিপোর্ট করতে হতো তার মধ্যে ছিল সীমান্তের অবস্থা, আইনশৃঙ্খলা, প্রতিষেধক টীকা, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, জরিপ ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে কিছু অদ্ভুত ধরনের মামলাও এসে পড়ত। একবার একটা মেয়ে এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মেয়েটা তার স্বামীর কাছ থেকে তালাক চায়। কারণ তার স্বামী মেয়েটার মাকে মারধর করে প্রতিদিন সকালে। তার সাথে সে আর থাকতে চায় না। তখন সেই মং রাজার ঘটনাটি মনে পড়ল। দেখে মনে হলো আমি এখানকার স্থানীয় রাজা। তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য বসে আছি।

তবে আমার দেখা সবচেয়ে বিচিত্র ঘটনাটি ছিল এরকম।

এক সন্ধ্যায় আমি আমার বেড়ার ঘরের সামনে উঠবস করছিলাম। এটা ডেমাগিরিতে আমার নিয়মিত ব্যায়ামের অংশ। আশপাশে আমার লোকজন নিজেরা নিজেরা বল ছোড়াছুড়ি করে খেলছিল। হঠাৎ করে কোথা থেকে পলাতক আসামির মতো একটা লোক ছুটে এলো আমার কাছে। যেন রবিনসন ক্রুশোর সেই ‘ম্যান ফ্রাইডে’। তার পা খালি, মাথায় কিছু নেই, জামাকাপড় সব ছিন্নভিন্ন। আমাদের সীমান্ত ব্যাটেলিয়নের একজন সদস্য সে। নম্রভদ্র ভালোমানুষ বলে পরিচিত সবার কাছে।

তাকে ডেমাগিরির ওপর দিকে পার্বত্য এলাকার সীমান্তে সার্থে লাং নামের একটা জায়গায় পাঠানো হয়েছিল একটা চিঠির থলে দিয়ে। সে এখন প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরে এসেছে। সে যখন তার গল্পটা বলতে লাগল তখন বাকিরা খেলা থামিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ালো চারপাশে। তার নিজের বয়ানে:

“সাহেব আমি তো চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনার চিঠিগুলো নিয়ে যেতে যেতে মাঝপথে পাহাড়ের মধ্যে একটা ছোট ঝরনা দেখতে পেয়ে পানি খাওয়ার জন্য একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য থামলাম। পানি খেয়ে আবারো রওনা দিলাম। কিন্তু কয়েকশ গজ যাওয়ার পর দেখি জঙ্গল থেকে বিরাট আকারের একটা বাঘ বেরিয়ে এলো এবং আমার সামনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেছে দেখে। আমি নড়াচড়া করার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম। বাঘটা দাঁড়িয়ে আছে, আমিও দাঁড়িয়ে আছি। আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। সে আমাকে দেখছে, আমি তাকে দেখছি। আমার কাছে একটা কুকরি (গুর্খাদের বাঁকানো ছুরি) আর সরকারি চিঠি বাদে আর কিছু নেই।

তাই আমি সবিনয়ে বললাম— ‘মহামান্য বাঘ মহাশয়, আমার কাছে কিছু সরকারি চিঠি আছে, যেগুলো সম্মানিত কোম্পানি বাহাদুর আমাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছে। এই চিঠিগুলো তো আমাকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমাকে দয়া করে যেতে দিন।’

কিন্তু আমি যখন কথা বলছিলাম সে ওসবে মোটেও পাত্তা দিচ্ছিল না। আমার দিক থেকে চোখও ফেরালো না। একবার শুধু গরগর করে কি যেন বলে উঠল, কিন্তু পথ ছাড়ল না। এটা দেখে আমার মধ্যে আরো ভয় ধরে গেল। আমি হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে কুর্নিশও করলাম। কিন্তু সে এসব কোনো কিছুতে গা করছে না। শেষমেশ আমি বিরক্ত হয়ে উঠে বললাম, তুমি যদি আমার পথ না ছাড়ো তা হলে আমি কিন্তু সাহেবের কাছে নালিশ করব। তারপর আমার হাতের চিঠিগুলো তার সামনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে চলে এলাম এখানে। এখন সাহেব আপনি ওই হতচ্ছাড়া বাঘটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। ওর শাস্তি হওয়া দরকার। সে আমাদের সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে।”

বিধ্বস্ত ক্লান্ত সেই সিপাহির কাছ থেকে এমন অদ্ভুত অভিযোগ শুনে আমি রীতিমতো বাকহীন। কিন্তু এটা ঠিক যে মহারানির রাজত্বে সরকারি কাজের প্রতি এমন অভিনব আর কখনো দেখা যায়নি। এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। অনতিবিলম্বে আমি আসামি মহামান্য লর্ড টাইগারকে ফাঁদে ফেলে আটক করার জন্য একটা দল পাঠিয়ে দিলাম।

তবে আমার লোকেরা বলল মহামান্য বাঘের কাছ থেকে এমন অযৌক্তিক ব্যবহার আমরা আশা করি না। আমরা কখনো তাঁর কাজে বাধা দেইনি। তিনি কেন আমাদের বাধা দেবেন। আমাদের পথ রুদ্ধ করার মানে হলো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। তাকে আটক করে কঠোর সাজা দিতে হবে। কিন্তু মহামান্যকে গ্রেফতার করা সম্ভব হলো না। অতএব বন্দুকের গুলি ছুড়ে পথের বাধা অপসারণ করতে হলো।

৫৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে গুর্খা অভিবাসন

আমার অনুপস্থিতিতে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাটি দেখভাল করার দায়িত্বে আছেন পুলিশ সুপার মি. নাইভেট। তিনি সরকারের কাছ থেকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে সাঙ্গু সাবডিভিশনের দায়িত্বে আছেন লেফটেন্যান্ট গর্ডন। তবে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি আমার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে কাজ করে।

এই যুদ্ধে আমাদের সকল বাহিনীর মধ্যে কর্নেল ম্যাকফারসনের অধীনস্থ গুর্খা সৈন্যদের আমার সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়েছে। আমি সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেপাল থেকে কিছু অভিবাসী এনে এই পার্বত্য অঞ্চলে

পুনর্বাসন করার একটা পরিকল্পনা করেছি। সেই অনুযায়ী কর্ণফুলীর উত্তর শাখা মাইনি নদীর তীরে তাদের বসতি গড়ে তুললাম। উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি গড়ে ওঠা সেই বসতি এখন কতটা উন্নতি করেছে সেটা দেখার জন্য আমি ১৮৭৩ সালের শুরুর দিকে একবার ওদিকে যাত্রা করলাম।

গুর্খারা যেখানে কলোনি গড়ে তুলেছে সেই এলাকায় আগে কোনো মানববসতি ছিল না। ওই পথ দিয়ে হার্মাদ লুসাইরা এদিকে মং রাজার এলাকায় বারবার আক্রমণ চালাত। আমার এই কলোনি গড়ার উদ্দেশ্য হলো লুসাই অঞ্চল আর মং রাজার এলাকার মধ্যে একটা বাফার জোন তৈরি করা। এসব পার্বত্য এলাকায় গুর্খাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুব ভালো। ওদিকে তাদের শক্ত অবস্থান থাকলে পূর্বদিক থেকে বেয়াড়া লুসাই গোত্রগুলো এদিকের ব্রিটিশ এলাকায় সহজে আক্রমণ করতে পারবে না।

আমি মাইনি নদী ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ছোট একটা ক্যানু নিয়ে। বেশকিছু দূর যাওয়ার পর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমার নৌকা থেমে গেল। একটা বিশালদেহী বন্যহাতি পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার মধ্যে স্নান করছিল। এই অগভীর নদীতে দ্রুত গতিতে নৌ চালনা সম্ভব নয়। আমরা যদি ঘুরে পালাতে চাই তাতে মান্যবর হাতি অপমান বোধ করতে পারেন। অপমান বোধ করলে তিনি আমাদের সাজা দেওয়ার জন্য তাড়া করতে পারেন। আমাদের পালানোর সুযোগ নেই। আমার কাছে দুই ব্যারেলের একটা হালকা বন্দুক আছে মাত্র। এই বন্দুকের গুলি তার মোটা চামড়া ভেদ করতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। সুতরাং তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না এখন। আমরা একদম অনড় হয়ে বসে থাকলাম নৌকার মধ্যে। মহামান্য আস্তে ধীরে স্নানের পর্ব শেষ করে জঙ্গলে ঢুকে গেলে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর আবার রওনা দিলাম।

একই দিনে আমি আরো একটা মজার দৃশ্য দেখেছি। দীর্ঘসময় নৌকায় বসে থাকতে থাকতে আমার পায়ে ঝি ঝি ধরে গিয়েছিল। এক জায়গায় গিয়ে নৌকা থামিয়ে আমি তীরে নেমে হাঁটাহাঁটি করে পায়ের খিল ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম। তারপর পাশের টিলায় উঠে আশপাশ দেখতে লাগলাম। টিলার উপরের দিকে উঠে আমি উল্টোদিকের ঢালের একটা দৃশ্য দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। উল্টোদিকের ঢালে সবুজ ঘাসের মধ্যে শুয়ে আছে অপরূপ সুন্দর এক বাঘিনী। তার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা দুধ খাচ্ছে মায়ের কাছ থেকে। বাঘটার চোখের ওপর সূর্যের আলো পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল। আমি ঝোপের আড়াল থেকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম দৃশ্যটার দিকে।

দুধ খাওয়া শেষ করে বাচ্চা দুটো ঘাসের ওপর খেলতে লাগল আপনমনে। আমাদের জন্য বিরল মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক একটা দৃশ্য। দেখতে দেখতে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম তখন পেছন দিকে মাঝিদের গান শোনা গেলে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। মাঝিরা নৌকা বাইতে শুরু করেছে উজানের দিকে। আমি দেরি না করে জায়গাটা থেকে সরে আসলাম। ম্যাডাম যদি তাঁর একান্ত সময়ে

আমার মতো কাউকে দেখে বিরক্তবোধ করেন তা হলে সেটা সুখকর বিষয় হবে না।

আমরা ছোট একটা টিপরা গ্রামে যাত্রাবিরতি করলাম নাশতা সারার জন্য। কিছু ডিম দুধ ইত্যাদি নেওয়ার সময় আমি হেডম্যানের বাড়িতে খানিক বিশ্রাম নিলাম। সেই সময় দেখলাম মোড়লের বাড়ির বাঁশের চাল থেকে সরু ফিতার মতো টাটকা কচি সবুজ রঙের একটা সাপ চলে যাচ্ছে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। মোড়ল জানালেন এই সাপগুলো কাউকে বিরক্ত করে না। এরা যে বাড়িতে ঢোকে সে বাড়ির গৃহস্থের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে।

গুর্খাদের বসতি দেখে ফেরার পথে আমি কাছাকাছি থাকা কিছু টিপরা গ্রামও দেখে আসলাম। তারাও সম্প্রতি এই এলাকার অভিবাসী হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

***

৫৫. সারথে লাং পাহাড়ের ওপর আমার নতুন বাড়ি

বর্ষাকালের অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিগগির বুঝতে পারলাম যে এই পার্বত্য এলাকাগুলো কেবল শীতকালেই স্বাস্থ্যকর। আমি ওই সময়েই যতবেশি সম্ভব আমার লোকদের ওদিকে স্থানান্তর করার চেষ্টা করলাম। ডেমাগিরি জায়গাটা অতি সুন্দর এবং সুবিধাজনক একটা জায়গায় অবস্থিত। এখানে জলপথে মালামাল এনে গুদামজাত করতে সুবিধা। কর্ণফুলী নদী এখানে দুটো পাথুরে পর্বতের মাঝে সৃষ্টি হওয়া গিরিখাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে দুটো সাদা ফেনায়িত ঝরনাও নেমে এসেছে। ওখানে প্রায় আধমাইল পরিধির একটা গোলাকৃতি স্বচ্ছ সবুজ জলের শান্ত জলাধার তৈরি হয়েছে।

পূর্ব দিকে একটা দীর্ঘ পর্বতসারি চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। একটা দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এই অঞ্চলকে শীতল হাওয়া থেকে আগলে রেখেছে। তার পাশেই সমতল ভূমি বসতি তৈরির জন্য উপযুক্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নদীটা ঘুরে গেছে পাথুরে তীর ঘেঁষে। এর ফলে তিন দিকে গভীর নদীবেষ্টিত হয়ে জায়গাটা ছোটখাটো একটা পেনিনসুলার আকৃতি পেয়েছে। যার একদিকে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা রেখে জায়গাটাকে একটা নিরাপদ দুর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই সাথে এখানে পুলিশ ব্যারাক, হাসপাতাল, মালপত্রের গুদাম স্থাপন করা হয়েছে। সেই গোলাকৃতি জলাধারের পাশে গড়ে উঠেছে একটা বাজার। তার পাশ দিয়ে সারথে এলাকার পথ চলে গেছে উত্তরদিকে।

আমি ওখানে আমার একটা বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই সাথে ডেমাগিরি জায়গাটাকে সীমান্ত এলাকার হেডকোয়ার্টার হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি একটা বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে আছে। যেটা বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্যের একটা আদর্শ অবতরণ কেন্দ্র হতে

পারে। কিছুদিন আগে রতন পুইয়াকে বলেছিলাম যে সারথে লাং এলাকায় আমি একটা বাড়ি তৈরি করতে চাই।

রতন পুইয়া আর তার গোত্রের লোকেরা বেশ দ্রুততার সাথে লুসাই কায়দায় আমার জন্য একটা আরামদায়ক বাড়ি তৈরি করে দেয়। ওই বাড়িতে আমি বর্ষাকালটা কাটাতে চাই। অতএব, মে মাসের শুরুতে আমি সারথে লাং এলাকায় আমার নতুন বাসায় উঠে গেলাম।

মাত্র এক হাজার ফুট উচ্চতায় গিয়ে পরিবেশটা বদলে গিয়ে এত আরামদায়ক হয়ে উঠতে পারে সেটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। ডেমাগিরিতে যেখানে গরম আর মশামাছির উৎপাতে কাহিল ছিলাম, সারথে লাং-এর নতুন বাড়িতে আসার পর আমাকে রীতিমতো গরম জামাকাপড় পরতে হচ্ছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য। আমার লুসাই বন্ধুরা যে বাড়িটা তৈরি করে দিয়েছে সেটা তৈরি হয়েছে গাছের কাণ্ড দিয়ে। বাইরের দিকে কাদার প্লাস্টার, ভেতরের অংশ বাঁশের বেড়া দেওয়া। একদম বুনো চেহারার হলেও বসবাসের জন্য খুব আরামদায়ক। এই বাড়িটাকে পরবর্তীকালে আমার সহকর্মীরা 'আঙ্কেল টমস কেবিন' বলে ডাকত। শুনতে আমার খুব ভালো লাগত, যতটা না এখানে বসবাস করতে পেরে, তার চেয়ে বেশি লুসাইদের ওপর কূটনৈতিক বিজয় লাভ করে একজন চিফের মতো সমীহ আদায় করতে পেরে।

তবে একটা জিনিস এখানে স্বীকার করতেই হবে। মাঝে মাঝে এই পাহাড় চূড়ার নিঃসঙ্গ বাড়িটাকে তীব্র ঠান্ডা বাতাস শিস দিয়ে বিদ্ধ করে। তখন আমি বাড়ির পাশে একটা বৃক্ষের মরা ডালের ওপর বসে থাকা বাজপাখিটার দিকে তাকিয়ে ঈর্ষান্বিত হই। আমার কাছে যদি এই পাতলা পুরনো ইংলিশ পোশাকের বদলে ওর মতো পশমের জামা থাকত তা হলে আমার শরীরটা উষ্ণ রাখতে অনেক সাহায্য করত। আমি আমার সাবেক কর্ম সহযোগী নুরুদ্দিনকেও মিস করি, সে এখন ডেমাগিরি বাজারের সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করছে।

আমার বাড়িতে এখন যারা কাজ করে তাদের প্রায় সবাই পার্বত্যবাসী। নুরুদ্দিনের মতো কারো তত্ত্বাবধানের অভাবে তাদের সবগুলো বখে গিয়েছিল। তারা আমার জামাকাপড় হারিয়ে ফেলছিল, আমার ল্যাম্প ভেঙে ফেলছিল এবং আমার প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। আমি জীবনেও আর কোনোদিন ওটা বাজাতে পারব না। আর সবচেয়ে মারাত্মক যে ক্ষতিটা করেছে সেটা এখনো মানতে পারছি না। তারা হাতির পিঠ থেকে বিশাল একটা চোখা পাথর ফেলে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে কলকাতা থেকে সদ্য আনা ওয়াইন আর বিয়ারের বাক্সকে।

সারথের নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার দুদিন আগে আমি কলকাতা থেকে ডাকযোগে একটা রান্নার বই পেয়েছিলেম। বইটা পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই যাত্রায় আমি রান্নার কায়দাকৌশল শিখে নেব।

সারথে অঞ্চলের উঁচু পর্বতে ঠান্ডা বাতাসের কারণে আমার ক্ষুধাও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগা কপাল আমার। সেই সময়ে আমার বিশ্বস্ত রাঁধুনী ছুটিতে চলে গেল। তার পার্বত্য সহকারী আমার রান্নার কাজে যোগ দিল। কিন্তু ওই নির্বোধটা আমার রান্নার বইটাকে সসপ্যানের তলায় রেখে পুড়িয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয় সে আমার আলু আর পেঁয়াজের মজুদ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে।

এতসব বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড-কারখানা দেখে বিরক্তির চরমে উঠে আমি 'আল্লাহু আকবর' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'আমার কপালে এই সবই লেখা ছিল! কপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কে কখন টিকতে পেরেছে?'

অতঃপর আমার পর্বতচূড়ার বাড়িতে এক মাসের নিরানন্দ দিন কাটিয়ে ডেমাগিরিতে ফিরে এলাম। যেখানে অন্তত নিজেকে শুকনো রাখা সম্ভব হবে। সারথে পাহাড়ের বাতাস খুব ঠান্ডা এবং আরামদায়ক ছিল। কিন্তু যখন মেঘের মধ্যে বৃষ্টির সূক্ষ্ম কণাগুলো জড়ো হতে থাকে তখন বিপদের সূত্রপাত হয়। মেঘগুলো আমার ঘরের ভেতর ঢুকে আক্ষরিক ভাবেই পুরো ঘরটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সব জিনিসপত্র এমনভাবে ভিজে ন্যাতা হয়ে যায় যে মনে হবে আমি যেন সমুদ্রের তলদেশে আস্তানা পেতেছি।

বর্ষাকালে ডেমাগিরিতে কোনো কাজকর্ম থাকে না। সারাদিন ঘরবন্দি। তখন আমি বসে বসে প্রফেসর ম্যাক্সমুলারের লেখা বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ধর্মাপদ (জ্ঞানের পথ)-কে বার্মিজ ভাষায় অনুবাদ করতে থাকি। পরবর্তী সময়ে আমার সেই অনূদিত গ্রন্থটা ছাপিয়ে এনে আমি পার্বত্যবাসী খিয়ং-থা গোত্রের লোকদের মধ্যে বিলি করি। পার্বত্যবাসীরা ওই গ্রন্থের দার্শনিক কথাগুলো নিজেদের ভাষায় পড়ে খুব আনন্দিত হয়েছিল।

এই অবকাশে আমি আমার লোকদের ব্যস্ত রেখেছিলাম ডেমাগিরি ঘাঁটির সামনের অংশে ক্যাকটাসের বেড়া তৈরি করতে। যখন বৃষ্টি থামত তখন আমি তাদের বন্দুক চালানোর চর্চা করাতাম। এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে দ্রুতগতিতে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণও দিলাম।

লুসাইদের ছোট ছোট দল প্রায়ই আমার সাথে দেখা করতে আসত। আসার সময় হাতে করে নানান উপহার নিয়ে আসত। কখনো তাদের জুমের সবজি, কখনো বন্য শুয়োরের একটা পা, কখনোবা হরিণের মাংস। আমি তাদের সাথে এখন প্রায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারি। তাদের মুখ থেকে নানান ধরনের কিংবদন্তির গল্প শুনি। তাদের এই নিয়মিত আগমনের কারণে আমাকে প্রচুর পরিমাণে মদ গিলতে হতো তাদের খুশি করার জন্য। অতিথিদের সাথে মদ পান করা হলো এখানকার রীতি। আমি তাদের খুশি রাখতে গিয়ে পুরনো একটা কৌশলের আশ্রয় নিতাম। একটা মদের বোতলে পানি রেখে আমি সেখান থেকে আমার গেলাসে ঢেলে নিয়ে তাদের মদের গেলাসের সাথে টোস্ট করতাম। ফলে

তারাও খুশি হতো, আমিও অতিরিক্ত মদ্যপান থেকে বেঁচে যেতাম। দুপক্ষের জন্যই লাভজনক ছিল সেই কৌশল।

বৃষ্টি কমে আসার পর আমি আবারো সারথে লাং পাহাড়ে উঠে গেলাম। ওই জায়গার নির্জন বুনো পরিবেশটা আমাকে খুব আকর্ষণ করে। আমার সঙ্গে দুটো লুসাই বিড়ালকে নিলাম আর একটা টিয়াপাখিও নিলাম, যাকে কথা শেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। আমি মোটামুটিভাবে রবিনসন ক্রুশো হয়ে ওঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম।

আমার মনে আছে এক বিকেলে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম পাহাড়চূড়ায় আমার বাড়ির পেছনে একটা বিশাল বাদামি রঙের পাথরের ওপর। আমি জানতাম যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি পাহাড়টা সেখান থেকে শত শত ফুট খাড়া নেমে গেছে নিচের দিকে। সেদিকে আদিগন্ত বিস্তৃত ঘন জঙ্গল থাকার কথা। কিন্তু সেদিন তার বদলে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। ঘন কুয়াশার তৈরি একটা বিশালাকার ধূসর দেওয়াল জেগে উঠে আমার সামনে আকাশ আর ভূমি দুটোই অদৃশ্য করে দিয়েছে। আমার দুপাশ ঘিরে রেখেছে অদ্ভুত রহস্যময় ঘোলাটে সাদা রঙের একটা ভৌতিক অবয়ব, জিনিসটা ধীরে ধীরে কিন্তু অস্বস্তিকরভাবে নড়াচড়া করছিল, মনে হচ্ছিল একটা বিশালাকার পেঁচানো সাপ মোচড় খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। দৃশ্যটা এমন ভয়ানক যে কেউ বেশিক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকতে পারবে না।

পাহাড়িদের ভাষায় এরকম দৃশ্যকে না কি বলে ‘ক্রে মা ওয়াক’। ভয়ের কথা বাদ দিলে দৃশ্যটা সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতো ছিল। নরম তুলোর মধ্যে যেন ৰসন্ত নেমে এসেছে। কুয়াশাটা যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি দ্রুত সরে গেল।

সেদিন সন্ধেটা ছিল খুব সুন্দর। সূর্যাস্ত ছিল একদম পরিষ্কার। আমি নিচের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছ সবুজ ঝরনাধারাকে শক্ত পাথরের ওপর আছড়ে পড়ার দৃশ্য দেখছিলাম। তাদের ফেনায়িত গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই বুনো প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রীতিমতো উল্লসিত এক চিৎকার বেরিয়ে এলো আমার কণ্ঠ চিরে।

আমি যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছিলাম তখন ধীর শান্তলয়ে দিনের অবসান ঘটছিল। দূরের বেগুনি রঙের পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত হাওলং অঞ্চলের মধ্যে নিভে যাওয়া দিনের আলো মুহূর্তের জন্য একটু যেন থমকে দাঁড়ালো। ওইদিকে আছে বিশাল আকারের মুই ফ্যাং লাং পর্বতমালা, যেদিকে অবস্থান নিয়েছিল জেনারেল বাউচারের দক্ষিণ কলাম। মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্যে কোনো এক পার্বত্যবাসী গৃহস্থের বাড়িতে এক টুকরো আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। সান্ধ্য হাওয়ার সাথে সাথে ভেসে আসছে জঙ্গল থেকে গৃহস্থের বাড়ির দিকে যাত্রা করা কোনো এক গয়ালের করুণ কণ্ঠস্বর। বাড়ি ফেরার পর তাকে খেতে দেওয়া হবে তার প্রিয় কয়েক মুষ্টি লবণ।

আমি দীর্ঘ সময় বসে থেকে পূর্বদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নতুন কোনো অভিযানের কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু হায়, সে স্বপ্ন কখনোই আর বাস্তবায়ন হয়নি রাত গভীর হয়ে এলে শীতের প্রকোপ বাড়তে লাগল। আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হলো। ঘরের মধ্যে লুসাই কায়দায় তৈরি চুল্লির উত্তাপের আরামদায়ক আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করলাম।

৫৬ লুসাইদের প্রথম কলকাতা দর্শন

আমার খুব আন্তরিক একটা ইচ্ছে ছিল আমি সাইলু আর হাওলংদের নেতাদের কলকাতা নিয়ে যাব। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করাব, তাদের প্রথমবারের মতো একটা মহানগরীর সাথে পরিচয় ঘটাব। কিন্তু মনে মনে যতই ভাবি না কেন আমার সাথে দেখা করতে আসা লুসাই চিফদের সাথে কথাবার্তা বলার পর পরিকল্পনা থমকে যায়।

কাজটা সহজ ছিল না। তাদের লুসাই মানসিকতার সীমাহীন অজ্ঞতা এবং সারল্য তাদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে সভ্য মানুষকে যেসব বিষয় দিয়ে প্রলোভিত করা সম্ভব সেই বিষয়গুলোই তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আসে, তাদের কী লাভ হবে তাতে? যদি সেটা করতে গিয়ে তাদের প্রাণ দিতে হয়?

আমি যদি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে তাদের প্রাণটাকে আমার ভরসার ওপর ছেড়ে দিয়ে কখনো দেখেনি তেমন একটা অচেনা বিশালাকার জাহাজে করে, বিশাল একটা হ্রদ (হ্রদ বলতে হলো, কারণ তারা সমুদ্র কী জিনিস সেটা জানে না) পেরিয়ে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একটা দেশে যাওয়ার কথা বলি, ওরা যে সেটা বিশ্বাস করবে আমি তা মনে করি না। তবু ওরা যখনই আমার সাথে দেখা করতে আসে তখন আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে কসুর করি না।

একদিন দক্ষিণের হাওলংদের প্রভাবশালী নেতা সাইপোইয়া তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এলো। তার কাছেও আমি প্রস্তাবটা পাড়লাম। তাকে আকর্ষণ করার জন্য মহানগরী সম্পর্কে রঙচঙ মেখে যা কিছু বলা সম্ভব সবই বললাম।

লোভ দেখিয়ে বললাম, গভর্নর জেনারেল তাকে বড় ধরনের পুরস্কার দেবেন। তার পূর্বপুরুষদের কেউ সেরকম জিনিস স্বপ্নেও দেখেনি সেরকম জিনিস উপহার দেবেন। আমি তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেব। নিরাপত্তার উদাহরণ দিতে গিয়ে বললাম যে তার ভায়রা রতন পুইয়া যেতে রাজি হয়েছে কারণ সে বিশ্বাস করে যে এখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই।

সাইপোইয়া আমার কথায় মোটামুটি সায় দিয়ে ফেলেছে। যাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মুশকিল বাঁধালো তার সাঙ্গপাঙ্গরা। আমার কথায়

তাদের চিড়ে ভিজলো না। বুড়োটে ধরনের এক সঙ্গী উঠে যুক্তির প্যাচ ধরিয়ে দিল আমাদের মধ্যে—

‘এটা খুবই সত্য যে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি থাংলিয়ানা। আমরা তোমাকে অনেকদিন ধরে চিনি। তোমার কথাবার্তার মধ্যে কোনো ঝামেলা নাই। তুমি সবসময় ভালো ভালো কথা বলো। কিন্তু যে কোনো বিষয় উল্টো দিক থেকেও বিচার করা উচিত তাই নয় কী?‘

তখন উপস্থিত জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হলো। আমিও তাতে যোগ দিলাম। বুড়ো বলে চলল-

‘তুমি বলছো যে কলকতার বড় সাহেব, ‘গাভনর জেনডেল’ তোমার চেয়েও বেশি শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান। কথাটা কী সত্যি?’

আমি বললাম, ‘নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তিনি আমার চেয়ে অনেক অনেক উঁচু পদে আছেন। তিনি অবশ্যই আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান।’

বেশ। তা হলে ধরা যাক, তিনি যদি আদেশ করেন সাইপোইয়ার মাথাটা কেটে ফেলো। তখন কী অবস্থা হবে?’

উপস্থিত কারো মুখে রা নেই। আমার প্রস্তাব এই এক যুক্তিতেই খতম। বলাবাহুল্য, সাইপোইয়ার কলকাতা যাওয়ার পরিকল্পনা সেখানেই ইতি ঘটল।

সে আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলল, – ‘থাংলিয়ানা, তুমি আমার ভাইয়ের মতো। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই, তার গ্রামে আমার বেড়াতে যাওয়ার কোনো কারণ নাই।’

লুসাই নেতাদের কলকাতা বেড়াতে নেওয়ার জন্য এরকম অনেক ব্যর্থ সাক্ষাৎকার আমাকে পার হতে হয়েছে। আমি আমার জালকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিলাম। কারণ আমাকে অন্তত একটা মোটামুটি সংখ্যক মানুষকে নিয়ে যেতে হবে। কোনো কিছুকে যদি প্রদর্শনীর বিষয় বানাতে হয় তবে সেটা যেন প্রদর্শনযোগ্য হয় সেটা খেয়াল রাখা জরুরি।

আমাকে এমন ব্যবস্থা নিতে হলো যাতে লুসাই চিফদের বেশি সময় কলকাতা থাকতে না হয়। তাদের যা দেখার এবং তারা যা দেখতে চায় সবকিছু অল্প সময়ের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। কারণ যদি কোনো লুসাই সদস্যের ক্ষতি হয়, তা হলে সেটার দায়-দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমাকে রক্তঋণ পরিশোধ করতে হবে। এটাই ওদের রীতি।

অনেক কায়দা-কানুন করে আমি অবশেষে সাতজন চিফকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়ে বসলাম। তাদের সঙ্গী-সাথি-সমেত মোট ২৭ জন লুসাই আমাদের যাত্রাসঙ্গী হয়েছে। যাত্রাটা নিরুপদ্রবই ছিল। পথে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু আমার প্রতি লুসাইদের মনোভাবটা সুখকর ছিল না। তারা পুরো যাত্রাপথে আমাকে একবারও চোখের আড়াল হতে দেয়নি। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সারাক্ষণ। মনে হচ্ছিল তারা

কোনো ভয়ানক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো ওদের দিক থেকে ওটাই স্বাভাবিক।

কলকাতায় পৌঁছানোর পর পুরো দলটাকে শহরের ফুসফুস বলে খ্যাত বিশাল ঘাসের একটা ময়দানের মাঝখানে নিয়ে রাখার পরিকল্পনা ছিল। ওখানে তাদের জন্য বেশ কিছু তাঁবু খাটানো হয়েছে। ওরা সেখানে থাকবে আর আমি নিজে সবসময় যেখানে থাকি সেই ক্লাবে উঠব। তাদের সবাইকে ঘোড়ার গাড়িতে করে ময়দানে নিয়ে যাওয়া হলো। পুরো দলটাকে নুরুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে রেখে আমি আরেকটা গাড়িতে আমার আবাসস্থলের দিকে যাওয়ার জন্য উঠলাম। তখন দেখি আমার কোটের পেছন দিকটা গিট্টু দিয়ে বেঁধে রেখেছে কেউ। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম লুসাই চিফদের কাজ ওটা আমাকে ছাড়া কিছুতেই থাকতে রাজি নয় ওরা। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাদের বোঝাতে পারলাম না কিছু। আমাকে ওরা ছাড়বেই না।

ওরা গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের ভয়ে কাতর, যিনি আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। বাধ্য হয়ে আমিও ময়দানে একটা তাঁবু খাটিয়ে তাদের সাথে থাকার ব্যবস্থা করলাম। ওরা যতদিন কলকাতা ছিল আমি ওখানেই রাত কাটিয়েছিলাম।

ওরা সবাই যখন বাংলার প্রধান কর্তা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে অর্ঘ্য প্রদান করতে গেল তখন তাঁকে খুব ভক্তির সাথে কুর্নিশ করল। তাদের রীতিমাফিক উপহার প্রদান করল। হাতির দাঁত এবং ঘরে তৈরি বস্ত্রসামগ্রী উপহার দিয়েছিল লাটসাহেবের জন্য। কিন্তু গভর্নর জেনারেলের সাথে দেখা করতে কিছুতেই রাজি করানো যায়নি।

কলকাতা নগরী ঘুরে বড় বড় চোখ জুড়ানো দালানকোঠাগুলো তাদের তেমন মুগ্ধ করতে পারেনি। এমনকি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বিশাল প্রাসাদতুল্য বাড়িটা, তাঁর ঘরের রুপার তৈরি আসবাবপত্র, তোরণে স্থাপিত রুপার তৈরি সিংহ, সুসজ্জিত বিশাল ড্রইংরুম ইত্যাদি খুব সামান্য মনোযোগ টানতে পেরেছিল। এর মধ্যে তাদের দুজন পথ হারিয়ে ফেলছিল একদিন। পরে এক দয়ালু পুলিশ তাদের খুঁজে পেয়ে ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিল শেষ রাতে। দলের বাকিদের জন্য এটা খুব স্বস্তির বিষয় ছিল যারা মহা শক্তিশালী 'গাভনর জেনডেল লর্ড নর্থব্রুকে'র আতঙ্কে ভুগছিল। পরে তারা আমি কিংবা নুরুদ্দিন ছাড়া একা কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করেনি।

তারা খুব অল্পই ঘুমাত। বেশিরভাগ সময় বসে বসে গল্পগুজব করে রাত পার করে দিত। তাদের মন পড়ে থাকত পাহাড় চূড়ায় তাদের গ্রামের দিকে, যেখানে কলকাতার মতো মশার উপদ্রব নেই, যেখানে উটকো জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির উৎপাত নেই। যদিও বাইরে থেকে দিনভর নানান লোকের কৌতূহলী ভিড় দেখে তারা তেমন বিরক্ত হতো না। কারণ এই রীতিটা তাদের মধ্যেও আছে। আমি যখন লুসাই গ্রামে মরতে বসেছিলাম, তখন আমিও এক

মুহূর্তের জন্য একা হতে পারতাম না। সারাক্ষণ কেউ না কেউ আমার দিকে তাকিয়েই থাকত চিড়িয়াখানার জন্তুর মতো।

সেই একবার, মাত্র একবারই তাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখেছিলাম কলকাতায়। একদিন আমি তাদের রেলে চড়াতে নিয়ে গেলাম। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ট্রাফিক ম্যানেজার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ট্রেনের গতি দেখে তাদের মধ্যে যে আতঙ্ক দেখা গিয়েছিল সেটা দেখার মতো ছিল। ট্রেন থেকে মাটিতে পা রাখার পর তারা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল ইংরেজ সাহেবদের ক্ষমতা আর বিদ্যাবুদ্ধির বহর অনেক বেশি চমকপ্রদ।

ওরা প্রায় এক পক্ষকাল কলকাতা অবস্থান করে পাহাড়ে ফিরে গিয়েছিল নুরুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে। সাথে নিয়ে গিয়েছিল অনেক উপহারসামগ্রী আর তাদের কেনাকাটা করা জিনিসপত্র। তারা এই ভ্রমণে খুব আনন্দিত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিল প্রাণটা নিয়ে নিজেদের পাহাড়ি আস্তানায় ফিরতে পেরে।

আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় খুব অনুনয় করে বলে গেছে আমি যেন বেশি দেরি না করে পাহাড়ে তাদের কাছে ফিরে যাই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আরো বহুদিন ধরে তাদের গ্রামে এই ভ্রমণের গল্প চালু থাকবে। তারা একদিন থাংলিয়ানার সাথে কলকাতায় গিয়েছিল লর্ড সাহেবের সাথে দেখা করতে।

৫৭. শেষবেলার এক টুকরো দীর্ঘশ্বাস

লুসাই চিফদের কলকাতা সফরটা পরবর্তী সময়ে আমাদের লুসাই অভিযানের একটা চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে নজির হয়ে থাকল। ময়দানের ক্যাম্পগুলোতে তাদের দেখতে আসা কলকাতার সাধারণ লোকের কাছে ওরা উশকোখুশকো চুলের, বিচিত্র পোশাক এবং আদিম অস্ত্রে সজ্জিত কিছু বর্বর উপজাতি মাত্র। কিন্তু আমার কাছে ওরা তা নয়। আমি ওদের মধ্যে বাস করেছি। ওদের জীবনযাত্রা দেখেছি। ওদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানি, তারা এই চেনা সভ্য জগতের বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের মানুষ, যারা নিজেদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। ওরা ওদের নিজস্ব আলয়ে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করে। আমার সবচেয়ে বড় সফলতা হলো, ওদের এখানে আনতে পারা। ওরা আমার হাতে নিজেদের জীবন সঁপে দিয়ে এখানে এসেছিল।

তারা খুব সমানুষ। তাদের নিজস্ব বুনো পথই তাদের জন্য সত্য সুন্দর। আমার সাথে তাদের আর কখনো দেখা হয়নি। আমি আর কখনো ওই পাহাড়ে যাইনি। কারণ আমি তাদের জন্য এবং সীমান্ত অঞ্চলের জন্য যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম ভারত সরকারের পক্ষ থেকে— সেটা অনুমোদন পায়নি ইংল্যান্ড থেকে। সে কারণে ওদের জন্য আমার এতদিনের আন্তরিক চেষ্টা,

অনেক পরিশ্রম ও দক্ষতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তার কিছুই বাস্তবায়ন করা হলো না।

এসব কারণে আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমার মধ্যেকার সব আত্মিক শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল। আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাহাড়ে যে সময়টা কাটিয়েছি, সেখানে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। কোনো বন্ধুবান্ধব ছাড়া, সমাজের সংস্পর্শ ছাড়া, নিজের দেশের কোনো লোক ছাড়া একটা নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেছি। আমার এতদিনের পরিশ্রম আর সফলতার জন্য কোনো স্বীকৃতি বা পুরস্কার কিছুই আসেনি। চারপাশের এতসব বঞ্চনার কারণে আমি আর নতুন করে ওখানে গিয়ে কাজ করার তাগিদ পেলাম না।

লুসাই অভিযানের সময় ডাক্তারের পরামর্শও অগ্রাহ্য করেছিলাম। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেইনি। কারণ আমি চেয়েছিলাম যে কোনো উপায়ে অভিযানটি সফলভাবে শেষ করার জন্য। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে আমি আর পারলাম না। সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলাম। শেষমেশ কয়েক বছর পর আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলাম বার্ষিক ১৯০ পাউন্ড পেনশন নিয়ে।

[সমাপ্তি]

সংযোজন

মেরি উইনচেস্টার জোলুটি উপাখ্যান

থাংলিয়ানার মতো জোলুটিও একটি কিংবদন্তির উপনাম। ৬ বছর বয়সি এই ব্রিটিশ শিশুকন্যাটিকে অপহরণ করে লুসাইরা নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছিল। জোটি ও তার সাথে অপহৃত বেশ কয়েকজন বাঙালিকে উদ্ধার করতে গিয়ে লুসাই যুদ্ধের মতো একটা বিশাল পরিকল্পনা করতে হয়েছিল ইংরেজদের। সেই যুদ্ধের ফলে মিজোরামের মতো বিশাল একটা এলাকা ব্রিটিশদের পদানত হয়। মিজোরামের ইতিহাসে সেই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বলা হয়ে থাকে, জোলুটিকে অপহরণ না করলে হয়তো মিজোরাম রাজ্য পরাধীনতা বরণ করত না।

পূর্ব ভারতের আসাম অঞ্চলে যখন চা ব্যবসা ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে উঠছিল, তখন চাবাগানের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছিল। ইংল্যান্ড থেকে চা ব্যবসায়ীরা দলে দলে ভারতে আসতে শুরু করলে সমগ্র আসাম ভ্যালি হয়ে উঠেছিল চায়ের সাম্রাজ্য। এই চায়ের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল যেসব উপত্যকায়—শত শত বছর ধরে সেগুলো ছিল পার্বত্য আদিবাসীদের বিচরণ কেন্দ্র। তাদের শিকার ও জীবন-জীবিকার কেন্দ্রভূমি। চা-বাগানগুলো ছিল তাদের প্রকৃতিবান্ধব মুক্ত জীবনের ওপর একটা আঘাত। সেই আঘাতের প্রতিবাদে মিজো বা লুসাই উপজাতিগুলো একের পর এক হামলা চালাতে শুরু করে ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকার মধ্যে।

যার মধ্যে একটি ছিল ১৮৭১ সালে মিজোরামের ইতিহাসখ্যাত আলেকজান্দ্রাপুরের অপহরণ ঘটনা। চা-বাগানের এক ব্রিটিশ ম্যানেজারকে হত্যা করে তাঁর ৬ বছর বয়সি কন্যা মেরিকে অপহরণ করে নিয়ে যায় মিজো বা লুসাই বিদ্রোহীরা। খুন হওয়া সেই ম্যানেজারের নাম জেমস উইনচেস্টার। তিনি জাতিতে স্কটিশ। চা-বাগানের ম্যানেজার হিসেবে ১২ বছর ধরে কাছাড়ের চা-বাগানে কাজ করেছেন। একসময় মিরা নামের এক মনিপুরী তরুণীর প্রেমে পড়েন জেমস। মেয়েটা তাঁর বাগানে কাজ করত। মিরার গর্ভে যে কন্যার জন্ম হয় সে-ই হলো মেরি উইনচেস্টার।

দুর্ভাগ্যবশত জেমস আর মিরার যৌথ সুখের জীবনটা স্বল্পায়ু ছিল। মেরির জন্মের পরেই মিরা অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। তারপর বাবার আদর-যত্নেই বড় হতে থাকে মেরি। মিরার যখন ছয় বছর বয়স, তখন জেমস ভাবলেন মেয়েটাকে দেশে নিয়ে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন। স্কটল্যান্ডে জেমসের পিতার পরিবার আছে। ওরা মেয়েটার দেখাশোনা করবে।

মেয়েকে নিয়ে দেশে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর স্কুলজীবনের বন্ধু জর্জ সেলারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য আলেকজান্দ্রাপুরের চা-বাগানে যান। সেলার ওই বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। বন্ধুকন্যা মেরির জন্য একটা ফেয়ারওয়েল পার্টির আয়োজন করেন সেলার।

দিনটা ছিল ২৭ জানুয়ারি ১৮৭১। মেরি যখন তার আয়ার সাথে বাগানে হাঁটছিল হঠাৎ করে একদল মিজো ঝটিকা আক্রমণ চালায় চা-বাগানে। হিংস্র মিজোদের ভয়ে বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা সবাই প্রাণ নিয়ে পালাতে শুরু করে।

জেমস ছুটে এসে তাঁর শিশুকন্যাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার আগেই পেছন থেকে গুলি খেয়ে তিনি পড়ে যান। তাঁর কাছ থেকে ৬ বছর বয়সি মেরিকে কেড়ে নেয় মিজোরা। এলাকাজুড়ে খুনখারাবি চালাবার পর মেরি ও বেশকিছু শ্রমিককে ধরে নিয়ে যায় তারা।

মিজোরা এর আগেও বেশ কয়েকবার আক্রমণ চালিয়েছে আশপাশের চা-বাগানে। সেসবের কোনো প্রতিকার করা হয়নি। কিন্তু এই ঘটনাটি খুব তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। সব চা-বাগানের মালিক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মিজোদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। তখন ব্রিটিশ সরকার মিজোদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রায় এক বছর পর ১৮৭২ সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রাম থেকে জেনারেল ব্রাউনলো এবং কাছাড় থেকে জেনারেল বাউচারের নেতৃত্বে একটা দ্বিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। সেই অভিযানে মিজোরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং আত্মসমর্পণ করে। তাদের কাছ থেকে অক্ষত অবস্থায় মেরি উইনচেস্টার এবং অপহৃত শ্রমিকদের উদ্ধার করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো মেরি উইনচেস্টারকে যখন উদ্ধার করা হয় ততদিনে সে মিজোতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তার নাম দেওয়া হয়েছিল জোলুটি। সে তার অপহরণকারী আশ্রিত পরিবারটির সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিল যে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল ব্রিটিশদের।

পরবর্তীকালে ওই ঘটনা সম্পর্কে মেরি উইনচেস্টার লিখেছিলেন-

আমার যতদূর মনে পড়ে সেদিন আমি আমার আয়ার সাথে বাগানে হাঁটছিলাম। তখন হঠাৎ করে বাগানজুড়ে কুলিদের মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দিল। সবাই এদিক থেকে সেদিকে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছিল। আমার অস্পষ্টভাবে মনে আছে মি. সেলার ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছেন। আমরা যখন বাংলোর দিকে চলে যাচ্ছিলাম, তখন আমার বাবার সাথে দেখা, তিনি হেঁটে এদিকে আসছিলেন। তিনি জলদি করে আমাকে কোলে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ার জন্য ছুট দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিছুদূর না যেতেই লুসাইরা আমাদের তাড়া করল। তারা বাবার পিঠে গুলি মারল। বাবা আমাকে নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারা আমাকে বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিল।

আমাকে আর বেশকিছু কুলিকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবার তখনো চেতনা ছিল, বাবা আমাকে বলছিল—'আমি মারা যাচ্ছি, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তোমার কী হবে।' ওটাই বাবার শেষ কথা ছিল। ভাগ্যক্রমে আমার আয়াটা পালাতে পেরেছিল। তারপর খবরটা অন্যান্য বাগানে পৌঁছালে খুব তোলপাড় শুরু হয়। সরকার চা-বাগানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়। পরবর্তী সময়ে আমাকে উদ্ধার করা হয়।

আমাকে যখন লুসাইরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখনকার কথা অল্প অল্প মনে আছে। পথে আমরা এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করেছিলাম। সেখানে চারপাশে বেশ আগুন জ্বালানো হয়েছিল বন্য-জন্তুদের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তারপর আমরা উপরের দিকে উঠতে থাকলাম। শুয়োর, মোরগ-মুরগিতে ভরপুর একের পর এক গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছি। তারপর আরেকটা জায়গায় বিশ্রাম নিলাম। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর একটা বাংলোর মতো ঘরের সামনে উপস্থিত হলাম। সেখানে এক দয়ালু চেহারার বৃদ্ধা আমাকে নিলেন। তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। ওখানে এক রাগত চেহারার যুবক ছিল সে আমাকে খুন করে ফেলার হুমকি দিত প্রায়ই। আমি তাকে ভয় পেতাম। কিন্তু ওই বৃদ্ধা আমাকে সবসময় আগলে রাখতেন, কখনো আমার ক্ষতি করতে দেননি।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে বয়স্ক যে কোনো নারী সম্পর্কে কথা বলতে গেলে আমি নাকি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ব্যাপারটা যে কোনো কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয়, একদম খাঁটি বাস্তব। সেটা বলার জন্য আমি এখনো বেঁচে আছি। কারণ যার কথা বলতে গিয়ে আমি রোমাঞ্চ অনুভব করি সেই মহিলাটা হলো আইজলের লুসাই নেতা ভানচুঙ্গার দাদি পিকলাওয়াঙ্গি। তিনি আমার জন্য জামা বুনে দিতেন। তিনি একটা নীল স্ট্রাইপ স্কার্ট এবং সিল্কের তৈরি একটা লাল চেক শাল দিয়েছিলেন। ওটা আমি এখনো পর্যন্ত বহুমূল্য সম্পদ হিসেবে রেখে দিয়েছি। শুধু স্মৃতি বলে নয়, বরং ওটার প্রতি বুননের ভেতর লুকিয়ে আছে একটা স্বর্গীয় উপহার। এক নারীর পরম মমতা ও ভালোবাসার আকর। যে মায়া দিয়ে তিনি দিনের পর দিন আমার জন্য ওগুলো বুনেছিলেন আমি এখনো সেটা দেখতে পাই। তারপরই সেই দুর্যোগের সময়টা এলো। আমাকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হলো কারণ আমিই এই দুর্যোগের জন্য দায়ী। আমাকে মুক্ত করার জন্যই এই লড়াইয়ের শুরু। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে যাচ্ছে নিচের ঢালের দিকে। কিন্তু ওই বুড়ি আমাকে আগলে রেখেছিল। আমার কোনো ক্ষতি হতে দেননি। তারপর ওদের লোকেরা (ব্রিটিশদের) এসে আমাকে কেড়ে নিয়ে গেল আমার বন্ধুদের কাছ থেকে। আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। স্কটল্যান্ডের এলগিনে দাদার বাড়িতে যাওয়ার পর অন্তত ছমাস লেগেছিল স্বাভাবিক হতে। জন্মের পর থেকে আমার কাছে বাবাই ছিল সব। বাবার কাছ থেকেই আমি সমস্ত আদরযত্ন পেয়েছি।

আমার দাদা-দাদি তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে আমার মন জয় করে। তারপর আমাকে বড় করে তোলে। বুড়ো বয়সে আমি তাদের পাশে থাকতে পেরেছিলাম, ওটা ভাবলে ভালো লাগে।**

এখানে মেরি জোলুটি যাকে পিকলাওয়াঙ্গি নামে অভিহিত করেছেন তিনি আসলে মিজোভাষায় পিয়াঙ্গি (Pi Tluangi) নামে পরিচিত। ভানচুঙ্গা (Vangchhunga) হলো তাঁর পৌত্র এবং মিজোদের মধ্যে প্রথম তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি এবং তাঁর পরিবার পরবর্তীকালে আইজোয়ালে স্থানান্তর হয়েছিলেন।

মেরি উইনচেস্টার খুব ভাগ্যবান যে ওরকম একটা পরিবারে আশ্রয় পেয়েছিলেন। উনিশ শতকে চা-বাগান থেকে যেসব লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো তারা আর কখনো ফিরে আসত না। তাদের মিজো হিসেবে বাকি জীবন পার করতে হতো। কোনো সন্দেহ নেই মেরির ভাগ্যেও সেটাই ঘটত। পরবর্তীকালে বেশ কজন ধর্মান্তরিত মিজোকে ইংল্যান্ডে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারা তখন জোলুটির দেখা পেয়েছিলেন। তিনি তখনো বেঁচে ছিলেন এবং লন্ডনে বসবাস করতেন।

জোলুটির নামের উৎপত্তি : মেয়েটাকে যখন ধরে নিয়ে যায় তখন তার নাম কেউ জানত না। মিজোরা নিজেদের ভাষায় জো (zo) নামে পরিচিত, মিজো ভাষায় luti মানে প্রবেশ করা। অর্থাৎ মেয়েটা মিজো গ্রামে প্রবেশ করেছে। সেটা বোঝাতে ওর নাম জোলুটি হয়ে গেছে।

মিজোদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জোলুটি তাদের গ্রামে যাওয়ার পর নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল নতুন জীবনে। সে ওখানকার ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করত, কাজকর্ম করত, তাদের মতো পাইপে ধূমপান করত।

শোনা যায় মেরিকে যখন ওই গ্রাম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল। সে কিছুতেই যেতে রাজি হয়নি তাদের সাথে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল— ‘বিদেশিরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।’

তার মিজো অভিভাবক সেই বুড়িটা যাওয়ার সময় তার হাতে একটা সেদ্ধ ডিম তুলে দিয়েছিল। সাথে দিয়েছিল তার মিজো জামাকাপড়গুলো। সে তার ফেলে আসা সাথিদের জন্য তার সুন্দর চুলের ক্লিপগুলো দিয়ে এসেছিল। তাকে উদ্ধার করার জন্য বেশ কায়দা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সে ইংরেজ উদ্ধারকারীদের সাথে আপসে যেতে রাজি না হওয়ায় তার লুসাই অভিভাবকরা পরিকল্পনা করে তাকে লাকড়ি আনার জন্য একটা ঝরনার কাছে পাঠায় অন্য দুই শিশুর সাথে। সেখানে ইংরেজদের লুকিয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। সে ওই ঝরনার কাছে গেলে ইংরেজ উদ্ধারকারীরা তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়।

জোলুটির এই উদ্ধার কাজের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল লুসাই চিফ রতন পুইয়া। ক্যাপ্টেন লুইন রতন পুইয়া এবং সুবেদার আজিমকে

পাঠিয়েছিলেন লুসাইদের সাথে আপস মীমাংসার মাধ্যমে জিম্মিদের উদ্ধার করার জন্য। জোলুটিকে উদ্ধারের পর রতন পুইয়ার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন লুইনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মেরিকে লুসাই বা মিজোরা অপহরণ করলেও তার প্রতি কোনো অযত্ন করা হয়নি। তার আশ্রয়দাতারা খুব যত্নের সাথে রেখেছিল তাকে। ফলে সে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল। তাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ ছিল জোলুটি ওরফে মেরি উইনচেস্টার। সেই কারণে শেষ জীবন পর্যন্ত তার মিজো জীবনের সকল স্মৃতি এবং জামাকাপড়গুলো সযত্নে আগলে রেখেছিলেন তিনি।

কয়েকদিন পরই জেনারেল ব্রাউনলোর নির্দেশে জোলুটিকে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে কলকাতা। পরবর্তীকালে কলকাতা থেকে স্কটল্যান্ডে তার পিতামহ এলগিনের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে দাদা-দাদির আদরে বড় হতে থাকে মেরি। তিনি স্কটল্যান্ডের রয়েল মোরেই কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। পড়াশোনা শেষে লন্ডনের একটা স্কুলের হেড মিসট্রেস হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মিজো জীবনের স্মৃতি আগলে লন্ডনেই কাটিয়েছিলেন মেরি উইনচেস্টার ওরফে জোলুটি।

[** History of the Church in Mizoram : Harvest in the Hills by Rev. J Meirion Lloyd, Sznod Publication Board, 1991]